বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, অপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য দুই টাকা

পৌষ, ১৩৪৫

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬এ জুন) রাত্রি ৯টায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানা উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলা দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় রচনার একটি প্রামাণিক 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল ও Scholarly সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম—১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে—করা হইতেছে ; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে আমি গৌরব বোধ করিতেছি।

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। তাঁহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্কিমের রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও উল্লেখযোগ্য।

শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে তাঁহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাঁহারা বহু

অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ও জীবনীর উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই সুযোগে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে মল্লিখিত সাধারণ ভূমিকা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার লিখিত বঙ্কিমের সাহিত্যপ্রতিভা বিষয়ক ভূমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বঙ্কিমের রচনাপঞ্জী ও রাজকার্যের ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সঙ্কলিত বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বঙ্কিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা থাকিবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এই খণ্ডে বিভিন্ন ভাষায় বঙ্কিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে বিবৃতি দিবেন।

বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্বল থাকুক।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫

কলিকাতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভূমিকা

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস এবং বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই বিশেষণটার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কোন নভেলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা বর্ণিত হইলেই সব সময়ে সেই গ্রন্থকে ঠিকমত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের চিহ্ন এই যে, তাহার মধ্যে ঘটনায় এবং চরিত্রে, ইতিহাস হইতে যাহা জানা গিয়াছে এরূপ উপাদানই বেশী পরিমাণে এবং নিছক দেওয়া হইয়াছে; লেখকের কল্পনা তাহার পরিকল্পনায় এবং "অধম" চরিত্রগুলিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে বর্ণিত শহর গ্রাম, ঘর বাড়ী, পুরুষ স্ত্রী, পোষাক অস্ত্রশস্ত্র, কথাবার্ত্তা, রীতিনীতি—আর যাহা সবচেয়ে বড়, চিন্তার ধারা এবং বিশ্বাস, এমন কি কুসংস্কার পর্য্যন্ত—ঠিক সেই যুগের জ্ঞাত সত্যের কিছুতেই ব্যতিক্রম করিবে না। লেখক যদি কোন কোন চরিত্রের রোমান্টিক ভাব অথবা আদর্শের প্রতি অনুরাগ বর্ত্তমান সমাজ হইতে চুরি করিয়া সেই পুরাতন অর্দ্ধ-সংস্কৃত যুগে আরোপ করেন, তবে তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন। রাম লঙ্কার প্রাচীরের দিকে তোপ দাগিতেছেন—এরূপ ছবি যদি কোন চিত্রকর আঁকেন, তাহা যেমন হাস্যকর হইবে, এটাও ঠিক তাহার মত।

এই "যথার্থ ঐতিহাসিক নভেলের" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত সার্ ওয়াল্‌টার স্কট প্রথমে রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ (অর্থাৎ ১৮২৮-১৮৫০) ব্যাপিয়া তাঁহার এই আদর্শ ইউরোপময় সাহিত্যে রাজত্ব করে। কেপ্ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিতে তাহার বছর দশেক দেরি হয়। কলেজের ছাত্র অবস্থায় বঙ্কিম এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন; এবং তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস স্কটের প্রণালীর অনুকরণে লিখিত হয়; যদিও এ কথা সত্য নহে যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' 'আইভ্যান্‌হো'র ছায়ামাত্র। আরও একটা পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে; 'দুর্গেশনন্দিনী'র আকার এক একখানা ওয়েভার্লি নভেলের সিকি মাত্র, সুতরাং স্কট নিজ নভেলের মধ্যে যে সব জিনিস দিয়াছেন, বঙ্কিম তাহার সমস্তগুলি, অথবা কোন একটি জিনিস সেই প্রভূত পরিমাণে, দিতে পারেন নাই।

শেষ জীবনে বঙ্কিম যে সব গল্প রচনা করেন, তাহার পিছনে একটা করিয়া ইতিহাসের চিত্রপট ঝুলাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ধরা যায় না। তাহারা অতিমাত্রায় রোমান্টিক এবং ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী ভাবধারা দ্বারা চালিত হওয়ায়, বারো আনারও অধিক কল্পনার দেশে গিয়াছে,—নিছক ইতিহাস হইতে

বড় দূরে। 'মৃণালিনী'তে রোমান্স 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা বেশী, তথাপি উহা ইতিহাসকে অতিক্রম করে নাই। 'চন্দ্রশেখর'ও সেইরূপ প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস, যদিও রোমান্সের বুক্‌নি দেওয়ায় অতি মনোরম হইয়াছে।

বাস্তবতঃ 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিষয়বস্তু হইল মুঘল সম্রাট কর্ত্তৃক পাঠানদের হাত হইতে বঙ্গ-বিজয়। বঙ্কিম পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া এটাকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার "নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ"ও প্রায়শঃ সত্য ইতিহাস হইতে লওয়া এবং সেই যুগের উপযোগী চরিত্র ও ভাব দিয়া সাজাইয়া তাহাদের খাড়া করা হইয়াছে। এমন কি মানসিংহের বহু-নারী-বল্লভত্ব, রাজপুত-সম্ভ্রান্তঘরে নিম্নজাতীয়া বাঁদি ("পাস্‌বান্" বা "পাত্রী") রাখা, বঙ্গে মানসিংহের প্রতিনিধির অতুলনীয় বীরত্ব এবং অধিকসংখ্যক পাঠান-সেনার পরাজয়, দুর্গমধ্যে অত্যাচার ও খুন—এ সব কথা সেই যুগের সত্য ইতিহাস হইতে জানা যায়। তাঁহার কল্পনা হইতে আসিয়াছে শুধু জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেমকাহিনী এবং আয়েষার দেবকন্যা-সদৃশ চরিত্র-কথা।

প্রকৃত ইতিহাস বেশী গভীরভাবে খুঁড়িলে রোমান্স অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। কোনও তিলোত্তমা যদি সত্য জগৎসিংহকে বিবাহ করিতেন, তবে তাঁহার কপালে অকাল-বৈধব্য লেখা ছিল, কারণ কুমার জগৎসিংহ অল্পবয়সে (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) অতিমাত্রায় মদ খাইয়া মারা যান। এবং জগৎসিংহ স্বয়ং নহেন, তাঁহার রাজপুত স্ত্রীর পুত্র মহাসিংহ বাল্যকালেই মানসিংহের প্রতিনিধিরূপে বাঙ্গলায় গিয়া অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। (বেভরিজের অনুবাদ 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, ১২১৩-১২১৪ পৃষ্ঠা)।

বঙ্কিমের অজ্ঞাত, ১৯১৯ সালে আমার দ্বারা আবিষ্কৃত একখানা ফারসী হস্তলিপি হইতে উস্‌মানের বীরচরিত্র সত্য ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম 'বহারিস্তান্-ই-ঘাইবী,' ইহা মির্জা নাথন্ নামক এক জন মুঘল কর্ম্মচারীর আত্মকাহিনী এবং ইহাতে জাহাঙ্গীর বাদশার প্রায় সমস্ত রাজ্যকাল ব্যাপিয়া (১৬০৮-১৬২৫ পর্য্যন্ত) বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের ঘটনাবলীর অতি বিস্তৃত বিবরণ আছে, কারণ এই সমস্ত সময় নাথন্ বঙ্গদেশে সেনাপতির কাজ করিতেন। জগতে ইহার একমাত্র পুঁথি আছে, তাহা প্যারিস নগরীর সরকারী পুস্তকালয়ে রক্ষা পাইয়াছে। দুই বৎসর গত হইল, ঢাকার অধ্যাপক ডাক্তার বোরা ইহার ইংরেজী অনুবাদ ছাপিয়াছেন। এই বহারিস্তানের ফার্সীমূল হইতে আমি উস্‌মানের শেষ যুদ্ধের ও মৃত্যুর সত্য বিবরণ অনুবাদ করিয়া ১৩২৮ সালে প্রকাশিত করি, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গলার সুবাদার ইস্লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া যশোহর রাজ্য অধিকার করিলেন।...উস্মানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত হইল। ইহার প্রধান সেনাপতি হইলেন সুজায়েৎ খাঁ।... ঢাকা হইতে ছয় কুচে এগারসিন্দুরে পোঁছিয়া এই সেনাপতি তথায় এক সপ্তাহ বিলম্ব করিলেন।...পরে সরাইল হইতে স্থলপথে তরফের দুর্গে পোঁছিলেন [তরফ্ সরাইল হইতে একটানে ৩৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, হবিগঞ্জ হইতে আট দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে।]...৩রা ফেব্রুয়ারি ১৬১২ খ্রীঃ কুর্বানী ইদ্ পালন করিয়া বাদশাহী সৈন্য পরদিন টুপিয়া দুর্গে পোঁছিল।

"...নিজ রাজধানী 'উহার' [—পাটান উশার] হইতে রওনা হইয়া উস্মান দুই কুচে চৌয়ালিশ পরগণার দৌলম্বাপুর গ্রামে আসিয়া নামিলেন। [তখন তাঁহার বয়স ৪১ বৎসরে পড়িয়াছে।]... সম্মুখে কাদাপূর্ণ জলাভূমি রাখিয়া উস্মান নিজ শিবিরকে দুর্গে পরিণত করিলেন।...সুজায়েৎ খাঁ সংবাদ পাইয়া উস্মানের দুর্গের আধ ক্রোশ দূরে অর্থাৎ জলাভূমির এপারে, নিজ শিবির স্থাপন করিলেন।...পরদিন প্রত্যুষে যুদ্ধ হইবে।

"দৌলম্বাপুরের যুদ্ধ, ২রা মার্চ ১৬১২।...সেই নরম জলাভূমির ধারে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উস্মানের কতকগুলি সৈন্য বীরদর্পে জলা পার হইয়া আসিয়া মুঘলদের সম্মুখে অস্ত্র ঘুরাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাদশাহী পক্ষ হইতে কয়েক জন সেনানী উহাদের উপর গিয়া পড়িল।...নিজদল ও শত্রুদল জলার সম্মুখে মিশিয়া যাওয়ায়, পশ্চাতে যে সব বাদশাহী তোপ ছিল, তাহার গুলিতে আহত হইয়া মুঘল বীরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

"এদিকে বাদশাহী দক্ষিণ বাহুর নেতা ইফ্তিখার খাঁ কয়েক জন মাত্র অনুচর লইয়া জলা পার হইয়া (উস্মানের শিবিরের দিকে) পোঁছিয়া উস্মানের ভ্রাতা ওলীকে এমন কাবু করিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হন আর কি।

"উস্মান কেন্দ্র হইতে ইহা দেখিয়া ওলীকে ছেলেমানুষ বলিয়া গালি দিয়া, ও নিজ পাশে সজ্জিত দুই তিন হাজার পরিপক্ক সৈন্য ও বিখ্যাত রণহস্তীগুলি লইয়া আফঘান রণ-নাদ "হুঁ" "হুঁ" গর্জ্জন করিয়া, ছুটিয়া ইফ্তিখার খাঁকে আক্রমণ করিলেন।...আফঘানেরা রণ-শৃঙ্গার নামক বিখ্যাত বাদশাহী হস্তীকে চারিদিকে ঘিরিয়া শত আঘাতে কাবাবের মাংসের মত করিয়া কাটিয়া ফেলিল, মুঘলদের ঘোড়াগুলির পায়ের রগ্ কাটিয়া নিমেষে আরোহীদের ধরাশায়ী করিল।

"এক জন আফঘানের সহিত ইফ্তিখার খাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি এক আঘাতে উহাকে ভূমিশায়ী করিলেন, কিন্তু উহার ভাই ছুটিয়া আসিয়া তরবারি ছুঁড়িয়া খাঁর বাম হস্তের বর্ম্মসহিত কব্জা কাটিয়া ফেলিল।...তখন শেখ আবদুল জলীল নামক ইফ্তিখারের এক জন অনুগত সৈন্য প্রভুর দুর্দ্দশা দেখিয়া, নিজের ঘোড়া ছুটাইয়া, উস্মানের হাতীর সম্মুখে পোঁছিয়া তাঁহার মুখ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীরটি উস্মানের বাম চক্ষু দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। কিন্তু উস্মানের নিক্ষিপ্ত বর্শায় বুকে বিদ্ধ হইয়া শেখ পড়িয়া গেল।...

"নিজ সৈন্যগণ যেন তাঁহাকে জখম দেখিতে না পায়, এজন্য উস্‌মান এত মারাত্মক আঘাত পাইবার পরও দুই হাতে তীরটি টানিয়া বাহির করিলেন; তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুও ঐ সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল, কারণ দুই চোখের রগগুলি একত্র জড়িত থাকে। বাম হাতে রুমাল লইয়া নিজমুখ ঢাকিয়া, উস্‌মান মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমর! সুজায়েৎ খাঁর সৈন্যবিভাগ কোন্ দিকে?"...সে উত্তর করিল, "মির্জা, সালামৎ! ঐ যে সামনে মহুয়া গাছ দেখিতেছেন, তাহার নীচে পতাকা দেখা যাইতেছে। সুজায়েৎ খাঁ নিশ্চয়ই উহার নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।" উস্‌মানের তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না; দক্ষিণ হস্ত মাহুতের পিঠে রাখিয়া সেখানে হাতী চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

"তাহার পর অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল; মুঘলেরা অনেকে হত-আহত হইলেও পরাস্ত হইল না; আফঘানদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে উস্‌মানের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্র মুমরেজ্ পিতার মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে সঙ্গে লইয়া আবার মুঘলদের সম্মুখীন হইল।...অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই পক্ষের অদ্ভুত গজযুদ্ধ চলিল।...

"প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল, কেহই কাহারও খোঁজ লইবার অবসর পাইল না। বাতাস এত গরম হইয়া উঠিল যে, মানুষ ও ঘোড়ার যেন দম বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বাদশাহী সৈন্য হটিল না দেখিয়া অবশেষে আফঘানেরা হতাশ হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল।...সেই জলাভূমির পশ্চিম ধার হইতে তাহারা আবার জলা পার হইয়া নিজ শিবিরের দিকে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পারে) ফিরিয়া আসিল। আফঘান নেতারা উস্‌মানের মৃত্যু লুকাইয়া রাখিয়া মহাবিক্রমে হস্তীর সাহায্যে এতক্ষণ যুদ্ধ চালাইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে দুই পক্ষই এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, ঘোড়া আর চলিতে পারে না, অশ্বারোহী জিনের উপর বসিয়া থাকিতে পারে না,—যুদ্ধ করা তো দূরের কথা। বৈকাল ও রাত্রি জুড়িয়া দুই পক্ষ হইতে শুধু গোলাগুলি চলিতে লাগিল।

"পর দিন প্রভাত হইবার ছয় ঘড়ি মাত্র বাকি থাকিতে, আফঘানেরা শিবির খাড়া রাখিয়া কেবলে উহারে পলায়ন করিল। রণক্ষেত্র হইতে এক রাত্রি ও দিনে পলাতকগণ উহারে পৌঁছিয়া সব কন্যা ও স্ত্রীগণকে হত্যা করিয়া...দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে এমন স্থানে উস্‌মানকে গোপনে গোর দিল যে, মুঘলেরা যেন সে স্থান জানিতে পারিয়া বিদ্রোহী পাঠানরাজের মৃতদেহ হইতে মাথা কাটিয়া লইয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইতে সক্ষম না হয়।"

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভূমিকা

(সম্পাদকীয়)

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস, বাংলায় প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসও বটে। ইহার প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ইহাকে "ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস" বলিয়াছিলেন। ইতিহাসের দিক্ দিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিচার সার্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট তাঁহার ভূমিকায় করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিকত্ব অসাধারণ; ইহাকে যুগান্তকারী উপন্যাস বলা চলে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর বাঙালী অনুভব করিয়াছিল, বাংলা ভাষাতেও উচ্চশ্রেণীর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব; বঙ্কিমচন্দ্রও নিজের ক্ষমতা এই পুস্তকেই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে অপরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

> বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।
>
> পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য!...মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। —রবীন্দ্রনাথ, 'আধুনিক-সাহিত্য', পৃ. ২।

শচীশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ইহা ১৮৬২ সালে বঙ্কিমের ২৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৩ সালে তাঁহার খুলনায় অবস্থান-কালে শেষ হয়। পুস্তকের গুণাগুণ তিনি নিজে ঠাহর করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন। তাঁহারা পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করাতে "বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান" করেন। *

---

* 'বঙ্কিম-জীবনী', তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৬১।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রদীপে' বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক স্মৃতি-কথা পাঠে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। সুতরাং কালীনাথ দত্তের সাক্ষ্য মানিতে হইলে বলিতে হইবে, 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে সহোদর পূর্ণচন্দ্রের সাক্ষ্যও মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন—

> "দুর্গেশনন্দিনী"র আবির্ভাবে প্রথমতঃ কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজিওয়ালারা অবশ্য দু'হাত তুলিয়া বাহবা দিয়াছিলেন।... বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না, কিন্তু "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।...দুই দিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতেই ধারণা ছিল যে, "দুর্গেশনন্দিনী"র ভাষা ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সে জন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাষায় ব্যাকরণ-দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?" ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, (সংস্কৃত কলেজের ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন, "গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি!" বিখ্যাত পণ্ডিত ৺চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, "আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ-দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।"..."দুর্গেশনন্দিনী" প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সেকালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি "দুর্গেশনন্দিনী" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।"...কোনও প্রসিদ্ধ লেখক *...লিখিয়াছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।" কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক।
>
> —পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৬৯-৭২।

পূর্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাল্যকালে খুল্লপিতামহের নিকট শ্রুত গড় মান্দারণের একটি ঘটনা 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে। বিষ্ণুপুর,

* গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

জাহানাবাদ ও মান্দারণ অঞ্চলে উক্ত বৃদ্ধের যাতায়াত ছিল; তিনি জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধের মুখে এ সকলের এবং স্থানীয় জমিদারের স্ত্রীকন্যাসহ পাঠানদের হাতে বন্দী হওয়ার ও তাঁহার সাহায্যার্থ জগৎসিংহের আগমনের সরস গল্প শুনিয়াছিলেন। * 'রহস্য-সন্দর্ভে'র সমালোচনাতেও জাহানাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ আছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র 'আইভ্যান্‌হো'-সম্পর্কিত একটা অপবাদ বরাবর আছে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের নিকট বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-রচনার পূর্ব্বে তিনি 'আইভ্যান্‌হো' পড়েন নাই। কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।" † শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তৎপ্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। ১৮৭১-৭২ সালের *Macmillan's Magazine*এর ৪৬০ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক কাউয়েল (Cowell) বলিয়াছেন, "It is far from being a mere servile copy."

সমসাময়িক সাময়িক-পত্রিকায় 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকে একটি বিশেষ ঘটনা ধরিয়া লইয়া নানা বিচিত্র আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রশংসার ভাগই বেশী। নিম্নলিখিত আলোচনাগুলি উল্লেখযোগ্য—১। সংবাদ প্রভাকর, ১৪ এপ্রিল ১৮৬৫; ২। রহস্য-সন্দর্ভ, ২য় পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, সংবৎ ১৯২১, পৃ. ১৩৯-৪৪; ৩। সোমপ্রকাশ, ২৪ এপ্রিল ১৮৬৫; ৪। *Hindoo Patriot*, ২৪ এপ্রিল ও ১৫ মে, ১৮৬৫।

'হিন্দু পেট্রিয়টে' 'আইভ্যান্‌হো'-সংক্রান্ত অপবাদ আলোচিত হইয়াছিল। মোটের উপর, সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র যশ হয় নাই, একথা ঠিক নহে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে একটি অভিনন্দন-পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছে, "আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নবপল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃত ফলের

---

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪৯-৫০।

† 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ২১৫।

রসাস্বাদন করাইলেন।" ২ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রেরিত পত্রের মধ্যে দেখা যায়, দুই জন মহিলাও 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র তেরটি সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণ ১৮৬৫ এবং ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এফ. ব্রাউন (J. F. Browne, B.C.S.) ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক কলিকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোম্পানি দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। দামোদর মুখোপাধ্যায় 'নবাবনন্দিনী' নাম দিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র এক অক্ষম পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচলিত জীবনচরিতগুলিতে (হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, তারকনাথ বিশ্বাস, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি) 'দুর্গেশনন্দিনী' লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে। এতদ্ব্যতীত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা, চিত্র ও চরিত্র লইয়া নানা আলোচনা করিয়াছেন। সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী'-বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে।

'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে নাট্যীকৃত হইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নিম্নলিখিত অনুবাদগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—

১। ইংরেজী—*Durgesa Nandini*; or, The Chieftain's Daughter: trans. into English prose by Charu Chandra Mookerjee, Calcutta, 1880.

২। হিন্দুস্থানী—'দুর্গেশনন্দিনী' by K. Krishna, Lucknow, 1876.

৩। হিন্দী—'দুর্গেশনন্দিনী' by G. Simha, Benares, 1882.

৪। কানাড়ী—'দুর্গেশনন্দিনী' by B. Venkatachar, Bangalore, 1885.

'দুর্গেশনন্দিনী' ১ম সংস্করণ এক খণ্ড রাজশাহী, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ-নির্ণয়ের জন্য উক্ত পুস্তকখানি কিছু দিনের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দুর্গেশনন্দিনী

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ত্রয়োদশ সংস্করণ হইতে]

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবমন্দির

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি-ধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ;

হস্তমার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবল বেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্য-বাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোম্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক তত দূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিক ক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবা পুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তিকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কারঝঙ্কার-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন, এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যেই হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক দাস দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।" রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি নিবারণ হইলে, যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয়, গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক এক জন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে; জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দিররক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত অর্থের লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত পাঁচ ভাবিয়া মন্দিররক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুই জন মাত্র কামিনী। যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণপারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহ জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীনবংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না। বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বোধ

হইল। সহজেই যুবা পুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয় মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মি-সমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে, অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃটসম্ভূত নবদূর্ব্বাদলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি; বসন্তপ্রসূত নবপত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি এক খণ্ড হীরক; কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল; কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয় পক্ষেই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলাপ

প্রথমে যুবক নিজ কৌতূহলপরবশতা প্রকাশ করিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অনুভবে বুঝিতেছি, আপনারা ভাগ্যবানের পুরস্ত্রী, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছে; কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক, আপনাদের সে প্রতিবন্ধক না থাকিতে পারে, এজন্য জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি।"

জ্যেষ্ঠা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি? যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? যে দিন বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই দিন আত্মপরিচয়ের পথও বন্ধ করিয়াছেন।"

যুবক এ কথায় উত্তর করিলেন না। তাঁহার মন অন্য দিকে ছিল। নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষচক্ষুতে

কের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কথোপকথন মধ্যে অকস্মাৎ পথিকেরও সেই দিকে ষ্টিপাত হইল; আর দৃষ্টি ফিরিল না; তাঁহার বোধ হইল, যেন তাদৃশ অলৌকিক রাশি আর কখন দেখিতে পাইবেন না। যুবতীর চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত পথিকের চক্ষু মিলিত হইল। যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন। সহচরী বাক্যের উত্তর পাইয়া পথিকের মুখপানে চাহিলেন। কোন্ দিকে তাঁহার দৃষ্টি, তাহাও নিরীক্ষণ লেন, এবং সমভিব্যাহারিণী যে যুবক প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিতেছিলেন, তাহা নিতে পারিয়া, নবীনার কানে কানে কহিলেন, "কি লো! শিবসাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি া কি?"

নবীনা, সহচরীকে অঙ্গুলিনিপীড়িত করিয়া তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি নিপাত যাও।" চতুরা সহচারিণী এই দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, যে লক্ষণ দেখিতেছি, পাছে এই অপরিচিত যুবা পুরুষের তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয়; তবে আর কিছু হউক না হউক, ইহার মনের সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট হইবে, অতএব সে পথ এখনই রুদ্ধ করা আবশ্যক। কিরূপেই বা এ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়? যদি ইঙ্গিতে বা ছলনাক্রমে যুবককে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারি, তবে তাহা কর্ত্তব্য বটে, এই ভাবিয়া নারী-স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত কহিলেন, "মহাশয়! স্ত্রীলোকের সুনাম এমনই অপদার্থ বস্তু যে, বাতাসের ভর সহে না। আজিকার এ প্রবল ঝড়ে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর, অতএব এক্ষণে ঝড় থামিয়াছে, দেখি যদি আমরা পদব্রজে বাটী গমন করিতে পারি।"

যুবা পুরুষ উত্তর করিলেন, "যদি একান্ত এ নিশীথে আপনারা পদব্রজে যাইবেন, তবে আমি আপনাদিগকে রাখিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, আমি এতক্ষণ নিজস্থানে যাত্রা করিতাম, কিন্তু আপনার সখীর সদৃশ রূপসীকে বিনা রক্ষকে রাখিয়া যাইব না বলিয়াই এখন এ স্থানে আছি।"

কামিনী উত্তর করিল, "আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পাছে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করেন, এজন্যই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেছি না। মহাশয়! স্ত্রীলোকের মন্দ কপালের কথা আপনার সাক্ষাতে আর কি বলিব। আমরা সহজে অবিশ্বাসিনী; আপনি আমাদিগকে রাখিয়া আসিলে আমাদিগের সৌভাগ্য, কিন্তু যখন আমার প্রভু—এই কন্যার পিতা—ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ, তখন ইনি কি উত্তর করিবেন?"

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।"

যদি তন্মুহূর্ত্তে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দিরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না। উভয়েই অমনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কনিষ্ঠা শিবলিঙ্গের পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা গলদেশে অঞ্চল দিয়া দণ্ডবৎ হইলেন; অঞ্জলিবদ্ধকরে কহিলেন, "যুবরাজ! না জানিয়া সহস্র অপরাধ করিয়াছি, অবোধ স্ত্রীলোকদিগকে নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।"

যুবরাজ হাসিয়া কহিলেন, "এ সকল গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ক্ষমা করি, যদি পরিচয় দাও, পরিচয় না দিলে অবশ্য সমুচিত দণ্ড দিব।"

নরম কথায় রসিকার সকল সময়েই সাহস হয়; রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি দণ্ড, আজ্ঞা হউক, স্বীকৃত আছি।"

জগৎসিংহও হাসিয়া কহিলেন, "সঙ্গে গিয়া তোমাদের বাটী রাখিয়া আসিব।"

সহচরী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট। কোন বিশেষ্ কারণে তিনি নবীনার পরিচয় দিল্লীশ্বরের সেনাপতির নিকট দিতে সম্মতা ছিলেন না; তিনি যে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবেন, ইহাতে আরও ক্ষতি, সে ত পরিচয়ের অধিক; অতএব সহচরী অধোবদনে রহিলেন।

এমন সময়ে মন্দিরের অনতিদূরে বহুতর অশ্বের পদধ্বনি হইল; রাজপুত্র অতি ব্যস্ত হইয়া মন্দিরের বাহিরে যাইয়া দেখিলেন যে, প্রায় শত অশ্বারোহী সৈন্য যাইতেছে। তাহাদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টিমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহারই রাজপুত সেনা। ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য্যসম্পাদনে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাইয়া, ত্বরিত এক শত অশ্বারোহী সেনা লইয়া পিতৃসমক্ষে যাইতেছিলেন। অপরাহ্নে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন; পশ্চাৎ তাহারা এক পথে, তিনি অন্য পথে যাওয়াতে, তিনি একাকী প্রান্তরমধ্যে ঝটিকা বৃষ্টিতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলেন, এবং সেনাগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, জানিবার জন্য কহিলেন, "দিল্লীশ্বরের জয় হউক।" এই কথা কহিবামাত্র এক জন অশ্বারোহী তাঁহার নিকট আসিল। যুবরাজ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "ধরমসিংহ, আমি ঝড় বৃষ্টির কারণে এখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

ধরমসিংহ নতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমরা যুবরাজের বহু অনুসন্ধান করিয়া এখানে আসিয়াছি, অশ্বকে এই বটবৃক্ষের নিকটে পাইয়া আনিয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "অশ্ব লইয়া তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আর দুই জনকে নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক আনিতে পাঠাও, অবশিষ্ট সেনাগণকে অগ্রসর হইতে বল।"

ধরমসিংহ এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় প্রশ্ন অনাবশ্যক জানিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া সৈন্যদিগকে যুবরাজের অভিপ্রায় জানাইল। সৈন্যমধ্যে কেহ কেহ শিবিকার বার্ত্তা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অপরকে কহিল, "আজ যে বড় নূতন পদ্ধতি।" কেহ বা উত্তর করিল, "না হবে কেন? মহারাজ রাজপুতপতির শত শত মহিষী।"

এদিকে যুবরাজের অনুপস্থিতিকালে অবসর পাইয়া অবগুণ্ঠন মোচনপূর্ব্বক সুন্দরী সহচরীকে কহিল, "বিমল, রাজপুত্রকে পরিচয় দিতে তুমি অসম্মত কেন?"

বিমলা কহিল, "সে কথার উত্তর আমি তোমার পিতার কাছে দিব; এক্ষণে আবার এ কিসের গোলযোগ শুনিতে পাই?"

নবীনা কহিল, "বোধ করি, রাজপুত্রের কোন সৈন্যাদি তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া থাকিবে; যেখানে স্বয়ং যুবরাজ রহিয়াছেন, সেখানে চিন্তা কর কেন?"

যে অশ্বারোহিগণ শিবিকা বাহকাদির অন্বেষণে গমন করিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, যে বাহক ও রক্ষিবর্গ স্ত্রীদিগকে রাখিয়া বৃষ্টির সময়ে গ্রামমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া জগৎসিংহ মন্দিরমধ্যে পুনঃপ্রবেশপূর্ব্বক পরিচারিকাকে কহিলেন, "কয়েক জন অস্ত্রধারী ব্যক্তির সহিত বাহকগণ শিবিকা লইয়া আসিতেছে, উহারা তোমাদিগের লোক কি না, বাহিরে আসিয়া দেখ।" বিমলা মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, তাহারা তাহাদিগের রক্ষিগণ বটে।

রাজকুমার কহিলেন, "তবে আমি আর এখানে দাঁড়াইব না; আমার সহিত ইহাদিগের সাক্ষাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব আমি চলিলাম। শৈলেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে বাটী উপনীত হও; তোমাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা সপ্তাহমধ্যে প্রকাশ করিও না; বিস্মৃত হইও না, বরং স্মরণার্থ এই সামান্য বস্তু নিকটে রাখ। আর আমি তোমার প্রভুকন্যার যে পরিচয় পাইলাম না, এই কথাই আমার হৃদয়ে স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ রহিল।" এই বলিয়া উষ্ণীষ

হইতে মুক্তাহার লইয়া বিমলার মস্তকে স্থাপন করিলেন। বিমলা মহার্ঘ রত্নহার কেশপাশে ধরিয়া রাজকুমারকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, "যুবরাজ, আমি যে পরিচয় দিলাম না, ইহাতে আমাকে অপরাধিনী ভাবিবেন না, ইহার অবশ্য উপযুক্ত কারণ আছে। যদি আপনি এ বিষয়ে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে পক্ষান্তরে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বলিয়া দিন।"

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দিরমধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই স্থলে দেখা না পাও—সাক্ষাৎ হইল না।"

"দেবতা আপনাকে রক্ষা করুন" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার প্রণতা হইল। রাজকুমার পুনর্ব্বার অনিবার্য্য তৃষ্ণাকাতর লোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোগল পাঠান

নিশীথকালে জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে যাত্রা করিলেন। আপাততঃ তাঁহার অনুগমনে অথবা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মনোমোহিনীর সংবাদকথনে পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তরমধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ইতিবৃত্তসম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য্য ভাল নহে।

প্রথমে বঙ্গদেশে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মহম্মদীয় জয়ধ্বজা সংস্থাপিত করিলে পর, মুসলমানেরা অবাধে কয়েক শতাব্দী তদ্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৯৭২ হেঃ অব্দে সুবিখ্যাত সুলতান বাবর, রণক্ষেত্রে দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লদীকে পরাভূত করিয়া, তৎসিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তৎকালেই বঙ্গদেশ তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগের দণ্ডাধীন হয় নাই।

যত দিন না মোগল সম্রাট্‌দিগের কুলতিলক আক্‌বরের অভ্যুদয় হয়, তত দিন এ দেশে স্বাধীন পাঠান রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কুক্ষণে নির্ব্বোধ দাউদ খাঁ সুপ্ত

সিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন; আত্মকর্ম্মফলে আক্‌বরের সেনাপতি মনাইম্‌ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। দাউদ ৯৮২ হেঃ অব্দে সগণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন; বঙ্গরাজ্য মোগল ভূপালের কর-কবলিত হইল। পাঠানেরা উৎকলে সংস্থাপিত হইলে, তথা হইতে তাহাদিগের উচ্ছেদ করা মোগলদিগের কষ্টসাধ্য হইল। ৯৮৬ অব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাঁহা খাঁ পাঠানদিগকে দ্বিতীয় বার পরাজিত করিয়া উৎকল দেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন। ইহার পর আর এক দারুণ উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। আক্‌বর শাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের রাজকর আদায়ের যে নূতন প্রণালী সংস্থাপিত হইল, তাহাতে জায়গীরদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের গুরুতর অসন্তুষ্টি জন্মিল। তাঁহারা নিজ নিজ পূর্ব্বাধিপত্য রক্ষার্থ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। অতি দুর্দ্দম্য রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে, সময় পাইয়া উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্ব্বার মস্তক উন্নত করিল ও কত্তলু খাঁ নামক এক পাঠানকে আধিপত্যে বরণ করিয়া পুনরপি উড়িষ্যা স্বকরগ্রস্ত করিল। মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।

কর্ম্মঠ রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম, তৎপরে শাহবাজ খাঁ, কেহই শত্রুবিজিত দেশ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এই আয়াসসাধ্য কার্য্যোদ্ধার জন্য এক জন হিন্দু যোদ্ধা প্রেরিত হইলেন।

মহামতি আক্‌বর তাঁহার পূর্ব্বগামী সম্রাট্‌দিগের হইতে সর্ব্বাংশে বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, এতদ্দেশীয় রাজকার্য্য সম্পাদনে এতদ্দেশীয় লোকই বিশেষ পটু—বিদেশীয়েরা তাদৃশ নহে; আর যুদ্ধে বা রাজ্যশাসনে রাজপুতগণ দক্ষাগ্রগণ্য। অতএব তিনি সর্ব্বদা এতদ্দেশীয়, বিশেষতঃ রাজপুতগণকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

আখ্যায়িকাবর্ণিত কালে যে সকল রাজপুত উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে মানসিংহ এক জন প্রধান। তিনি স্বয়ং আক্‌বরের পুত্র সেলিমের শ্যালক। আজিম খাঁ ও শাহবাজ খাঁ উৎকলজয়ে অক্ষম হইলে, আক্‌বর এই মহাত্মাকে বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।

৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পরবৎসরে উৎকলবিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হইলে পর, নিজে তন্নগরীতে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় করিয়া বঙ্গপ্রদেশ শাসন জন্য সৈদ খাঁকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। সৈদ খাঁ এই ভার

প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী তণ্ডা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে রণাশায় যাত্রা করিয়া মানসিংহ প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সৈদ খাঁকে লিখিলেন যে, তিনি বৰ্দ্ধমানে তাঁহার সহিত সসৈন্য মিলিত হইতে চাহেন।

বৰ্দ্ধমানে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন যে, সৈদ খাঁ আসেন নাই, কেবলমাত্র দূত দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব সম্ভাবনা, এমন কি, তাঁহার সৈন্যসজ্জা করিয়া যাইতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে; অতএব রাজা মানসিংহ আপাততঃ বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকিলে তিনি বর্ষাপ্রভাতে সেনা সমভিব্যাহারে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। রাজা মানসিংহ অগত্যা তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তথায় সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় রহিলেন।

তথায় অবস্থিতিকালে লোকমুখে রাজা সংবাদ পাইলেন যে, কতলু খাঁ তাঁহার আলস্য দেখিয়া সাহসিক হইয়াছে; সেই সাহসে মান্দারণের অনতিদূর মধ্যে সসৈন্য আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে। রাজা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, শত্রুবল কোথায়, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, কি করিতেছে, এই সকল সংবাদ নিশ্চয় জানিবার জন্য তাঁহার এক জন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া, রাজা তাঁহাকেই শতেক অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে শত্রু-শিবিরোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া অচিরাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যৎকালে কার্য্য সমাধা করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন প্রান্তরমধ্যে পাঠক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবীন সেনাপতি

শৈলেশ্বর-মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া জগৎসিংহ পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইলে পর, মহারাজ মানসিংহ পুত্রপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সেনা ধরপুর গ্রামের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিকটস্থ গ্রামসকল লুঠ করিতেছে, এবং স্থানে

স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ বা অধিকার করিয়া তদাশ্রয়ে এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে আছে। মানসিংহ দেখিলেন যে, পাঠানদিগের দুর্বৃত্তির আশু দমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু এ কার্য্য অতি দুঃসাধ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য সমভিব্যাহারী সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন, "দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম, পরগণা পরগণা দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতেছে, এক্ষণে পাঠানদিগকে শাসিত না করিলেই নয়, কিন্তু কি প্রকারেই বা তাহাদিগের শাসন হয়? তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় বলবান্; তাহাতে আবার দুর্গশ্রেণীর আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে; যুদ্ধে পরাজিত করিলেও তাহাদিগকে বিনষ্ট বা স্থানচ্যুত করিতে পারিব না; সহজেই দুর্গমধ্যে নিরাপদ্ হইতে পারিবে। কিন্তু সকলে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি রণে আমাদিগকে বিজিত হইতে হয়, তবে শত্রুর অধিকারমধ্যে নিরাশ্রয়ে একেবারে বিনষ্ট হইতে হইবে। এরূপ অন্যায় সাহসে ভর করিয়া দিল্লীশ্বরের এত অধিক সেনানাশের সম্ভাবনা জন্মান, এবং উড়িষ্যাজয়ের আশা একেবারে লোপ করা, আমার বিবেচনায় অনুচিত হইতেছে; সৈদ খাঁর প্রতীক্ষা করাই উচিত হইতেছে; অথচ বৈরিশাসনের আশু কোন উপায় করাও আবশ্যক হইতেছে। তোমরা কি পরামর্শ দাও?"

বৃদ্ধ সেনাপতিগণ সকলে একমত হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আপাততঃ সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় থাকাই কর্ত্তব্য। রাজা মানসিংহ কহিলেন, "আমি অভিপ্রায় করিতেছি যে, সমুদায় সৈন্যনাশের সম্ভাবনা না রাখিয়া কেবল অল্পসংখ্যক সেনা কোন দক্ষ সেনাপতির সহিত শত্রুসমক্ষে প্রেরণ করি।"

এক জন প্রাচীন মোগল সৈনিক কহিলেন, "মহারাজ! যথা তাবৎ সেনা পাঠাইতেও আশঙ্কা, তথা অল্পসংখ্যক সেনার দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধন হইবে?"

মানসিংহ কহিলেন, "অল্প সেনা সম্মুখ রণে অগ্রসর হইতে পাঠাইতে চাহিতেছি না। ক্ষুদ্র বল অস্পষ্ট থাকিয়া গ্রামপীড়নাসক্ত পাঠানদিগের সামান্য দলসকল কতক দমনে রাখিতে পারিবে।"

তখন মোগল কহিল, "মহারাজ! নিশ্চিত কালগ্রাসে কোন্ সেনাপতি যাইবে?"

মানসিংহ ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "কি! এত রাজপুত ও মোগল মধ্যে মৃত্যুকে ভয় করে না, এমন কি কেহই নাই?"

এই কথা শ্রুতিমাত্র পাঁচ সাত জন মোগল ও রাজপুত গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহারাজ! দাসেরা যাইতে প্রস্তুত আছে।" জগৎসিংহও তথায় উপস্থিত ছিলেন;

তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ; সকলের পশ্চাতে থাকিয়া কহিলেন, "অনুমতি হইলে এ দাসও দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধনে যত্ন করে।"

রাজা মানসিংহ সস্মিতবদনে কহিলেন, "না হবে কেন? আজ জানিলাম যে, মোগল রাজপুত নাম লোপের বিলম্ব আছে। তোমরা সকলেই এ দুষ্কর কার্য্যে প্রস্তুত, এখন কাহাকে রাখিয়া কাহাকে পাঠাই?"

এক জন পারিষদ সহাস্যে কহিল, "মহারাজ! অনেকে যে, এ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, সে ভালই হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেনাব্যয়ের অল্পতা করিতে পারিবেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সেনা লইয়া যাইতে স্বীকৃত হয়েন, তাঁহাকেই রাজকার্য্য সাধনের ভার দিউন।"

রাজা কহিলেন, "এ উত্তম পরামর্শ।" পরে প্রথম উদ্যমকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত সংখ্যক সেনা লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর?" সেনাপতি কহিলেন, "পঞ্চদশ সহস্র পদাতিবলে রাজকার্য্য উদ্ধার করিব।"

রাজা কহিলেন, "এ শিবির হইতে পঞ্চদশ সহস্র ভগ্ন করিলে অধিক থাকে না। কোন্ বীর দশ সহস্র লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতে চাহে?"

সেনাপতিগণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজার প্রিয়পাত্র যশোবন্তসিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা রাজাদেশ পালন করিতে অনুমতি প্রার্থিত হইলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার জগৎসিংহ তাঁহার দৃষ্টির অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তৎপ্রতি রাজার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! রাজপ্রসাদ হইলে এ দাস পঞ্চ সহস্র সহায়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখা-পারে রাখিয়া আইসে।"

রাজা মানসিংহ অবাক্ হইলেন। সেনাপতিগণ কানাকানি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা কহিলেন, "পুত্র! আমি জানি যে, তুমি রাজপুতকুলের গরিমা; কিন্তু তুমি অন্যায় সাহস করিতেছ।"

জগৎসিংহ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "যদি প্রতিজ্ঞাপালন না করিয়া বাদশাহের সেনাবল অপচয় করি, তবে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইব।"

রাজা মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার রাজপুতকুলধর্ম্ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত করিব না; তুমিই এ কার্য্যে যাত্রা কর।"

এই বলিয়া রাজকুমারকে বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন। সেনাপতিগণ স্ব স্ব শিবিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গড় মান্দারণ

যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির-মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন।

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশিরঃপর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগ-মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।

বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্দিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইস্মাইল গাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধরসিংহ নামে এক জন হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্রসিংহনামা জয়ধরসিংহের এক জন উত্তরপুরুষ এখানে বসতি করিতেন।

যৌবনকালে বীরেন্দ্রসিংহের পিতার সহিত সম্প্রীতি ছিল না। বীরেন্দ্রসিংহ স্বভাবতঃ দাম্ভিক এবং অধীর ছিলেন, পিতার আদেশ কদাচিৎ প্রতিপালন করিতেন, এজন্য পিতা-পুত্রে সর্ব্বদা বিবাদ বচসা হইত। পুত্রের বিবাহার্থ বৃদ্ধ ভূস্বামী নিকটস্থ স্বজাতীয় অপর কোন ভূস্বামিকন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা পুত্রহীন, এজন্য এই

বিবাহে বীরেন্দ্রের সম্পত্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা; কন্যাও সুন্দরী বটে, সুতরাং এমত সম্বন্ধ বৃদ্ধের বিবেচনায় অতি আদরণীয় বোধ হইল; তিনি বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র সে সম্বন্ধে আদর না করিয়া নিজ পল্লীস্থ এক পতিপুত্রহীনা দরিদ্রা রমণীর দুহিতাকে গোপনে বিবাহ করিয়া আবার বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধ রোষপরবশ হইয়া পুত্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; যুবা পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যোদ্ধৃবৃত্তি অবলম্বন করণাশয়ে দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা, এজন্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি মাতৃকুটীরে রহিলেন।

এদিকে পুত্র দেশান্তর যাইলে পর বৃদ্ধ ভূস্বামীর অন্তঃকরণে পুত্র-বিচ্ছেদে মনঃপীড়ার সঞ্চার হইতে লাগিল; গতানুশোচনার পরবশ হইয়া পুত্রের সংবাদ আনয়নে যত্নবান্ হইলেন; কিন্তু যত্নে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পুত্রকে পুনরানয়ন করিতে না পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে পুত্রবধূকে দরিদ্রার গৃহ হইতে সাদরে নিজালয়ে আনিলেন। উপযুক্ত কালে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। কিছু দিন পরে কন্যার প্রসূতির পরলোক প্রাপ্তি হইল।

বীরেন্দ্র দিল্লীতে উপনীত হইয়া মোগল সম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুতসেনামধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন; অল্পকালে নিজগুণে উচ্চপদস্থ হইতে পারিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ কয়েক বৎসরে ধন ও যশ সঞ্চয় করিয়া পিতার লোকান্তরসংবাদ পাইলেন। আর এক্ষণে বিদেশ পর্য্যটন বা পরাধীনবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বীরেন্দ্রের সহিত দিল্লী হইতে অনেকানেক সহচর আসিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক পরিচারিকা আর এক পরমহংস ছিলেন। এই আখ্যায়িকায় এই দুই জনের পরিচয় আবশ্যক হইবেক। পরিচারিকার নাম বিমলা, পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী।

বিমলা গৃহমধ্যে গৃহকর্ম্মে বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের কন্যার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন, তদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে বিমলার অবস্থিতি করার অন্য কারণ লক্ষিত হইত না, সুতরাং তাঁহাকে দাসী বলিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু বিমলাতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল না। গৃহিণী যাদৃশী মান্যা, বিমলা পৌরগণের নিকটে প্রায় তাদৃশী মান্যা ছিলেন; পৌর-জন সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল। মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত যে, বিমলা যৌবনে পরমা সুন্দরী ছিলেন। প্রভাতে চন্দ্রাস্তের ন্যায় সে রূপের প্রতিভা এ বয়সেও ছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে অভিরাম স্বামীর এক জন শিষ্য ছিলেন, তাঁহার

অলঙ্কারশাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল। তিনি বিমলাকে দেখিয়া বলিতেন, "দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত; মদন-আগুন যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।" এইখানে বলা উচিত, যে দিন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এইরূপ রসিকতা করিয়া ফেলিলেন, সেই দিন অবধি বিমলা তাঁহার নাম রাখিলেন—"রসিকরাজ রসোপাধ্যায়।"

আকারেঙ্গিত ব্যতীত বিমলার সভ্যতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহা সামান্যা পরিচারিকার সম্ভবে না। অনেকে এরূপ বলিতেন যে, বিমলা বহুকাল মোগল সম্রাটের পুরবাসিনী ছিলেন। এ কথা সত্য, কি মিথ্যা, তাহা বিমলাই জানিতেন, কিন্তু কখন সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিতেন না।

বিমলা বিধবা, কি সধবা? কে জানে? তিনি অলঙ্কার পরিতেন, একাদশী করিতেন না। সধবার ন্যায় সকল আচরণ করিতেন।

দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে বিমলা যে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাহার পরিচয় মন্দিরমধ্যে দেওয়া গিয়াছে। তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহের অপর সমভিব্যাহারী অভিরাম স্বামী সর্ব্বদা দুর্গমধ্যে থাকিতেন না। মধ্যে মধ্যে দেশপর্য্যটনে গমন করিতেন। দুই এক মাস গড় মান্দারণে, দুই এক মাস বিদেশ পরিভ্রমণে যাপন করিতেন। পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের দীক্ষাগুরু; বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান এবং আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি, সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না ও গুরুদত্ত পরামর্শও প্রায় সতত সফল হইত। বস্তুতঃ অভিরাম স্বামী বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; আরও নিজ ব্রতধর্ম্মে, সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন; প্রয়োজন মতে রাগক্ষোভাদি দমন করিয়া স্থিরচিত্তে বিষয়ালোচনা করিতে পারিতেন। সে স্থলে যে অধীর দাম্ভিক বীরেন্দ্রসিংহের অভিসন্ধি অপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ ফলপ্রদ হইবে আশ্চর্য্য কি?

বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভিন্ন আশ্‌মানি নাম্নী এক জন দাসী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে আসিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা

তিলোত্তমা ও বিমলা শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবস পরে বীরেন্দ্রসিংহ নিজ দেওয়ানখানায় মছনদে বসিয়া আছেন, এমন সময় অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইলেন; অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রের হস্তদত্ত কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন, অনুমতিক্রমে বীরেন্দ্র পুনরুপবেশন করিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, "বীরেন্দ্র! অদ্য তোমার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে।"

বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে মোগল পাঠানের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত।"

বী। হাঁ; কোন বিশেষ গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হওয়াই সম্ভব।

অ। সম্ভব—এক্ষণে কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ?

বীরেন্দ্র সদর্পে উত্তর করিলেন, "শত্রু উপস্থিত হইলে বাহুবলে পরাঙ্মুখ করিব।"

পরমহংস অধিকতর মৃদুভাবে কহিলেন, "বীরেন্দ্র! এ তোমার তুল্য বীরের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর; কিন্তু কথা এই যে, কেবল বীরত্বে জয়লাভ নাই; যথানীতি সন্ধিবিগ্রহ করিলেই জয়লাভ। তুমি নিজে বীরাগ্রগণ্য; কিন্তু তোমার সেনা সহস্রাধিক নহে; কোন্ যোদ্ধা সহস্রেক সেনা লইয়া শতগুণ সেনা বিমুখ করিতে পারে? মোগল পাঠান উভয় পক্ষই সেনা-বলে তোমার অপেক্ষা শতগুণে বলবান্; এক পক্ষের সাহায্য ব্যতীত অপর পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। এ কথায় রুষ্ট হইও না, স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর। আরও কথা এই যে, দুই পক্ষেরই সহিত শত্রুভাবে প্রয়োজন কি? শত্রু ত মন্দ; দুই শত্রুর অপেক্ষা এক শত্রু ভাল না? অতএব আমার বিবেচনায় পক্ষাবলম্বন করাই উচিত।"

বীরেন্দ্র বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন?"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ,—যে পক্ষ অবলম্বন করিলে অধর্ম্ম নাই, সেই পক্ষে যাও, রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ, রাজপক্ষ অবলম্বন কর।"

বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রাজা কে? মোগল পাঠান উভয়েই রাজত্ব লইয়া বিবাদ।"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।"

বী। আক্‌বর শাহা?

অ। অবশ্য।

এই কথায় বীরেন্দ্রসিংহ অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিলেন; ক্রমে চক্ষু আরক্তবর্ণ হইল; অভিরাম স্বামী আকারেঙ্গিত দেখিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্র! ক্রোধ সংবরণ কর, আমি তোমাকে দিল্লীশ্বরের অনুগত হইতে বলিয়াছি; মানসিংহের আনুগত্য করিতে বলি নাই।"

বীরেন্দ্রসিংহ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পরমহংসকে দেখাইলেন; দক্ষিণ হস্তের উপর বাম হস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ও পাদপদ্মের আশীর্ব্বাদে এই হস্ত মানসিংহের রক্তে প্লাবিত করিব।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "স্থির হও; রাগান্ধ হইয়া আত্মকার্য্য নষ্ট করিও না; মানসিংহের পূর্ব্বকৃত অপরাধের অবশ্য দণ্ড করিও, কিন্তু আক্‌বর শাহের সহিত যুদ্ধে কার্য্য কি?"

বীরেন্দ্র সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, "আক্‌বর শাহের পক্ষ হইলে কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে? কোন্ যোদ্ধার সাহায্য করিতে হইবে? কাহার আনুগত্য করিতে হইবে? মানসিংহের। গুরুদেব! এ দেহ বর্ত্তমানে এ কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহ হইতে হইবে না।"

অভিরাম স্বামী বিষণ্ণ হইয়া নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি পাঠানের সহায়তা করা তোমার শ্রেয়ঃ হইল?"

বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয়ঃ?"

অ। হাঁ, পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা শ্রেয়ঃ।

বী। তবে আমার পাঠান-সহকারী হওয়া শ্রেয়ঃ।

অভিরাম স্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় নীরব হইলেন; চক্ষে তাঁহার বারিবিন্দু উপস্থিত হইল। দেখিয়া বীরেন্দ্রসিংহ যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "গুরো! ক্ষমা করুন; আমি না জানিয়া কি অপরাধ করিলাম আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "শ্রবণ কর, আমি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত জ্যোতিষী গণনায় নিযুক্ত আছি, তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা

আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ; স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম।" বীরেন্দ্রসিংহের মুখ বিশুষ্ক হইল; আগ্রহসহকারে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণনায় কি দেখিলেন?" পরমহংস কহিলেন, "দেখিলাম যে, মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।" বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। অভিরাম স্বামী কহিতে লাগিলেন, "মোগলেরা বিপক্ষ হইলেই তৎকর্ত্তৃক তিলোত্তমার অমঙ্গল সম্ভবে; স্বপক্ষ হইলে সম্ভবে না, এজন্যই আমি তোমাকে মোগল পক্ষে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছিলাম। এই কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে মনঃপীড়া দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; মনুষ্যযত্ন বিফল; বুঝি ললাটলিপি অবশ্য ঘটিবে, নহিলে তুমি এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবে কেন?"

বীরেন্দ্রসিংহ মৌন হইয়া থাকিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, "বীরেন্দ্র, দ্বারে কতলু খাঁর দূত দণ্ডায়মান; আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার নিষেধক্রমেই দৌবারিকেরা এ পর্য্যন্ত তাহাকে তোমার সম্মুখে আসিতে দেয় নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য সমাপন হইয়াছে, দূতকে আহ্বান করিয়া উচিত প্রত্যুত্তর দাও।" বীরেন্দ্রসিংহ নিশ্বাসসহকারে মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব! যত দিন তিলোত্তমাকে না দেখিয়াছিলাম, তত দিন কন্যা বলিয়া তাহাকে স্মরণও করিতাম না; এক্ষণে তিলোত্তমা ব্যতীত আর আমার সংসারে কেহই নাই; আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম; অদ্যাবধি ভূতপূর্ব্ব বিসর্জ্জন দিলাম; মানসিংহের অনুগামী হইব; দৌবারিক দূতকে আনয়ন করুক।"

আজ্ঞামতে দৌবারিক দূতকে আনয়ন করিল। দূত কতলু খাঁর পত্র প্রদান করিল। পত্রের মর্ম্ম এই যে, বীরেন্দ্রসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা আর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠানশিবিরে প্রেরণ করুন, নচেৎ কতলু খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা গড় মান্দারণে প্রেরণ করিবেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "দূত! তোমার প্রভুকে কহিও, তিনিই সেনা প্রেরণ করুন।" দূত নতশির হইয়া প্রস্থান করিল।

সকল কথা অন্তরালে থাকিয়া বিমলা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অসাবধানতা

দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষবাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বরপ্রতিবিম্ব স্রোতস্বতীজলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল ; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল ; দুর্গমধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল ; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বর-তলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল ; আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারু বাস কম্পিত করিতেছিল।

তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্ভ বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃপুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ-পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখনও চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যপ্রভাপ্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধরদন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্ত্তি নহে ; যে মূর্ত্তি কোমলতা, মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতিমধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।

তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক ; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে ; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে ; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম,

নিবিড়বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার; আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দ্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত; তাহাতে "বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ-চকিত" কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, উষাকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ; সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না; তিলোত্তমা অপাঙ্গে অর্দ্ধদৃষ্টি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে; তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুখানি পড়িয়া যাইত; তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর দুইখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু হাসি হাসি; সে ওষ্ঠাধরে যদি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিল না; বয়সের নবীনতা প্রযুক্তই হউক বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতাগুণ ছিল না। অথচ তন্বীর শরীরমধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত। সুগোল প্রকোষ্ঠে রত্নবলয়; সুগোল বাহুতে হীরকমণ্ডিত তাড়; সুগোল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়; সুগোল ঊরুতে মেখলা; সুগঠন অংসোপরে স্বর্ণহার, সুগঠন কণ্ঠে রত্নকণ্ঠী; সর্ব্বত্রের গঠন সুন্দর।

তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন? সায়াহ্নগগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন? তাহা হইলে ভূতলে চক্ষু কেন? নদীতীরজ কুসুমসুবাসিত বায়ু সেবন করিতেছেন? তাহা হইলে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইবে কেন? মুখের এক পার্শ্ব ব্যতীত ত বায়ু লাগিতেছে না। গোচারণ দেখিতেছেন? তাও নয়, গাভীসকল ত ক্রমে ক্রমে গৃহে আসিল; কোকিল-রব শুনিতেছেন? তবে মুখ এত ম্লান কেন? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।

দাসীতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। তিলোত্তমা চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখান পুস্তক লইয়া প্রদীপের কাছে বসিলেন। তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন; অভিরাম স্বামীর নিকট

সংস্কৃত পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি কাদম্বরী। কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কাদম্বরী পরিত্যাগ করিলেন। আর একখান পুস্তক আনিলেন; সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তা; কখন পড়েন, কখন ভাবেন, আর বার পড়েন, আর বার অন্যমনে ভাবেন; বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না। তাহা ত্যাগ করিয়া গীতগোবিন্দ পড়িতে লাগিলেন; গীতগোবিন্দ কিছুক্ষণ ভাল লাগিল, পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসি হাসিয়া পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন। পরে নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যার উপরে বসিয়া রহিলেন। নিকটে একটা লেখনী ও মসীপাত্র ছিল; অন্যমনে তাহা লইয়া পালঙ্কের কাষ্ঠে এ ও তা "ক" "স" "ম" ঘর, দ্বার, গাছ, মানুষ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে খাটের এক বাজু কালির চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল; যখন আর স্থান নাই, তখন সে বিষয়ে চেতনা হইল। নিজ কার্য্য দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; আবার কি লিখিয়াছেন, তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন। কি লিখিয়াছেন? "বাসবদত্তা," "মহাশ্বেতা," "ক," "ঈ," "ই," "প," একটা বৃক্ষ, সেঁজুতির শিব, "গীতগোবিন্দ," "বিমলা," লতা, পাতা, হিজি, বিজি, গড়—সর্ব্বনাশ, আর কি লিখিয়াছেন?

"কুমার জগৎসিংহ।"

লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্তবর্ণ হইল। নির্ব্বুদ্ধি! ঘরে কে আছে যে লজ্জা?

"কুমার-জগৎসিংহ।" তিলোত্তমা দুইবার, তিনবার, বহুবার পাঠ করিলেন; দ্বারের দিকে চাহেন আর পাঠ করেন; পুনর্ব্বার চাহেন আর পাঠ করেন, যেন চোর চুরি করিতেছে।

বড় অধিকক্ষণ পাঠ করিতে সাহস হইল না, কেহ আসিয়া দেখিতে পাইবে। অতি ব্যস্তে জল আনিয়া লিপি ধৌত করিলেন; ধৌত করিয়া মনঃপূত হইল না; বস্ত্র দিয়া উত্তম করিয়া মুছিলেন; আবার পড়িয়া দেখিলেন, কালির চিহ্ন মাত্র নাই; তথাপি বোধ হইল, যেন এখনও পড়া যায়; আবার জল আনিয়া ধুইলেন, আবার বস্ত্র দিয়া মুছিলেন, তথাপি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেখা রহিয়াছে—

"কুমার জগৎসিংহ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিমলার মন্ত্রণা

বিমলা অভিরাম স্বামীর কুটীরমধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। অভিরাম স্বামী ভূমির উপর যোগাসনে বসিয়াছেন। জগৎসিংহের সহিত যে প্রকারে বিমলা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বিমলা তাহা আদ্যোপান্ত অভিরাম স্বামীর নিকট বর্ণন করিতেছিলেন; বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "আজ চতুর্দ্দশ দিবস; কাল পক্ষ পূর্ণ হইবেক।" অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "উচিত পরামর্শ জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

স্বামী কহিলেন, "উত্তম, আমার পরামর্শ এই যে, এ বিষয় আর মনে স্থান দিও না।"

বিমলা অতি বিষণ্ণ বদনে নীরব হইয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষণ্ণ হইলে কেন?"

বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমার কি উপায় হইবে?"

অভিরাম স্বামী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তিলোত্তমার মনে কি অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে?"

বিমলা কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "আপনাকে কত কহিব! আমি আজ চৌদ্দ দিন অহোরাত্র তিলোত্তমার ভাবগতিক বিলক্ষণ করিয়া দেখিতেছি, আমার মনে এমন বোধ হইয়াছে যে, তিলোত্তমার মনোমধ্যে অতি প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে।"

পরমহংস ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোক; মনোমধ্যে অনুরাগের লক্ষণ দেখিলেই গাঢ় অনুরাগ বিবেচনা কর। বিমলে, তিলোত্তমার মনের সুখের জন্য চিন্তিত হইও না; বালিকা-স্বভাববশতঃই প্রথম দর্শনে মনশ্চাঞ্চল্য হইয়াছে; এ বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তা উত্থাপন না হইলেই শীঘ্র জগৎসিংহকে বিস্মৃত হইবে।"

বিমলা কহিল, "না না, প্রভু, সে লক্ষণ নয়। পক্ষমধ্যে তিলোত্তমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কি বয়স্যাদিগের সঙ্গে সেরূপ দিবারাত্র হাসিয়া কথা কহে না; তিলোত্তমা আর প্রায় কথা কয় না; তিলোত্তমার পুস্তকসকল পালঙ্কের নীচে পড়িয়া পচিতেছে; তিলোত্তমার ফুলগাছসকল জলাভাবে শুষ্ক হইল; তিলোত্তমার পাখীগুলিতে আর সে যত্ন নাই; তিলোত্তমা নিজে আহার করে না; রাত্রে নিদ্রা যায় না;

তিলোত্তমা বেশভূষা করে না; তিলোত্তমা কথন চিন্তা করে না, এক্ষণে দিবানিশি অন্যমনে থাকে। তিলোত্তমার মুখে কালিমা পড়িয়াছে।"

অভিরাম স্বামী শুনিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন, "আমার বোধ ছিল যে, দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না; তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচরিত্র, ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু কি করিবে? বীরেন্দ্র এ সম্বন্ধে সম্মত হইবে না।"

বিমলা কহিল, "আমি সেই আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ করি নাই, মন্দিরমধ্যেও জগৎসিংহকে পরিচয় দিই নাই। কিন্তু এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয়,"—এই কথা বলিতে বিমলার মুখের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইল—"এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয় মানসিংহের সহিত মিত্রতা করিলেন, তবে জগৎসিংহকে জামাতা করিতে হানি কি?"

অ। মানসিংহই বা সম্মত হইবে কেন?

বি। না হয়, যুবরাজ স্বাধীন।

অ। জগৎসিংহই বা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিবে কেন?

বি। জাতিকুলের দোষ কোন পক্ষেই নাই, জয়ধরসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরাও যদুবংশীয়।

অ। যদুবংশীয় কন্যা মুসলমানের শ্যালকপুত্রের বধূ হইবে?

বিমলা উদাসীনের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিল, "না হইবেই বা কেন, যদুবংশের কোন্ কুল ঘৃণ্য?"

এই কথা বলিবামাত্র ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুরিত হইতে লাগিল; কঠোর স্বরে কহিলেন, "পাপীয়সি! নিজ হতভাগ্য বিস্মৃত হও নাই? দূর হও!"

নবম পরিচ্ছেদ

কুলতিলক

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে সসৈন্য বিদায় হইয়া যে যে কার্য্য করিলেন, তাহাতে পাঠান সৈন্যমধ্যে মহাভীতি প্রচার হইল। কুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া তিনি কতলু খাঁর পঞ্চাশৎ সহস্রকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিবেন, যদিও এ পর্য্যন্ত তত দূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি শিবির হইতে আসিয়া দুই সপ্তাহে যে পর্য্যন্ত যোদ্ধৃপতিত্ব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ

করিয়া মানসিংহ কহিয়াছিলেন, "বুঝি আমার কুমার হইতে রাজপুত নামের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"

জগৎসিংহ উত্তমরূপে জানিতেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া পঞ্চাশৎ সহস্রকে সম্মুখ-সংগ্রামে বিমুখ করা কোন রূপেই সম্ভব নহে, বরং পরাজয় বা মৃত্যুই নিশ্চয়। অতএব সম্মুখসংগ্রামের চেষ্টায় না থাকিয়া, যাহাতে সম্মুখসংগ্রাম না হয়, এমন প্রকার রণপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজ সামান্যসংখ্যক সেনা সর্ব্বদা অতি গোপনে লুক্কায়িত রাখিতেন; নিবিড় বনমধ্যে বা ঐ প্রদেশে সমুদ্র-তরঙ্গবৎ কোথাও নিম্ন, কোথাও উচ্চ যে সকল ভূমি আছে, তন্মধ্যে এমন স্থানে শিবির করিতেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূমিখণ্ড সকলের অন্তরালে, অতি নিকট হইতেও কেহ তাঁহার সেনা দেখিতে পাইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিয়া, যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান সেনার সন্ধান পাইতেন, তরঙ্গ-প্রপাতবৎ বেগে তদুপরি সসৈন্য পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক চর ছিল; তাহারা ফলমূলমৎস্যাদিবিক্রেতা বা ভিক্ষুক উদাসীন ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদির বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পাঠান-সেনার গতিবিধির সন্ধান আনিয়া দিত। জগৎসিংহ সংবাদ পাইবামাত্র অতি সাবধানে অথচ দ্রুতগতি এমন স্থানে গিয়া সৈন্য সংস্থাপন করিতেন যে, যেন আগন্তুক পাঠান-সেনার উপরে সুকৌশলে এবং অপূর্ব্বদৃষ্ট হইয়া আক্রমণ করিতে পারেন। যদি পাঠান-সেনা অধিকসংখ্যক হইত, তবে জগৎসিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করার কোন স্পষ্ট উদ্যম করিতেন না; কেন না, তিনি জানিতেন, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় এক যুদ্ধে পরাজয় হইলে সকল নষ্ট হইবে। তখন কেবল পাঠান-সেনা চলিয়া গেলে সাবধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য, অশ্ব, কামান ইত্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া আসিতেন। আর যদি পাঠান-সেনা প্রবল না হইয়া স্বল্পসংখ্যক হইত, তবে যতক্ষণে সেনা নিজ মনোমত স্থান পর্য্যন্ত না আসিত, সে পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গোপনীয় স্থানে থাকিতেন; পরে সময় বুঝিয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চীৎকার শব্দে ধাবমান হইয়া হতভাগ্য পাঠানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন। সে অবস্থায় পাঠানেরা শত্রুর নিকটস্থিতি অবগত থাকিত না; সুতরাং রণ জন্য প্রস্তুত থাকিত না। অকস্মাৎ শত্রুপ্রবাহমুখে পতিত হইয়া প্রায় বিনা যুদ্ধে প্রাণ হারাইত।

এইরূপে বহুতর পাঠান-সৈন্য নিপাত হইল। পাঠানেরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল; এবং সম্মুখসংগ্রামে জগৎসিংহের সৈন্য বিনষ্ট করিবার জন্য বিশেষ সযত্ন হইল। কিন্তু

জগৎসিংহের সৈন্য কোথায় থাকে, কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; কেবল যমদূতের ন্যায় পাঠান-সেনার মৃত্যুকালে একবার দেখা দিয়া মৃত্যুকার্য্য সম্পাদন করিয়া অন্তর্ধান করে। জগৎসিংহ কৌশলময়; তিনি পঞ্চ সহস্র সেনা সর্ব্বদা একত্র রাখিতেন না; কোথায় সহস্র, কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় দ্বিশত, কোথায় দ্বিসহস্র এইরূপে ভাগে ভাগে, যখন যথায় যেরূপ শত্রু সন্ধান পাইতেন, তখন সেইরূপ পাঠাইতেন; কার্য্য সম্পাদন হইলে আর তথায় রাখিতেন না। কখন্ কোন্খানে রাজপুত আছে, কোন্খানে নাই, পাঠানেরা কিছুই স্থির করিতে পারিত না। কতলু খাঁর নিকট প্রত্যহই সেনানাশের সংবাদ আসিত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সকল সময়েই অমঙ্গল সংবাদ আসিত। ফলে যে কার্য্যেই হউক না, পাঠান-সেনার অল্প সংখ্যায় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দুঃসাধ্য হইল। লুঠপাট একেবারে বন্ধ হইল; সেনাসকল দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল; অধিকন্তু আহার আহরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। শত্রুপীড়িত প্রদেশ এইরূপ সুশাসিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে এই পত্র লিখিলেন,

"কুলতিলক! তোমা হইতে রাজ্যাধিকার পাঠানশূন্য হইবে জানিলাম; অতএব তোমার সাহায্যার্থ আর দশ সহস্র সেনা পাঠাইলাম।"

যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিলেন,—

"মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়; আর সেনা আইসে ভাল; নচেৎ ও শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাস পঞ্চ সহস্রে ক্ষত্রকুলোচিত প্রতিজ্ঞাপালন করিবেক।"

কুমার বীরমদে মত্ত হইয়া অবাধে রণজয় করিতে লাগিলেন। শৈলেশ্বর! তোমার মন্দিরমধ্যে যে সুন্দরীর সরল দৃষ্টিতে এই যোদ্ধা পরাভূত হইয়াছিলেন, সে সুন্দরীকে সেনা-কোলাহল মধ্যে কি তাঁহার একবারও মনে পড়ে নাই? যদি না পড়িয়া থাকে, তবে জগৎসিংহ তোমারই ন্যায় পাষাণ।

দশম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণার পর উদ্যোগ

যে দিবস অভিরাম স্বামী বিমলার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহার পরদিন প্রদোষকালে বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন।

পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়ার বেশভূষা? কেনই বা না করিবে? বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢলঢল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক; পাঠক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ বয়স হইয়া থাকে, তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন।

কে বিমলার সে তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর দেখিয়া বলিবে, এ যুবতী নয়? তাহার কজ্জলনিবিড় প্রশস্ত লোচনের চকিত কটাক্ষ দেখিয়া কে বলিবে যে, এ চতুর্ব্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে? কি চক্ষু! সুদীর্ঘ; চঞ্চল; আবেশময়। কোন কোন প্রগল্‌ভ-যৌবনা কামিনীর চক্ষু দেখিবামাত্র মনোমধ্যে বোধ হয় যে, এই রমণী দর্পিতা; এ রমণী সুখলালসাপরিপূর্ণা। বিমলার চক্ষু সেইরূপ। আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি, বিমলা যুবতী, স্থিরযৌবনা বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সে চম্পকবর্ণ ত্বকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে যে, ষোড়শী তাঁহার অপেক্ষা কোমলা? যে একটি অতি ক্ষুদ্র গুচ্ছ অলককেশ কুঞ্চিত হইয়া কর্ণমূল হইতে অসাবধানে কপোলদেশে পড়িয়াছে, কে দেখিয়া বলিবে যে, যুবতীর কপোলে যুবতীর কেশ পড়ে নাই? পাঠক! মনশ্চক্ষু উন্মীলন কর; যেখানে বসিয়া দর্পণ সম্মুখে বিমলা কেশবিন্যাস করিতেছে, তাহা দেখ; বিপুল কেশগুচ্ছ বাম করে লইয়া, সম্মুখে রাখিয়া যে প্রকারে তাহাতে চিরণী দিতেছে, দেখ; নিজ যৌবন-ভাব দেখিয়া টিপি টিপি যে হাসিতেছে, তাহা দেখ; মধ্যে মধ্যে বীণানিন্দিত মধুর স্বরে যে মৃদু মৃদু সঙ্গীত করিতেছে, তাহা শ্রবণ কর; দেখিয়া শুনিয়া বল, বিমলা অপেক্ষা কোন্‌ নবীনা তোমার মনোমোহিনী?

বিমলা কেশ বিন্যস্ত করিয়া কবরী বন্ধন করিলেন না; পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বিত করিলেন। গন্ধবারিসিক্ত রুমালে মুখ পরিষ্কার করিলেন; গোলাপপূগকর্পূরপূর্ণ তাম্বূলে পুনর্ব্বার ওষ্ঠাধর রঞ্জন করিলেন; মুক্তাভূষিত কাঁচলি লইয়া বক্ষে দিলেন; সর্ব্বাঙ্গে কনকরত্নভূষা পরিধান করিলেন; আবার কি ভাবিয়া তাহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলেন; বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বসন পরিলেন; মুক্তা-শোভিত পাদুকা গ্রহণ করিলেন; এবং সুবিন্যস্ত চিকুরে যুবরাজদত্ত বহুমূল্য মুক্তাহার রোপিত করিলেন।

বিমলা বেশ করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে গমন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন; হাসিয়া কহিলেন, "এ কি, বিমলা! এ বেশ কেন?"

বিমলা কহিলেন, "তোর সে কথায় কাজ কি ?"

তি। সত্য বল না, কোথায় যাবে ?

বি। আমি যে কোথায় যাব, তোমাকে কে বলিল ?

তিলোত্তমা অপ্রতিভ হইলেন। বিমলা তাঁহার লজ্জা দেখিয়া সকরুণে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি অনেক দূর যাব।"

তিলোত্তমার মুখ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় হর্ষবিকসিত হইল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে ?"

বিমলা সেইরূপ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আন্দাজ কর না ?"

তিলোত্তমা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা তখন তাঁহার হস্তধারণ করিয়া, "শুন দেখি" বলিয়া গবাক্ষের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় কাণে কাণে কহিলেন, "আমি শৈলেশ্বর-মন্দিরে যাব; তথায় কোন রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

তিলোত্তমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিছুই উত্তর করিলেন না।

বিমলা বলিতে লাগিলেন, "অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল, ঠাকুরের বিবেচনায় জগৎসিংহের সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না। তোমার বাপ কোন মতে সম্মত হইবেন না। তাঁর সাক্ষাতে এ কথা পাড়িলে ঝাঁটা লাথি না খাই ত বিস্তর।"

"তবে কেন"—তিলোত্তমা অধোবদনে, অস্ফুটস্বরে, পৃথিবী পানে চাহিয়া এই দুইটি কথা বলিলেন, "তবে কেন ?"

বি। কেন ? আমি রাজপুত্রের নিকট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় দিব। শুধু পরিচয় পাইলে কি হইবে ? এখন ত পরিচয় দিই, তার পর তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তিনি করিবেন। রাজপুত্র যদি তোমাতে অনুরক্ত হন—

তিলোত্তমা তাঁহাকে আর বলিতে না দিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া কহিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া লজ্জা করে; তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না কেন, আমার কথা কাহাকে বলিও না, আর আমার কাছে কাহারও কথা বলিও না।"

বিমলা পুনর্ব্বার হাসিয়া কহিলেন, "তবে এ বালিকা-বয়সে এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে কেন ?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তুই যা! আমি আর তোর কোন কথা শুনিব না।"

বি। তবে আমি মন্দিরে যাব না।

তি। আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি? যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না।

বিমলা হাসিতে লাগিলেন; কহিলেন, "তবে আমি যাইব না।"

তিলোত্তমা পুনরায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, "যাও।" বিমলা আবার হাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি চলিলাম; আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ নিদ্রা যাইও না।"

তিলোত্তমাও ঈষৎ হাসিলেন; সে হাসির অর্থ এই যে, "নিদ্রা আসিবে কেন?" বিমলা তাহা বুঝিতে পারিলেন। গমনকালে বিমলা এক হস্ত তিলোত্তমার অংসদেশে ন্যস্ত করিয়া, অপর হস্তে তাঁহার চিবুক গ্রহণ করিলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সরল প্রেমপবিত্র মুখ প্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিতে পাইলেন, যখন বিমলা চলিয়া যান, তখন তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু বারি রহিয়াছে।

কক্ষদ্বারে আশ্‌মানি আসিয়া বিমলাকে কহিল, "কর্ত্তা তোমাকে ডাকিতেছেন।"

তিলোত্তমা শুনিতে পাইয়া, আসিয়া কাণে কাণে কহিলেন, "বেশ ত্যাগ করিয়া যাও।"

বিমলা কহিলেন, "ভয় নাই।"

বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গেলেন। তথায় বীরেন্দ্রসিংহ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এক দাসী পদসেবা, অন্যে ব্যজন করিতেছিল। পালঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বিমলা কহিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা?"

বীরেন্দ্রসিংহ মস্তকোত্তোলন করিয়া চমৎকৃত হইলেন; বলিলেন, "বিমলা, তুমি কর্ম্মান্তরে যাইবে না কি?"

বিমলা কহিলেন, "আজ্ঞা। আমার প্রতি কি আজ্ঞা ছিল?"

বী। তিলোত্তমা কেমন আছে? শরীর অসুস্থ ছিল, ভাল হইয়াছে?

বি। ভাল হইয়াছে।

বী। তুমি আমাকে ক্ষণেক ব্যজন কর, আশ্‌মানি তিলোত্তমাকে আমার নিকট ডাকিয়া আনুক।

ব্যজনকারিণী দাসী ব্যজন রাখিয়া গেল।

বিমলা আশ্‌মানিকে বাহিরে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন। বীরেন্দ্র অপরা দাসীকে কহিলেন, "লচমণি, তুই আমার জন্য পান তৈয়ার করিয়া আন।" পদসেবাকারিণী চলিয়া গেল।

বী। বিমলা, তোমার আজ এ বেশ কেন?

বি। আমার প্রয়োজন আছে।

বী। কি প্রয়োজন আছে আমি শুনিব।

বি। "তবে শুন্থন" বলিতে বলিতে বিমলা মন্মথশয্যারূপী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, "তবে শুন্থন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব।"

বী। যমের সঙ্গে না কি?

বি। কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই?

বী। সে মানুষ আজিও জন্মে নাই।

বি। এক জন ছাড়া।

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্‌মানির দৌত্য

এদিকে বিমলার ইঙ্গিতমত আশ্‌মানি গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিমলা আসিয়া তাহাকে কহিলেন, "আশ্‌মান্, তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।"

আশ্‌মানি কহিল, "বেশভূষা দেখিয়া আমিও ভাবিতেছিলাম, আজ কি একটা কাণ্ড।"

বিমলা কহিলেন, "আমি আজ কোন প্রয়োজনে অধিক দূর যাইব। এ রাত্রে একাকিনী যাইতে পারিব না; তুমি ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সঙ্গে লইতে পারিব না; তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

আশ্‌মানি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে?"

বিমলা কহিলেন, "আশ্‌মানি, তুমি ত সেকালে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে না?"

আশ্‌মানি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তবে তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কতকগুলা কাজ সারিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "আর একটা কথা আছে; মনে কর, যদি তোমার সঙ্গে আজ সেকালের কোন লোকের দেখা হয়, তবে কি তোমাকে সে চিনিতে পারিবে?"

আশ্‌মানি বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি?"

বিমলা কহিলেন, "মনে কর, যদি কুমার জগৎসিংহের সহিত দেখা হয়?"

আশ্‌মানি অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া গদ্গদ স্বরে কহিল, "এমন দিন কি হবে?"

বিমলা কহিলেন, "হইতেও পারে।"

আশ্‌মানি কহিল, "কুমার চিনিতে পারিবেন বৈ কি।"

বিমলা কহিলেন, "তবে তোমার যাওয়া হইবে না, আর কাহাকে লইয়া যাই,—একাও ত যাইতে পারি না।"

আশ্‌মানি কহিল, "কুমার দেখিব মনে বড়ই সাধ হইতেছে।"

বিমলা কহিলেন, "মনের সাধ মনে থাক্; এখন আমি কি করি?"

বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশ্‌মানি অকস্মাৎ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। বিমলা কহিলেন, "মর্! আপনা আপনি হেসে মরিস্ কেন?"

আশ্‌মানি কহিল, "মনে মনে ভাবিতেছিলাম, বলি আমার সোণার চাঁদ দিগ্‌গজকে তোমার সঙ্গে পাঠাইলে কি হয়?"

বিমলা হাসিয়া উল্লাসে কহিলেন, "সেই কথাই ভাল; রসিকরাজকেই সঙ্গে লইব।"

আশ্‌মানি বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি, আমি যে তামাসা করিতেছিলাম?"

বিমলা কহিলেন, "তামাসা না, বোকা বামুনকে আমার অবিশ্বাস নাই। অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না।"

আশ্‌মানি হাসিয়া কহিল, "সে ভার আমার; আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিতেছি, তুমি ফটকের সম্মুখে একটু অপেক্ষা করিও।"

এই বলিয়া আশ্‌মানি হাসিতে হাসিতে দুর্গমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে চলিল।

অভিরাম স্বামীর শিষ্য গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ইতিপূর্ব্বেই পাঠক মহাশয়ের নিকট একবার পরিচিত হইয়াছেন। যে হেতুতে বিমলা তাঁহার রসিকরাজ নাম রাখিয়াছিলেন, তাহাও পাঠক মহাশয় অবগত আছেন। সেই মহাপুরুষ এই কুটীরের অধিকারী।

দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকাল হইতে মাটি পর্য্যন্ত মাপিলে চৌদ্দপুয়া চারি হাত হইবেক; প্রস্থে রলা কাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছু মাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু একটু কুঁজো; অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরে মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা আছে তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে সুচ ফুটে। আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।

গজপতি, 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি সাধ করিয়া পান নাই। বুদ্ধিখানা অতি তীক্ষ্ণ। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাড়ে সাত মাসে "সহর্ণে র্ঘঃ" সূত্রটি ব্যাখ্যা শুদ্ধ মুখস্থ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহে আর দশ জনের গোলে হরিবোলে পঞ্চদশ বৎসর পাঠ করিয়া শব্দকাণ্ড শেষ করিলেন। পরে অন্য কাণ্ড আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অধ্যাপক ভাবিলেন, "দেখি দেখি কাণ্ডখানাই কি?" শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয়?" ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "রামকান্ত।" অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তোমার বিদ্যা হইয়াছে; তুমি এক্ষণে গৃহে যাও, তোমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে; আমার আর বিদ্যা নাই যে তোমাকে দান করিব।"

গজপতি অতি সাহঙ্কার-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "আমার এক নিবেদন—আমার উপাধি?"

অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তুমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, তোমার নূতন উপাধি আবশ্যক, তুমি 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি গ্রহণ কর।"

দিগ্‌গজ হৃষ্টচিত্তে গুরুপদে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিলেন।

গৃহে আসিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন, "ব্যাকরণাদিতে ত কৃতবিদ্য হইলাম। এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্মৃতি পাঠ করা আবশ্যক। শুনিয়াছি, অভিরাম স্বামী বড় পণ্ডিত, তিনি ব্যতীত আমাকে শিক্ষা দেয়, এমন লোক আর নাই, অতএব তাঁহার নিকটে গিয়া কিছু স্মৃতি শিক্ষা করা উচিত।" এই স্থির করিয়া দিগ্‌গজ দুর্গমধ্যে অধিষ্ঠান করিলেন। অভিরাম স্বামী অনেককে শিক্ষা দিতেন; কাহারও প্রতি বিরক্ত ছিলেন না। দিগ্‌গজ কিছু শিখুক বা না শিখুক, অভিরাম স্বামী তাহাকে পাঠ দিতেন।

গজপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত্ত নহেন; একটু আলঙ্কারিক, একটু একটু রসিক, ঘৃতভাণ্ড তাহার পরিচয়ের স্থল। তাঁহার রসিকতার আড়ম্বরটা কিছু আশ্‌মানির প্রতি গুরুতর হইত; তাহার কিছু গূঢ় তাৎপর্য্যও ছিল। গজপতি মনে করিতেন, "আমার তুল্য ব্যক্তির ভারতে কেবল লীলা করিতে আসা; এই আমার শ্রীবৃন্দাবন; আশ্‌মানি আমার রাধিকা।" আশ্‌মানিও রসিকা; মদনমোহন পাইয়া বানর-পোষার সাধ মিটাইয়া লইত। বিমলাও সন্ধান পাইয়া কখনও বানর নাচাইতে যাইতেন। দিগ্‌গজ মনে করিতেন, "এই আমার চন্দ্রাবলী জুটিয়াছে; না হবে কেন? যে ঘৃতভাণ্ড ঝাড়িয়াছি; ভাগ্যে বিমলা জানে না, ওটি আমার শোনা কথা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্‌মানির অভিসার

দিগ্‌গজ গজপতির মনোমোহিনী আশ্‌মানি কিরূপ রূপবতী, জানিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সাধ পূরাইব। কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনবিষয়ে গ্রন্থকারগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমার সদৃশ অকিঞ্চন জনের তৎপদ্ধতিবহির্ভূত হওয়া অতি ধৃষ্টতার বিষয়। অতএব প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য।

হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমলকমল-দলনিন্দিত-চরণ-ভক্তজন-বৎসলে! আমাকে সেই চরণকমলের ছায়া দান কর; আমি আশ্‌মানির রূপ বর্ণন করিব। হে অরবিন্দানন-সুন্দরীকুল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণি! হে বিশাল রসাল দীর্ঘ-সমাস-পটল-সৃষ্টিকারিণি! একবার পদনখের এক পার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণন করিব। সমাস-পটল, সন্ধি-বেগুন, উপমা-কাঁচাকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব। হে পণ্ডিতকুলেপ্সিত-পয়ঃপ্রস্রবিণি! হে মূর্খজনপ্রতি ক্বচিৎ কৃপাকারিণি! হে অঙ্গুলি-কণ্ডূয়ন-বিষমবিকার-সমুৎপাদিনি! হে বটতলা-বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও। মা! তোমার দুই রূপ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি

উত্তরচরিত, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না ; যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতিপ্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্ত্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছ, সেই মূর্ত্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশ্‌মানির রূপ বর্ণন করি।

আশ্‌মানির বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায় ; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটা কি ! আমি গর্ত্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ত্তের ভিতর গেলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন প্রমাদ ; সাপ গর্ত্তে গেলেন, মানুষ দংশন করে কে? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, সাপ বাহিরে আসিয়া, আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল ; মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল, সেই অবধি সাপের ফণা হইয়াছে। আশ্‌মানির মুখচন্দ্র অধিক সুন্দর, সুতরাং চন্দ্রদেব উদিত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভয় নাই, তুমি গিয়া উদিত হও, আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে ; সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি। নয়ন দুটি যেন খঞ্জন, পাছে পাখী ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া পলায়, এই জন্য বিধাতা পল্লবরূপ পিঁজরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায় মহাবিশাল ; দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল, সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে। কারণান্তরে দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন ; আর হস্তী কুম্ভ লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইলেন ; বাকি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, এ চূড়া অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক ; এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।

কপালের লিখন দোষে আশ্‌মানি বিধবা ! আশ্‌মানি দিগ্‌গজের কুটীরে আসিয়া দেখিল যে, কুটীরের দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাকিল, "ও ঠাকুর !"

কেউ উত্তর দিল না।

"বলি ও গোঁসাই !"

উত্তর নাই।

"মর্ বিট্‌লে কি করিতেছে ? ও রসিকরাজ রসোপাধ্যায় প্রভু !"

উত্তর নাই।

আশ্‌মানি কুটীরের দ্বারের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, এই জন্য কথা নাই, কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না। আশ্‌মানি ভাবিল, "ইহার আবার নিষ্ঠা; দেখি দেখি, কথা কহিয়া আবার খায় কি না।"

"বলি ও রসিকরাজ!"

উত্তর নাই।

"ও রসরাজ!"

উত্তর। "হুম্।"

বামুন ভাত গালে করিয়া উত্তর দিতেছে, ও ত কথা হলো না—এই ভাবিয়া আশ্‌মানি কহিল, "ও রসমাণিক!"

উত্তর। "হুম্।"

আ। বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।

উত্তর। "হু—উ—উম্!"

আ। বটে, বামুন হইয়া এই কাজ—আজি স্বামিঠাকুরকে বলে দেব, ঘরের ভিতর কে ও?

ব্রাহ্মণ সশঙ্কচিত্তে শূন্য ঘরের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে লাগিল।

আশ্‌মানি বলিল, "ও মাগি যে জেতে চাঁড়াল! আমি যে চিনি!"

দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। বলিল, "কে চাঁড়াল? ছুঁয়া পড়ে নি ত?"

আশ্‌মানি আবার কহিল, "ও, আবার খাও যে? কথা কহিয়া আবার খাও?"

দি। কই, কখন কথা কহিলাম?

আশ্‌মানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এই ত কহিলে।"

দি। বটে, বটে, বটে, তবে আর খাওয়া হইল না।

আ। হাঁ ত; উঠে আমায় দ্বার খুলে দাও।

আশ্‌মানি ছিদ্র হইতে দেখিতেছিল, ব্রাহ্মণ যথার্থই অন্নত্যাগ করিয়া উঠে। কহিল, "না, না, ও কয়টি ভাত খাইয়া উঠিও।"

দি। না, আর খাওয়া হইবে না, কথা কহিয়াছি।

আ। সে কি? না খাও ত আমার মাথা খাও।

দি। রাধে মাধব! কথা কহিলে কি আর আহার করিতে আছে?

আ। বটে, তবে আমি চলিলাম; তোমার সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা ছিল, কিছুই বলা হইল না। আমি চলিলাম।

দি। না, না, আশ্‌মান্! তুমি রাগ করিও না; আমি এই খাইতেছি।

ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিল; দুই তিন গ্রাস আহার করিবামাত্র আশ্‌মানি কহিল, "উঠ, হইয়াছে; দ্বার খোল।"

দি। এই কটা ভাত খাই।

আ। এ যে পেট আর ভরে না; উঠ, নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ, বলিয়া দিব।

দি। আঃ নাও; এই উঠিলাম।

ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুণ্ণমনে অন্নত্যাগ করিয়া, গণ্ডুষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশ্‌মানির প্রেম

দ্বার খুলিলে আশ্‌মানি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল যে, প্রণয়িনী আসিয়াছেন, ইঁহার সরস অভ্যর্থনা করা চাই, অতএব হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি।"

আশ্‌মানি কহিল, "এটি যে বড় সরস কবিতা, কোথা পাইলে?"

দি। তোমার জন্য এটি আজ রচনা করিয়া রাখিয়াছি।

আ। সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছি?

দি। সুন্দরি! তুমি বইস; আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।

আশ্‌মানি মনে মনে কহিল, "আলোপ্পেয়ে! তুমি হাত ধোবে? আমি তোমাকে ঐ এঁটো আবার খাওয়াব।"

প্রকাশ্যে কহিল, "সে কি, হাত ধোও যে, ভাত খাও না।"

গজপতি কহিলেন, "কি কথা, ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে?"

আ। কেন, তোমার ভাত রহিয়াছে যে? উপবাস করিবে?

দিগ্‌গজ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "কি করি, তুমি তাড়াতাড়ি করিলে।" এই বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে অন্নপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আশ্‌মানি কহিল, "তবে আবার খাইতে হইবে।"

দি। রাধে মাধব! গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, আবার খাইব?

আ। "হাঁ, খাইবে বই কি। আমারই উৎসৃষ্ট খাইবে।" এই বলিয়া আশ্‌মানি ভোজনপাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল।

ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

আশ্‌মানি উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

ব্রাহ্মণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

আ। খাও, শোন, কাহাকে বলিব না যে, তুমি আমার উৎসৃষ্ট খাইয়াছ। কেহ না জানিতে পারিলে দোষ কি?

দি। তাও কি হয়?

কিন্তু দিগ্‌গজের উদরমধ্যে অগ্নিদেব প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। দিগ্‌গজ মনে মনে করিতেছিল যে, আশ্‌মানি যেমন সুন্দরী হউক না কেন, পৃথিবী ইহাকে গ্রাস করুন, আমি গোপনে ইহার উৎসৃষ্টাবশেষ ভোজন করিয়া দহ্যমান উদর শীতল করি।

আশ্‌মানি ভাব বুঝিয়া বলিল, "খাও—না খাও, একবার পাতের কাছে বসো।"

দি। কেন? তাতে কি হইবে?

আ। আমার সাধ। তুমি কি আমার একটা সাধ পুরাইতে পার না?

দিগ্‌গজ বলিলেন, "শুধু পাতের কাছে বসিতে কি? তাহাতে কোন দোষ নাই। তোমার কথা রাখিলাম।" এই বলিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত আশ্‌মানির কথায় পাতের কাছে গিয়া বসিলেন। উদরে ক্ষুধা, কোলে অন্ন, অথচ খাইতে পারিতেছেন না—দিগ্‌গজের চক্ষে জল আসিল।

আশ্‌মানি বলিল, "শূদ্রের উৎসৃষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?"

পণ্ডিত বলিলেন, "নাইতে হয়।"

আ। তুমি আমায় কেমন ভালবাস, আজ বুঝিয়া পড়িয়া তবে আমি যাব। তুমি আমার কথায় এই রাত্রে নাইতে পার?

দিগ্‌গজ মহাশয় ক্ষুদ্র চক্ষু রসে অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া দীর্ঘ নাসিকা বাঁকাইয়া, মধুর হাসি আকর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "তার কথা কি? এখনই নাইতে পারি।"

আশ্‌মানি বলিল, "আমার ইচ্ছা হইয়াছে তোমার পাতে প্রসাদ পাইব। তুমি আপন হাতে আমাকে দুইটি ভাত মাখিয়া দাও।"

দিগ্‌গজ বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি? স্নানেই শুচি।" এই বলিয়া উৎস্পৃষ্টাবশেষ একত্রিত করিয়া মাখিতে লাগিল।

আশ্‌মানি বলিল, "আমি একটি উপকথা বলি শুন। যতক্ষণ আমি উপকথা বলিব, ততক্ষণ তুমি ভাত মাখিবে, নইলে আমি খাইব না।

দি। আচ্ছা।

আশ্‌মানি এক রাজা আর তাহার দুয়ো শুয়ো দুই রাণীর গল্প আরম্ভ করিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিল—আর ভাত মাখিতে লাগিল।

শুনিতে শুনিতে দিগ্‌গজের মন আশ্‌মানির গল্পে ডুবিয়া গেল—আশ্‌মানির হাসি, চাহনি ও নথের মাঝখানে আটকাইয়া রহিল। ভাত মাখা বন্ধ হইল—পাতে হাত লাগিয়া রহিল—কিন্তু ক্ষুধার যাতনাটা আছে। যখন আশ্‌মানির গল্প বড় জমিয়া আসিল—দিগ্‌গজের মন তাহাতে বড়ই নিবিষ্ট হইল—তখন দিগ্‌গজের হাত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পাত্রস্থ হাত, নিকটস্থ মাখা-ভাতের গ্রাস তুলিয়া, চুপি চুপি দিগ্‌গজের মুখে লইয়া গেল। মুখ হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। দন্ত বিনা আপত্তিতে তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। রসনা তাহা গলাধঃকরণ করাইল। নিরীহ দিগ্‌গজের কোন সাড়া ছিল না। দেখিয়া আশ্‌মানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তবে রে বিট্‌লে—আমার এঁটো না কি খাবি নে?"

তখন দিগ্‌গজের চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি আর এক গ্রাস মুখে দিয়া গিলিতে গিলিতে এঁটো হাতে আশ্‌মানির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। চর্ব্বণ করিতে করিতে কাঁদিয়া বলিল, "আমায় রাখ; আশ্‌মান্! কাহাকেও বলিও না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজহরণ

এমন সময় বিমলা আসিয়া, বাহির হইতে দ্বার নাড়িল। বিমলা দ্বারপার্শ্ব হইতে অলক্ষ্যে সকল দেখিতেছিল। দ্বারের শব্দ শুনিয়া দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। আশ্‌মানি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, বিমলা আসিতেছে—লুকোও লুকোও।"

দিগ্‌গজ ঠাকুর কাঁদিয়া কহিল, "কোথায় লুকাইব ?"

আশ্‌মানি বলিল, "ঐ অন্ধকার কোণে একটা কেলে-হাঁড়ি মাথায় দিয়া বসো গিয়া —অন্ধকারে ঠাওর পাইবে না।" দিগ্‌গজ তাহাই করিতে গেল—আশ্‌মানির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিস্মিত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাড়াতাড়িতে ব্রাহ্মণ একটা অড়হর ডালের হাঁড়ি পাড়িয়া মাথায় দিল—তাহাতে আধ হাঁড়ি রাঁধা অড়হর ডাল ছিল—দিগ্‌গজ যেমন হাঁড়ি উল্‌টাইয়া মাথায় দিবেন, অমনি মস্তক হইতে অড়হর ডালের শতধারা বহিল—টিকি দিয়া অড়হর ডালের স্রোত নামিল—স্কন্ধ, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও বাহু হইতে অড়হর ডালের ধারা, পর্ব্বত হইতে ভূতলগামিনী নদীসকলের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে নামিতে লাগিল ; উচ্চ নাসিকা অড়হরের প্রস্রবণবিশিষ্ট গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিমলা গৃহ প্রবেশ করিয়া দিগ্‌গজের শোভারাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজ বিমলাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেখিয়া বিমলার দয়া হইল। বিমলা বলিলেন, "কাঁদিও না। তুমি যদি এই অবশিষ্ট ভাতগুলি খাও, তবে আমরা কাহারও সাক্ষাতে এ সকল কথা বলিব না।"

ব্রাহ্মণ তখন প্রফুল্ল হইল ; প্রফুল্ল বদনে পুনশ্চ আহারে বসিল—ইচ্ছা, অঙ্গের অড়হর ডালটুকুও মুছিয়া লয়, কিন্তু তাহা পারিল না, কিংবা সাহস করিল না। আশ্‌মানির জন্য যে ভাত মাখিয়াছিল, তাহা খাইল। বিনষ্ট অড়হরের জন্য অনেক পরিতাপ করিল। আহার সমাপনান্তে আশ্‌মানি তাহাকে স্নান করাইল। পরে ব্রাহ্মণ স্থির হইলে বিমলা কহিলেন, "রসিক ! একটা বড় ভারি কথা আছে।"

রসিক কহিলেন, "কি ?"

বি। তুমি আমাদের ভালবাস ?

দি। বাসি নে ?

বি। দুই জনকেই ?

দি। দুই জনকেই।

বি। যা বলি, তা পারিবে ?

দি। পারিব না ?

বি। এখনই ?

দি। এখনই।

বি। এই দণ্ডে ?

দি। এই দণ্ডে।

বি। আমরা দুজনে কেন এসেছি জান ?

দি। না।

আশ্‌মানি কহিল, "আমরা তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাব।"

ব্রাহ্মণ অবাক্‌ হইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। বিমলা কষ্টে উচ্চ হাসি সম্বরণ করিলেন। কহিলেন, "কথা কও না যে ?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা তা তা"—বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইয়া উঠিল না।

আশ্‌মানি কহিল, "তবে কি পারিবে না ?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা—স্বামিঠাকুরকে বলিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "স্বামিঠাকুরকে আবার বল্‌বে কি ? এ কি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত যে স্বামিঠাকুরের কাছে ব্যবস্থা নিতে যাবে ?"

দি। না না, তা যাব না ; তা কবে যেতে হবে ?

বি। কবে ? এখনই চল, দেখিতেছ না, আমি গহনাপত্র লইয়া বাহির হইয়াছি।

দি। এখনই ?

বি। এখনই না ত কি ? নহিলে বল, আমরা অন্য লোকের তল্লাস করি।

গজপতি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "চল, যাইতেছি।"

বিমলা বলিলেন, "দোছোট লও।"

দিগ্‌গজ নামাবলী গায়ে দিলেন। বিমলা অগ্রে, ব্রাহ্মণ পশ্চাতে যাত্রা করেন, এমন সময়ে দিগ্‌গজ বলিলেন, "সুন্দরি !"

বি। কি ?

দি। আবার আসিবে কবে ?

বি। আসিব কি আবার ? একবারে চলিলাম।

হাসিতে দিগ্‌গজের মুখ পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন, "তৈজসপত্র রহিল যে।"

বি। ও সব তোমায় কিনে দিব।

ব্রাহ্মণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন ; কি করেন, স্ত্রীলোকেরা মনে করিবে, আমাদের ভালবাসে না, অভাবপক্ষে বলিলেন, "খুঙ্গীপুতি ?"

বিমলা বলিলেন, "শীঘ্র লও।"

বিদ্যাদিগ্‌গজের সবে দুখানি পুতি,—ব্যাকরণ আর একখানি স্মৃতি। ব্যাকরণখানি হস্তে লইয়া বলিলেন, "এখানিতে কাজই বা কি, এ ত আমার কণ্ঠে আছে।" এই বলিয়া কেবল স্মৃতিখানি খুঙ্গীর মধ্যে লইলেন। 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া বিমলা ও আশ্‌মানির সহিত যাত্রা করিলেন।

আশ্‌মানি কহিল, "তোমরা আগু হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

এই বলিয়া আশ্‌মানি গৃহে গেল, বিমলা ও গজপতি একত্র চলিলেন। অন্ধকারে উভয়ে অলক্ষ্য থাকিয়া দুর্গদ্বারের বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দিগ্‌গজ কহিলেন, "কই, আশ্‌মানি আসিল না?"

বিমলা কহিলেন, "সে বুঝি আসিতে পারিল না। আবার তাকে কেন?"

রসিকরাজ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন. "তৈজসপত্র।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজের সাহস

বিমলা দ্রুতপাদবিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন। নিশা অত্যন্ত অন্ধকার, নক্ষত্রালোকে সাবধানে চলিতে লাগিলেন। প্রান্তরপথে প্রবেশ করিয়া বিমলা কিঞ্চিৎ শঙ্কান্বিতা হইলেন; সমভিব্যাহারী নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, বাক্যব্যয়ও নাই। এমন সময়ে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিলে কিছু সাহস হয়, শুনিতে ইচ্ছাও করে। এই জন্য বিমলা গজপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসিকরতন! কি ভাবিতেছ?"

রসিকরতন বলিলেন, "বলি তৈজসপত্রগুলা!"

বিমলা উত্তর না দিয়া, মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক কাল পরে, বিমলা আবার কথা কহিলেন, "দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় কর?"

"রাম! রাম! রাম! রামনাম বল", বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া আসিলেন।

একে পায়, আরে চায়। বিমলা কহিলেন, "এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।" দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন। বিমলা বলিতে লাগিলেন, "আমরা সে দিন

শৈলেশ্বরের পূজা দিয়া আসিতেছিলাম, পথের মধ্যে বটতলায় দেখি যে, এক বিকটাকার মূর্ত্তি।"

অঞ্চলের তাড়নায় বিমলা জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণ থরহরি কাঁপিতেছে; বুঝিলেন যে, আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের গতিশক্তি রহিত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, "রসিকরাজ! তুমি গাইতে জান?"

রসিক পুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু? দিগ্‌গজ বলিলেন, "জানি বই কি।"

বিমলা বলিলেন, "একটি গীত গাও দেখি।"

দিগ্‌গজ আরম্ভ করিলেন,

"এ হুম্—উ, হুম্—
সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে।"

পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল।

রসিকের গীত চলিতে লাগিল।

"সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে।
মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী, কথা কয় হাসি হাসি;
বলে ও গোয়ালা মাসী—কলসী দিব ফেলে।"

দিগ্‌গজের আর গান হইল না; হঠাৎ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল; অমৃতময়, মানসোন্মাদকর, অপ্সরোহস্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।

নিস্তব্ধ প্রান্তরমধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিয়া সেই সপ্তস্বরপরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদাঘ পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।

দিগ্‌গজ নিশ্বাস রহিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন বিমলা সমাপ্ত করিলেন, তখন গজপতি কহিলেন, "আবার।"

বি। আবার কি?

দি। আবার একটি গাও।

বি। কি গায়িব?

দি। একটি বাঙলা গাও।

"গায়িতেছি" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত গায়িতে গায়িতে বিমলা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অঞ্চলে বিষম টান পড়িয়াছে; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গজপতি একেবারে তাঁহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণপণে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়াছেন। বিমলা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "কি হইয়াছে? আবার ভূত না কি?"

ব্রাহ্মণের বাক্য সরে না, কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "ঐ।"

বিমলা নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন প্রবল নিশ্বাসশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট দিকে পথপার্শ্বে একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন।

সাহসে নির্ভর করিয়া নিকটে গিয়া বিমলা দেখিলেন, একটি সুগঠন সুসজ্জীভূত অশ্ব মৃত্যুযাতনায় পড়িয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

বিমলা পথ বাহন করিতে লাগিলেন। সুসজ্জীভূত সৈনিক অশ্ব পথিমধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া তিনি চিন্তামগ্না হইলেন। অনেক ক্ষণ কথা কহিলেন না। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অতিবাহিত করিলে, গজপতি আবার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন।

বিমলা বলিলেন, "কি?"

গজপতি একটি দ্রব্য লইয়া দেখাইলেন। বিমলা দেখিয়া বলিলেন, "এ সিপাহির পাগ্‌ড়ি।" বিমলা পুনর্ব্বার চিন্তায় মগ্না হইলেন, আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন "যারই ঘোড়া, তারই পাগ্‌ড়ি? না, এ ত পদাতিকের পাগ্‌ড়ি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। বিমলা অধিকতর অন্যমনা হইলেন। অনেকক্ষণ পরে গজপতি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি, আর কথা কহ না যে?"

বিমলা কহিলেন, "পথে কিছু চিহ্ন দেখিতেছ?"

গজপতি বিশেষ মনোযোগের সহিত পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি, অনেক ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন।"

বি। বুদ্ধিমান্—কিছু বুঝিতে পারিলে?

দি। না।

বি। ওখানে মরা ঘোড়া, সেখানে সিপাহির পাগ্‌ড়ি, এখানে এত ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন, এতে কিছু বুঝিতে পারিলে না?—কারেই বা বলি!

দি। কি?

বি। এখনই বহুতর সেনা এই পথে গিয়াছে।

গজপতি ভীত হইয়া কহিলেন, "তবে একটু আস্তে হাঁট ; তারা খুব আগু হইয়া যাক।"

বিমলা হাস্য করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! তাহারা আগু হইবে কি? কোন্ দিকে ঘোড়ার খুরের সম্মুখ, দেখিতেছ না? এ সেনা গড় মান্দারণে গিয়াছে" বলিয়া বিমলা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

অচিরাৎ শৈলেশ্বরের মন্দিরের ধবল শ্রী নিকটে দেখিতে পাইলেন। বিমলা ভাবিলেন যে, রাজপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নাই ; বরং তাহাতে অনিষ্ট আছে। অতএব কি প্রকারে তাহাকে বিদায় দিবেন, চিন্তা করিতেছিলেন। গজপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বিমলার পৃষ্ঠের নিকট আসিয়া অঞ্চল ধরিয়াছেন ; বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

ব্রাহ্মণ অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "সে কত দূর?"

বি। কি কত দূর?

দি। সেই বটগাছ?

বি। কোন্ বটগাছ?

দি। যেখানে তোমরা সে দিন দেখেছিলে?

বি। কি দেখেছিলাম?

দি। রাত্রিকালে নাম করিতে নাই।

বিমলা বুঝিতে পারিয়া সুযোগ পাইলেন।

গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইঃ!"

ব্রাহ্মণ অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, "কি গা?"

বিমলা অস্ফুট স্বরে শৈলেশ্বরনিকটস্থ বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সে ঐ বটতলা।"

দিগ্‌গজ আর নড়িলেন না ; গতিশক্তিরহিত, অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

বিমলা বলিলেন, "আইস।"

ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "আমি আর যাইতে পারিব না।"

বিমলা কহিলেন, "আমারও ভয় করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ এই শুনিয়া পা ফিরাইয়া পলায়নোদ্যত হইলেন।

বিমলা বৃক্ষপানে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষমূলে একটা ধবলাকার কি পদার্থ রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, বৃক্ষমূলে শৈলেশ্বরের ষাঁড় শুইয়া থাকে; কিন্তু গজপতিকে কহিলেন, "গজপতি! ইষ্টদেবের নাম জপ; বৃক্ষমূলে কি দেখিতেছ?"

"ওঁ গো—বাবা গো—" বলিয়াই দিগ্‌গজ একেবারে চম্পট। দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পার হইয়া গেলেন।

বিমলা গজপতির স্বভাব জানিতেন; অতএব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একেবারে দুর্গ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

বিমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

বিমলা সকল দিক্ ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, কেবল এক দিক্ ভাবিয়া আইসেন নাই; রাজপুত্র মন্দিরে আসিয়াছেন কি? মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে বিমলার বিষম ক্লেশ হইল। মনে করিয়া দেখিলেন যে, রাজপুত্র আসার নিশ্চিত কথা কিছুই বলেন নাই; কেবল বলিয়াছিলেন যে, "এইখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে, এখানে না দেখা পাও, তবে সাক্ষাৎ হইল না।" তবে ত না আসারও সম্ভাবনা।

যদি না আসিয়া থাকেন, তবে এত ক্লেশ বৃথা হইল। বিমলা বিষণ্ণ হইয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এ কথা আগে কেন ভাবি নাই? ব্রাহ্মণকেই বা কেন তাড়াইলাম? একাকিনী এ রাত্রে কি প্রকারে ফিরিয়া যাইব! শৈলেশ্বর! তোমার ইচ্ছা।"

বটবৃক্ষতল দিয়া শৈলেশ্বর-মন্দিরে উঠিতে হয়। বিমলা বৃক্ষতল দিয়া যাইতে দেখিলেন যে, তথায় ষণ্ড নাই; বৃক্ষমূলে যে ধবল পদার্থ দেখিয়াছিলেন, তাহা আর তথায় নাই। বিমলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; ষণ্ড কোথাও উঠিয়া গেলে প্রান্তর মধ্যে দেখা যাইত।

বিমলা বৃক্ষমূলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলেন; বোধ হইল, যেন বৃক্ষের পশ্চাদ্দিকস্থ কোন মনুষ্যের ধবল পরিচ্ছদের অংশমাত্র দেখিতে পাইলেন, সাতিশয় চঞ্চলপদে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন; সবলে কবাট করতাড়িত করিলেন।

কবাট বন্ধ। ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল, "কে?"

শূন্য মন্দিরমধ্য হইতে গম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনি হইল, "কে?"

বিমলা প্রাণপণে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "পথ-শ্রান্ত স্ত্রীলোক।"

কবাট মুক্ত হইল।

দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে কৃপাণকোষ-হস্তে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান। বিমলা দেখিয়া চিনিলেন, কুমার জগৎসিংহ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ

বিমলা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বসিয়া একটু স্থির হইলেন। পরে নতভাবে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া যুবরাজকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন, কে কি বলিয়া আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবেন? উভয়েরই সঙ্কট। কি বলিয়া প্রথমে কথা কহিবেন?

বিমলা এ বিষয়ের সন্ধিবিগ্রহে পণ্ডিতা, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! আজ শৈলেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার দর্শন পাইলাম, একাকিনী এ রাত্রে প্রান্তরমধ্যে আসিতে ভীতা হইয়াছিলাম, এক্ষণে মন্দিরমধ্যে আপনার দর্শনে সাহস পাইলাম।"

যুবরাজ কহিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল ত?"

বিমলার অভিপ্রায়, প্রথমে জানেন,--রাজকুমার যথার্থ তিলোত্তমাতে অনুরক্ত কি না, পশ্চাৎ অন্য কথা কহিবেন। এই ভাবিয়া বলিলেন, "যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই প্রার্থনাতেই শৈলেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বুঝিলাম, আপনার পূজাতেই শৈলেশ্বর পরিতৃপ্ত আছেন, আমার পূজা গ্রহণ করিবেন না, অনুমতি হয় ত প্রতিগমন করি।"

যুব। যাও। একাকিনী তোমার যাওয়া উচিত হয় না, আমি তোমাকে রাখিয়া আসি।

বিমলা দেখিলেন যে, রাজপুত্র যাবজ্জীবন কেবল অস্ত্রশিক্ষা করেন নাই। বিমলা উত্তর করিলেন, "একাকিনী যাওয়া অনুচিত কেন?"

যুব। পথে নানা ভীতি আছে।

বি। তবে আমি মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইব।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বি। কেন? তাঁহার কাছে নালিশ আছে। তিনি যে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহা কর্ত্তৃক আমাদিগের পথের ভয় দূর হয় না। তিনি শত্রুনিপাতে অক্ষম।

রাজপুত্র সহাস্যে উত্তর করিলেন, "সেনাপতি উত্তর করিবেন যে, শত্রুনিপাত দেবের অসাধ্য, মনুষ্য কোন্ ছার। উদাহরণ, স্বয়ং মহাদেব তপোবনে মন্মথ শত্রুকে ভস্মরাশি করিয়াছিলেন; অদ্য পক্ষমাত্র হইল, সেই মন্মথ তাঁহার এই মন্দিরমধ্যেই বড় দৌরাত্ম্য করিয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এত দৌরাত্ম্য কাহার প্রতি হইয়াছে?"

যুবরাজ কহিলেন, "সেনাপতির প্রতিই হইয়াছে।"

বিমলা কহিলেন, "মহারাজ এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিবেন কেন?"

যুব। আমার সাক্ষী আছে।

বি। মহাশয়, এমন সাক্ষী কে?

যুব। সুচরিত্রে—

রাজপুত্রের বাক্য শেষ না হইতে হইতে বিমলা কহিলেন, "দাসী অতি কুচরিত্রা। আমাকে বিমলা বলিয়া ডাকিবেন।"

রাজপুত্র বলিলেন, "বিমলাই তাহার সাক্ষী।"

বি। বিমলা এমত সাক্ষ্য দিবে না।

যুব। সম্ভব বটে; যে ব্যক্তি পক্ষমধ্যে আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হয়, সে কি সত্য সাক্ষ্য দিয়া থাকে?

বি। মহাশয়! কি প্রতিশ্রুত ছিলাম, স্মরণ করিয়া দিন।

যুব। তোমার সখীর পরিচয়।

বিমলা সহসা ব্যঙ্গপ্রিয়তা ত্যাগ করিলেন; গম্ভীরভাবে কহিলেন, "যুবরাজ! পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয়। পরিচয় পাইয়া আপনি যদি অসুখী হন?"

রাজপুত্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন; তাঁহারও ব্যঙ্গাসক্ত ভাব দূর হইল; চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বিমলে! যথার্থ পরিচয়ে কি আমার অসুখের কোন কারণ আছে?"

বিমলা কহিলেন, "আছে।"

রাজপুত্র পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন; ক্ষণ পরে কহিলেন, "যাহাই হউক, তুমি আমার মানস সফল কর; আমি যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছি, তাহার অপেক্ষা আর কিছুই

অধিক অসুখের হইতে পারে না। তুমি যে শঙ্কা করিতেছ, যদি তাহা সত্য হয়, তবে সেও এ যন্ত্রণার অপেক্ষা ভাল; অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিবার একটা কথা পাই। বিমলে! আমি কেবল কৌতূহলী হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই; কৌতূহলী হইবার আমার এক্ষণে অবকাশ নাই, অদ্য মাসার্দ্ধমধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য শয্যায় বিশ্রাম করি নাই। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে বলিয়াই আসিয়াছি।"

বিমলা এই কথা শুনিবার জন্যই এত উদ্যম করিতেছিলেন। আরও কিছু শুনিবার জন্য কহিলেন, "যুবরাজ! আপনি রাজনীতিতে বিচক্ষণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ যুদ্ধকালে কি আপনার দুষ্প্রাপ্য রমণীতে মনোনিবেশ করা উচিত? উভয়ের মঙ্গল হেতু বলিতেছি, আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হইতে যত্ন করুন; যুদ্ধের উৎসাহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন।"

যুবরাজের অধরে মনস্তাপ-ব্যঞ্জক হাস্য প্রকটিত হইল; তিনি কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব? তোমার সখীর রূপ একবার দর্শনেই আমার হৃদয়মধ্যে গম্ভীরতর অঙ্কিত হইয়াছে, এ হৃদয় দগ্ধ না হইলে তাহা আর মিলায় না। লোকে আমার হৃদয় পাষাণ বলিয়া থাকে, পাষাণে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, পাষাণ নষ্ট না হইলে তাহা আর মিলায় না। যুদ্ধের কথা কি বলিতেছ, বিমলে! আমি তোমার সখীকে দেখিয়া অবধি কেবল যুদ্ধেই নিযুক্ত আছি। কি রণক্ষেত্রে—কি শিবিরে, এক পল সে মুখ ভুলিতে পারি নাই; যখন মস্তকচ্ছেদ করিতে পাঠান খড়্গ তুলিয়াছে, তখন মরিলে সে মুখ যে আর দেখিতে পাইব না, একবার ভিন্ন আর দেখা হইল না, সেই কথাই আগে মনে পড়িয়াছে। বিমলে! কোথা গেলে তোমার সখীকে দেখিতে পাইব?"

বিমলা আর শুনিয়া কি করিবেন! বলিলেন, "গড় মান্দারণে আমার সখীর দেখা পাইবেন। তিলোত্তমা সুন্দরী বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

জগৎসিংহের বোধ হইল যেন, তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। তরবারে ভর করিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমারই কথা সত্য হইল। তিলোত্তমা আমার হইবে না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলাম; শত্রুরক্তে আমার সুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিব।"

বিমলা রাজপুত্রের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! স্নেহের যদি পুরস্কার থাকিত, তবে আপনি তিলোত্তমা লাভ করিবার যোগ্য। একেবারেই বা কেন নিরাশ হন? আজ বিধি বৈর, কাল বিধি সদয় হইতে পারেন।"

আশা মধুরভাষিণী। অতি দুর্দ্দিনে মনুষ্য-শ্রবণে মৃদু মৃদু কহিয়া থাকে, "মেঘ ঝড় চিরস্থায়ী নহে, কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।" বিমলার মুখে আশা কথা কহিল, "কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।"

জগৎসিংহ আশার কথা শুনিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বলিতে পারে? বিধাতার লিপি কে অগ্রে পাঠ করিতে পারে? এ সংসারে অঘটনীয় কি আছে? এ সংসারে কোন্ অঘটনীয় ঘটনা না ঘটিয়াছে?

রাজপুত্র আশার কথা শুনিলেন।

কহিলেন, "যাহাই হউক, অদ্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে পশ্চাৎ ঘটিবে; বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইবে? এখন কেবল আমার মন ব্যক্ত করিয়া কহিতে পারি। এই শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ সত্য করিতেছি যে, তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তুমি আমার সকল কথা তোমার সখীর সাক্ষাতে কহিও; আর কহিও যে, আমি কেবল একবারমাত্র তাঁহার দর্শনের ভিখারী, দ্বিতীয়বার আর এ ভিক্ষা করিব না, স্বীকার করিতেছি।"

বিমলার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "আমার সখীর প্রত্যুত্তর মহাশয় কি প্রকারে পাইবেন?"

যুবরাজ কহিলেন, "তোমাকে বারংবার ক্লেশ দিতে পারি না, কিন্তু যদি তুমি পুনর্ব্বার এই মন্দিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর, তবে তোমার নিকট বিক্রীত থাকিব। জগৎসিংহ হইতে কখন না কখন প্রত্যুপকার হইতে পারিবে।"

বিমলা কহিলেন, "যুবরাজ! আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; কিন্তু একাকিনী রাত্রে এ পথে আসিতে অত্যন্ত ভয় পাই, অঙ্গীকার পালন না করিলেই নয়, এজন্যই আজ আসিয়াছি। এক্ষণে এ প্রদেশ শত্রুব্যস্ত হইয়াছে; পুনর্ব্বার আসিতে বড় ভয় পাইব।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তুমি যদি হানি বিবেচনা না কর, তবে আমি তোমার সহিত গড় মান্দারণে যাই। আমি তথায় উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করিব, তুমি আমাকে সংবাদ আনিয়া দিও।"

বিমলা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তবে চলুন।"

উভয়ে মন্দির হইতে নির্গত হইতে যান, এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে সাবধান-ন্যস্ত মনুষ্য-পদ-বিক্ষেপের শব্দ হইল। রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া, বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেহ সমভিব্যাহারী আছে?"

বিমলা কহিলেন, "না।"

"তবে কার পদধ্বনি হইল? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কেহ অন্তরাল হইতে আমাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে।"

এই বলিয়া রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বীরপঞ্চমী

উভয়ে শৈলেশ্বর প্রণাম করিয়া, সশঙ্কচিত্তে গড় মান্দারণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিৎ নীরবে গেলেন। কিছু দূর গিয়া রাজকুমার প্রথমে কথা কহিলেন, "বিমলে, আমার এক বিষয়ে কৌতূহল আছে। তুমি শুনিয়া কি বলিবে বলিতে পারি না।"

বিমলা কহিলেন, "কি?"

জ। আমার মনে প্রতীতি জন্মিয়াছে, তুমি কদাপি পরিচারিকা নও।

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ সন্দেহ আপনার মনে কেন জন্মিল?"

জ। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা যে অম্বরপতির পুত্রবধূ হইতে পারেন না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে অতি গুহ্য বৃত্তান্ত; তুমি পরিচারিকা হইলে সে গুহ্য কাহিনী কি প্রকারে জানিবে?

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাতর স্বরে কহিলেন, "আপনি যথার্থ অনুভব করিয়াছেন; আমি পরিচারিকা নহি। অদৃষ্টক্রমে পরিচারিকার ন্যায় আছি। অদৃষ্টকেই বা কেন দোষি? আমার অদৃষ্ট মন্দ নহে!"

রাজকুমার বুঝিলেন যে, এই কথায় বিমলার মনোমধ্যে পরিতাপ উদয় হইয়াছে; অতএব তৎসম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। বিমলা স্বতঃ কহিলেন, "যুবরাজ, আপনার নিকট পরিচয় দিব; কিন্তু এক্ষণে নয়। ও কি শব্দ? পশ্চাৎ কেহ আসিতেছে!"

এই সময়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যের পদধ্বনি স্পষ্ট শ্রুত হইল। এমন বোধ হইল, যেন দুই জন মনুষ্য কাণে কাণে কথা কহিতেছে। তখন মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অতিক্রম হইয়াছিল। রাজপুত্র কহিলেন, "আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে, আমি দেখিয়া আসি।"

এই বলিয়া রাজপুত্র কিছু পথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন এবং পথের পার্শ্বেও অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যাগমন করিয়া বিমলাকে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, কেহ আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। সাবধানে কথা কহা ভাল।"

এখন উভয়ে অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। ক্রমে গড় মান্দারণ গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুর্গসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এক্ষণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে কি প্রকারে? এত রাত্রে অবশ্য ফটক বন্ধ হইয়া থাকিবে।"

বিমলা কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়াই বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম।"

রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "লুকান পথ আছে?"

বিমলাও হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "যেখানে চোর, সেইখানেই সিঁধ।"

ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার রাজপুত্র কহিলেন, "বিমলা, এক্ষণে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি দুর্গপার্শ্বস্থ এই আম্রকানন মধ্যে তোমার অপেক্ষা করিব, তুমি আমার হইয়া অকপটে তোমার সখীকে মিনতি করিও; পক্ষ পরে হয়, মাস পরে হয়, আর একবার আমি তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব।"

বিমলা কহিলেন, "এ আম্রকাননও নির্জ্জন স্থান নহে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

জ। কত দূর যাইব?

বি। দুর্গমধ্যে চলুন।

রাজকুমার কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, "বিমলা, এ উচিত হয় না। দুর্গ-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আমি দুর্গমধ্যে যাইব না।"

বিমলা কহিলেন, "চিন্তা কি?"

রাজকুমার গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "রাজপুত্রেরা কোন স্থানে যাইতে চিন্তা করে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, অম্বরপতির পুত্রের কি উচিত যে, দুর্গ-স্বামীর অজ্ঞাতে চোরের ন্যায় দুর্গপ্রবেশ করে?"

বিমলা কহিলেন, "আমি আপনাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছি।"

রাজকুমার কহিলেন, "মনে করিও না যে, আমি তোমাকে পরিচারিকা জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু বল দেখি, দুর্গমধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইবার তোমার কি অধিকার?"

বিমলাও ক্ষণেক কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার কি অধিকার, তাহা না শুনিলে আপনি যাইবেন না?"

উত্তর—"কদাপি যাইব না।"

বিমলা তখন রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।

রাজপুত্র কহিলেন, "চলুন।"

বিমলা কহিলেন, "যুবরাজ, আমি দাসী, দাসীকে 'চল' বলিবেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "তাই হউক।"

যে রাজপথ অতিবাহিত করিয়া বিমলা যুবরাজকে লইয়া যাইতেছিলেন, সে পথে দুর্গদ্বারে যাইতে হয়। দুর্গের পার্শ্বে আম্রকানন; সিংহদ্বার হইতে কানন অদৃশ্য। ঐ পথ হইতে যথা আমোদর অন্তঃপুরপশ্চাৎ প্রবাহিত আছে, সে দিকে যাইতে হইলে এই আম্রকানন মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বিমলা এক্ষণে রাজবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রসঙ্গে এই আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন।

আম্রকানন প্রবেশাবধি, উভয়ে পুনর্ব্বার সেইরূপ শুষ্কপর্ণভঙ্গ সহিত মনুষ্য-পদ-ধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন।

বিমলা কহিলেন, "আবার!"

রাজপুত্র কহিলেন, "তুমি পুনরপি ক্ষণেক দাঁড়াও, আমি দেখিয়া আসি।"

রাজপুত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে গেলেন; কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। আম্রকাননতলে নানা প্রকার আরণ্য লতাদির সমৃদ্ধিতে এমন বন হইয়াছিল এবং বৃক্ষাদির ছায়াতে রাত্রে কানন মধ্যে এমন অন্ধকার হইয়াছিল যে, রাজপুত্র যেখানে যান, তাহার অগ্রে অধিক দূর দেখিতে পান না। রাজপুত্র এমনও বিবেচনা করিলেন যে, পশুর পদচারণে শুষ্কপত্রভঙ্গশব্দ শুনিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, সন্দেহ নিঃশেষ করা উচিত বিবেচনা করিয়া, রাজকুমার অসিহস্তে আম্রবৃক্ষের উপর উঠিলেন। বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের তিমিরাবৃত

শাখাসমষ্টিমধ্যে দুই জন মনুষ্য বসিয়া আছে; তাহাদিগের উষ্ণীষে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে, কেবল তাহাই দেখা যাইতেছিল; অবয়ব ছায়ায় লুক্কায়িত ছিল। রাজপুত্র উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, উষ্ণীষ মস্তকে মনুষ্য বটে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি উত্তমরূপে বৃক্ষটি লক্ষিত করিয়া রাখিলেন যে, পুনরায় আসিলে না ভ্রম হয়। পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে বিমলার নিকট আসিলেন। যাহা দেখিলেম, তাহা বিমলার নিকট বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এ সময়ে যদি দুইটা বর্শা থাকিত!"

বিমলা কহিলেন, "বর্শা লইয়া কি করিবেন?"

জ। তাহা হইলে ইহারা কে, জানিতে পারিতাম; লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না। উষ্ণীষ দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুরাত্মা পাঠানেরা কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।

তৎক্ষণাৎ বিমলার পথপার্শ্বস্থ মৃত অশ্ব, উষ্ণীষ আর অশ্বসৈন্যের পদচিহ্ন স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন, "আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন; আমি পলকমধ্যে দুর্গ হইতে বর্শা আনিতেছি।"

এই বলিয়া বিমলা ঝটিতি দুর্গমূলে গেলেন। যে কক্ষে বসিয়া সেই রাত্রি প্রদোষে বেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহার নীচের কক্ষের একটি গবাক্ষ আম্রকাননের দিকে ছিল। বিমলা অঞ্চল হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া ঐ কলে ফিরাইলেন; পশ্চাৎ জানালার গরাদে ধরিয়া দেয়ালের দিকে টান দিলেন; শিল্পকৌশলের গুণে জানালার কবাট, চৌকাঠ, গরাদে সকল সমেত দেয়ালের মধ্যে এক রন্ধ্রে প্রবেশ করিল, বিমলার কক্ষমধ্যে প্রবেশ জন্য পথ মুক্ত হইল। বিমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়ালের মধ্য হইতে জানালার চৌকাঠ ধরিয়া টানিলেন; জানালা বাহির হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে স্থিত হইল; কবাটের ভিতর দিকে পূর্ব্ববৎ গা-চাবির কল ছিল, বিমলা অঞ্চলের চাবি লইয়া ঐ কলে লাগাইলেন। জানালা নিজ স্থানে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল, বাহির হইতে উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

বিমলা অতি দ্রুতবেগে দুর্গের শেলেখানায় গেলেন। শেলেখানায় প্রহরীকে কহিলেন, "আমি তোমার নিকট যাহা চাহি, তুমি কাহারও সাক্ষাৎ বলিও না। আমাকে দুইটা বর্শা দাও—আবার আনিয়া দিব।"

প্রহরী চমৎকৃত হইল। কহিল, "মা, তুমি বর্শা লইয়া কি করিবে?"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "আজ আমার বীরপঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীর পুত্র হয়; তাহাতে রাত্রে অস্ত্র পূজা করিতে হয়; আমি পুত্র কামনা করি, কাহারও সাক্ষাৎ প্রকাশ করিও না।"

প্রহরীকে যেরূপ বুঝাইল, সেও সেইরূপ বুঝিল। দুর্গস্থ সকল ভৃত্য বিমলার আজ্ঞাকারী ছিল; সুতরাং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া দুইটা শাণিত বর্শা দিল।

বিমলা বর্শা লইয়া পূর্ব্ববেগে গবাক্ষের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ভিতর হইতে জানালা খুলিলেন, এবং বর্শা সহিত নির্গত হইয়া জগৎসিংহের নিকট গেলেন।

ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক, বা নিকটেই থাকিবেন এবং তৎক্ষণেই প্রত্যাগমন করিবেন, এই বিশ্বাসজনিত নিশ্চিন্তভাব প্রযুক্তই হউক, বিমলা বহির্গমনকালে জালরন্ধ্রপথ পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহাতে প্রমাদ ঘটনার এক কারণ উপস্থিত হইল। জানালার অতি নিকটে এক আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার অন্তরালে এক শস্ত্রধারী পুরুষ দণ্ডায়মান ছিল; সে বিমলার এই ভ্রম দেখিতে পাইল। বিমলা যতক্ষণ না দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন, ততক্ষণ শস্ত্রপাণি পুরুষ বৃক্ষের অন্তরালে রহিল; বিমলা দৃষ্টির অগোচর হইলেই সে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে শব্দশীল চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে গবাক্ষসন্নিধানে আসিল। প্রথমে গবাক্ষের মুক্তপথে কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপা[illegible]রিল, কক্ষমধ্যে কেহ নাই দেখিয়া, নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। পরে সেই কক্ষের দ্বার দিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে রাজপুত্র বিমলার নিকট বর্শা পাইয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষারোহণ করিলেন, এবং পূর্ব্বলক্ষিত বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন যে, এক্ষণে একটিমাত্র উষ্ণীষ দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় নাই; রাজপুত্র একটি বর্শা বাম করে রাখিয়া, দ্বিতীয় বর্শা দক্ষিণ করে গ্রহণপূর্ব্বক, বৃক্ষস্থ উষ্ণীষ লক্ষ্য করিলেন। পরে বিশাল বাহুবল সহযোগে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথমে বৃক্ষপল্লবের প্রবল মর্ম্মর শব্দ, তৎপরেই ভূতলে গুরু পদার্থের পতনশব্দ হইল; উষ্ণীষ আর বৃক্ষে নাই। রাজপুত্র বুঝিলেন যে, তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে উষ্ণীষধারী বৃক্ষশাখাচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে।

জগৎসিংহ দ্রুতগতি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যথা আহত ব্যক্তি পতিত হইয়াছে, তথা গেলেন; দেখিলেন যে, এক জন সৈনিক-বেশধারী সশস্ত্র মুসলমান মৃতবৎ পতিত হইয়া রহিয়াছে। বর্শা তাহার চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়াছে।

রাজপুত্র মৃতবৎ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, একেবারে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বর্শা চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়া তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির

কবচমধ্যে একখানা পত্র ছিল ; তাহার অগ্রভাগ বাহির হইয়াছিল। জগৎসিংহ ঐ পত্র লইয়া জ্যোৎস্নায় আনিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

> "কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তিগণ এই লিপি দৃষ্টি মাত্র লিপিবাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।
>
> কতলু খাঁ।"

বিমলা কেবল শব্দ শুনিতেছিলেন মাত্র, সবিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাজকুমার তাঁহার নিকটে আসিয়া সবিশেষ বিবৃত করিলেন। বিমলা শুনিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমি এত জানিলে কখন আপনাকে বর্শা আনিয়া দিতাম না। আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "শত্রুবধে ক্ষোভ কি? শত্রুবধ ধর্ম্মে আছে।"

বিমলা কহিলেন, "যোদ্ধায় এমত বিবেচনা করুক। আমরা স্ত্রীজাতি।"

ক্ষণপরে বিমলা কহিলেন, "রাজকুমার, আর বিলম্বে অনিষ্ট আছে। দুর্গে চলুন, আমি দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

উভয়ে দ্রুতগতি দুর্গমূলে আসিয়া প্রথমে বিমলা, পশ্চাৎ রাজপুত্র প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে রাজপুত্রের হৃৎ[illegible]কম্প হইল। শত সহস্র সেনার সমীপে যাঁহার মস্তকের একটি কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, তাঁহার এ সুখের আলয়ে প্রবেশ করিতে হৃৎকম্প কেন?

বিমলা পূর্ব্ববৎ গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন ; পরে রাজপুত্রকে নিজ শয়নাগারে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি আসিতেছি, আপনাকে ক্ষণেক এই পালঙ্কের উপর বসিতে হইবেক। যদি অন্য চিন্তা না থাকে, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, ভগবানের আসন বটপত্র মাত্র।"

বিমলা প্রস্থান করিয়া ক্ষণপরেই নিকটস্থ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, "যুবরাজ! এই দিকে আসিয়া একটা নিবেদন শুনুন।"

যুবরাজের হৃদয় আবার কাঁপে, তিনি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া কক্ষান্তরমধ্যে বিমলার নিকট গেলেন।

বিমলা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় তথা হইতে সরিয়া গেলেন ; যুবরাজ দেখিলেন, সুবাসিত কক্ষ ; রজতপ্রদীপ জ্বলিতেছে ; কক্ষপ্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী,—সে তিলোত্তমা!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চতুরে চতুরে

বিমলা আসিয়া নিজ কক্ষে পালঙ্কের উপর বসিলেন। বিমলার মুখ অতি হর্ষ-প্রফুল্ল; তিনি গজপতিকে মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন। কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে; সম্মুখে মুকুর; বেশভূষা যেরূপ প্রদোষকালে ছিল, সেইরূপই রহিয়াছে; বিমলা দর্পণাভ্যন্তরে মুহূর্ত্তজন্য নিজ প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। প্রদোষকালে যেরূপ কুটিল-কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ রহিয়াছে; বিশাল লোচনযুগলে সেইরূপ কজ্জলপ্রভা; অধরে সেইরূপ তাম্বুলরাগ; সেইরূপ কর্ণাভরণ পীবরাংসসংসক্ত হইয়া দুলিতেছে। বিমলা উপাধানে পৃষ্ঠ রাখিয়া অর্দ্ধ শয়ন, অর্দ্ধ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; বিমলা মুকুরে নিজ-লাবণ্য দেখিয়া হাস্য করিলেন। বিমলা এই ভাবিয়া হাসিলেন যে, দিগ্‌গজ পণ্ডিত নিতান্ত নিষ্কারণে গৃহত্যাগী হইতে চাহেন নাই।

বিমলা জগৎসিংহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, এমত সময়ে আম্রকানন-মধ্যে গম্ভীর তূর্য্যনিনাদ হইল। বিমলা চমকিয়া উঠিলেন এবং ভীতা হইলেন; সিংহদ্বার ব্যতীত আম্রকাননে কখনই তূর্য্যধ্বনি হইয়া থাকে না, এত রাত্রেই বা তূর্য্যধ্বনি কেন হয়? বিশেষ সেই রাত্রে মন্দিরে গমন কালে ও প্রত্যাগমন কালে যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমুদয় স্মরণ হইল। বিমলার তৎক্ষণাৎ বিবেচনা হইল, এ তূর্য্যধ্বনি কোন অমঙ্গল ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ। অতএব সশঙ্কচিত্তে তিনি বাতায়ন-সন্নিধানে গিয়া আম্রকানন প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কানন মধ্যে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিমলা ব্যস্তচিত্তে নিজ কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন; যে শ্রেণীতে তাঁহার কক্ষ, তৎপরেই প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণ পরেই আর এক কক্ষশ্রেণী; সেই শ্রেণীতে প্রাসাদোপরি উঠিবার সোপান আছে। বিমলা কক্ষত্যাগপূর্ব্বক সেই সোপানাবলী আরোহণ করিয়া ছাদের উপর উঠিলেন; ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তথাপি কাননের গভীর ছায়ান্ধকার জন্য কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা দ্বিগুণ উদ্বিগ্নচিত্তে ছাদের আলিসার নিকটে গেলেন; তদুপরি বক্ষঃ স্থাপনপূর্ব্বক মুখ নত করিয়া দুর্গমূল পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্যামোজ্জ্বল শাখা পল্লব সকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত; কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল; কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোথাও কোথাও

শাখাপল্লবাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ; আমোদরের স্থিরাম্বু-মধ্যে নীলাম্বর, চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত ; দূরে, অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্ত্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, এক জন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিত পুত্তলীবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

শস্ত্রধারী কহিল, "চীৎকার করিও না। সুন্দরীর মুখে চীৎকার ভাল শুনায় না।"

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ এইরূপ বিমলাকে বিহ্বল করিল, তাহার পরিচ্ছদ পাঠানজাতীয় সৈনিক পুরুষদিগের ন্যায়। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও মহার্ঘ গুণ দেখিয়া অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারিত, এ ব্যক্তি কোন মহৎপদাভিষিক্ত। অদ্যাপি তাহার বয়স ত্রিংশতের অধিক হয় নাই ; কান্তি সাতিশয় শ্রীমান্, তাঁহার প্রশস্ত ললাটোপরি যে উষ্ণীষ সংস্থাপিত ছিল, ত এক খণ্ড মহার্ঘ হীরক শোভিত ছিল। বিমলার যদি তৎক্ষণে মনের স্থিরতা ত, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, স্বয়ং জগৎসিংহের সহিত তুলনায় এ ব্যক্তি নিতান্ত ন্যূন ন না ; জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বা বিশালোরস্ক নহেন, কিন্তু তৎসদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক কান্তি ; তদধিক সুকুমার দেহ। তাঁহার বহুমূল্য কটিবন্ধে প্রবালজড়িত কোষমধ্যে স্ক ছুরিকা ছিল ; হস্তে নিষ্কোষিত তরবার। অন্য প্রহরণ ছিল না।

সৈনিক পুরুষ কহিলেন, "চীৎকার করিও না। চীৎকার করিলে তোমার বিপদ্ ঘটিবে।"

প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিশালিনী বিমলা ক্ষণকাল মাত্র বিহ্বলা ছিলেন ; শস্ত্রধারীর দ্বিরুক্তিতে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। বিমলার পশ্চাতেই ছাদের শেষ, সম্মুখেই সশস্ত্র যোদ্ধা ; ছাদ হইতে বিমলাকে নীচে ফেলিয়া দেওয়াও কঠিন নহে। বুঝিয়া সুবুদ্ধি বিমলা কহিলেন, "কে তুমি ?"

সৈনিক কহিলেন, "আমার পরিচয়ে তোমার কি হইবে ?"

বিমলা কহিলেন, "তুমি কি জন্য এ দুর্গমধ্যে আসিয়াছ ? চোরেরা শূলে যায়, তুমি কি শোন নাই ?"

সৈনিক। সুন্দরি ! আমি চোর নই।

বি। তুমি কি প্রকারে দুর্গমধ্যে আসিলে ?

সৈ। তোমারই অনুকম্পায়। তুমি যখন জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলে, তখন প্রবেশ করিয়াছিলাম; তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ ছাদে আসিয়াছি।

বিমলা কপালে করাঘাত করিলেন। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

সৈনিক কহিল, "তোমার নিকট এক্ষণে পরিচয় দিলেই বা হানি কি? আমি পাঠান।"

বি। এ ত পরিচয় হইল না; জানিলাম যে, জাতিতে পাঠান,—কে তুমি?

সৈ। ঈশ্বরেচ্ছায় এ দীনের নাম ওস্‌মান খাঁ।

বি। ওস্‌মান খাঁ কে, আমি চিনি না!

সৈ। ওস্‌মান খাঁ, কতলু খাঁর সেনাপতি।

বিমলার শরীর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা—কোনরূপে পলায়ন করিয়া বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ করেন; কিন্তু তাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। সম্মুখে সেনাপতি গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। অনন্যগতি হইয়া বিমলা এই বিবেচনা করিলেন যে, এক্ষণে সেনাপতিকে যতক্ষণ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রাখিতে পারেন, ততক্ষণ অবকাশ। পশ্চাৎ দুর্গপ্রাসাদস্থ কোন প্রহরী সে দিকে আসিলেও আসিতে পারে, অতএব পুনরপি কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, "আপনি কেন এ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?"

ওস্‌মান খাঁ উত্তর করিলেন, "আমরা বীরেন্দ্রসিংহকে অনুনয় করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি কহিয়াছেন যে, তোমরা পার, সসৈন্য দুর্গে আসিও।"

বিমলা কহিলেন, "বুঝিলাম, দুর্গাধি তি আপনাদিগের সহিত মৈত্র না করিয়া, মোগলের পক্ষ হইয়াছে বলিয়া আপনি দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি একক দেখিতেছি?"

ওস্। আপাততঃ আমি একক।

বিমলা কহিলেন, "সেই জন্যই বোধ করি, শঙ্কা প্রযুক্ত আমাকে যাইতে দিতেছেন না।"

ভীরুতা অপবাদে পাঠান সেনাপতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহার গতি মুক্ত করিয়া সাহস প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন, এই দুরাশাতেই বিমলা এই কথা বলিলেন।

ওস্‌মান খাঁ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার নিকট কেবল তোমার কটাক্ষকে শঙ্কা করিতে হয়, আমার সে শঙ্কাও বড় নাই। তোমার নিকট ভিক্ষা আছে।"

বিমলা কৌতূহলিনী হইয়া ওস্‌মান খাঁর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। ওস্‌মান খাঁ কহিলেন, "তোমার ওড়নার অঞ্চলে যে জানালার চাবি আছে, তাহা আমাকে দান করিয়া বাধিত কর। তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া অবমাননা করিতে সঙ্কোচ করি।"

গবাক্ষের চাবি যে, সেনাপতির অভীষ্টসিদ্ধি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিতে বিমলার ন্যায় চতুরার অধিককাল অপেক্ষা করে না। বুঝিতে পারিয়া বিমলা দেখিলেন, ইহার উপায় নাই। যে বলে লইতে পারে, তাহার যাচ্ঞা করা ব্যঙ্গ করা মাত্র। চাবি না দিলে সেনাপতি এখনই বলে লইবেক। অপর কেহ তৎক্ষণাৎ চাবি ফেলিয়া দিত সন্দেহ নাই; কিন্তু চতুরা বিমলা কহিলেন, "মহাশয়! আমি ইচ্ছাক্রমে চাবি না দিলে আপনি কি প্রকারে লইবেন?"

এই বলিতে বলিতে বিমলা অঙ্গ হইতে ওড়না খুলিয়া হস্তে লইলেন। ওস্‌মানের চক্ষু ওড়নার দিকে; তিনি উত্তর করিলেন, "ইচ্ছাক্রমে না দিলে তোমার অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ লাভ করিব।"

"করুন," বলিয়া বিমলা হস্তস্থিত বস্ত্র আম্রকাননে নিক্ষেপ করিলেন। ওস্‌মানের চক্ষু ওড়নার প্রতি ছিল; যেই বিমলা নিক্ষেপ করিয়াছেন, ওস্‌মান অমনি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিয়া উড্ডীয়মান বস্ত্র ধরিলেন।

ওস্‌মান খাঁ ওড়না হস্তগত করিয়া এক হস্তে বিমলার হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিলেন, দন্ত দ্বারা ওড়না ধরিয়া দ্বিতীয় হস্তে চাবি খুলিয়া নিজ কটিবন্ধে রাখিলেন। পরে যাহা করিলেন, তাহাতে বিমলার মুখ শুকাইল। ওস্‌মান বিমলাকে এক শত সেলাম করিয়া যোড়হাতে বলিলেন, "মাফ করিবেন।" এই বলিয়া ওড়না লইয়া তদ্দ্বারা বিমলার দুই হস্ত আলিসার সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। বিমলা কহিলেন, "এ কি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "প্রেমের ফাঁস।"

বি। এ দুষ্কর্ম্মের ফল আপনি অচিরাৎ পাইবেন!

ওস্‌মান বিমলাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলা চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু ফলোদয় হইল না। কেহ শুনিতে পাইল না।

ওস্‌মান পূর্ব্বপথে অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার বিমলার কক্ষের নীচের কক্ষে গেলেন। তথায় বিমলার ন্যায় জানালার চাবি ফিরাইয়া জানালা দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পথ মুক্ত হইলে ওস্‌মান মৃদু মৃদু শিশ্ দিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণমাত্রেই বৃক্ষান্তরাল হইতে এক জন পাদুকাশূন্য যোদ্ধা গবাক্ষ নিকটে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিল। সে ব্যক্তি প্রবেশ করিলে অপর এক ব্যক্তি আসিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক পাঠান সেনা নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শেষে যে ব্যক্তি গবাক্ষ নিকটে আসিল, ওস্মান তাহাকে কহিলেন, "আর না, তোমরা বাহিরে থাক ; আমার পূর্ব্বকথিত সঙ্কেতধ্বনি শুনিলে তোমরা বাহির হইতে দুর্গ আক্রমণ করিও ; এই কথা তুমি তাজ খাঁকে বলিও।"

সে ব্যক্তি ফিরিয়া গেল। ওস্মান লব্ধপ্রবেশ সেনা লইয়া পুনরপি নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে প্রাসাদারোহণ করিলেন ; যে ছাদে বিমলা বন্ধন-দশায় বসিয়া আছেন, সেই ছাদ দিয়া গমনকালে কহিলেন, "এই স্ত্রীলোকটি বড় বুদ্ধিমতী ; ইহাকে কদাপি বিশ্বাস নাই ; রহিম সেখ ! তুমি ইহার নিকট প্রহরী থাক ; যদি পলায়নের চেষ্টা বা কাহারও সহিত কথা কহিতে উদ্যোগ করে, কি উচ্চ কথা কয়, তবে স্ত্রীবধে ঘৃণা করিও না।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া রহিম তথায় প্রহরী রহিল। পাঠান সেনা ছাদে ছাদে দুর্গের অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমিকে প্রেমিকে

বিমলা যখন দেখিলেন যে, চতুর ওসমান অন্যত্র গেলেন, তখন তিনি ভরসা পাইলেন যে, কৌশলে মুক্তি পাইতে পারিবেন। শীঘ্র তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রহরী কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে বিমলা তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রহরী হউক, আর যমদূতই হউক, সুন্দরী রমণীর সহিত কে ইচ্ছাপূর্ব্বক কথোপকথন না করে ? বিমলা প্রথমে এ ও সে নানাপ্রকার সামান্য বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রহরীর নাম ধাম গৃহকর্ম্ম সুখদুঃখ বিষয়ক নানা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রহরী নিজ সম্বন্ধে বিমলার এতদূর পর্য্যন্ত ঔৎসুক্য দেখিয়া বড়ই প্রীত হইল। বিমলাও সুযোগ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ তূণ হইতে শাণিত অস্ত্র সকল বাহির করিতে লাগিলেন। একে বিমলার অমৃতময় রসালাপ, তাহাতে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল চক্ষুর অব্যর্থ কটাক্ষসন্ধান, প্রহরী একেবারে গলিয়া গেল। যখন বিমলা প্রহরীর ভঙ্গীভাবে দেখিলেন যে, তাহার অধঃপাতে যাইবার সময় হইয়া

আসিয়াছে, তখন মৃদু মৃদু স্বরে কহিলেন, "আমার কেমন ভয় করিতেছে, সেখজী, তুমি আমার কাছে বসো না।"

প্রহরী চরিতার্থ হইয়া বিমলার পার্শ্বে বসিল। ক্ষণকাল অন্য কথোপকথনের পর বিমলা দেখিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। প্রহরী নিকটে বসিয়া অবধি ঘন ঘন তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন বলিলেন, "সেখজী, তুমি বড় ঘামিতেছ; একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দাও যদি, তবে আমি তোমাকে বাতাস করি, পরে আবার বাঁধিয়া দিও।"

সেখজীর কপালে ঘর্ম্মবিন্দুও ছিল না, কিন্তু বিমলা অবশ্য ঘর্ম্ম না দেখিলে কেন বলিবে? আর এ হাতের বাতাস কার ভাগ্যে ঘটে? এই ভাবিয়া প্রহরী তখনই বন্ধন খুলিয়া দিল।

বিমলা কিয়ৎক্ষণ ওড়না দ্বারা প্রহরীকে বাতাস দিয়া স্বচ্ছন্দে ওড়না নিজ অঙ্গে পরিধান করিলেন। পুনর্ব্বন্ধনের নামও করিতে প্রহরীর মুখ ফুটিল না। তাহার বিশেষ কারণও ছিল; ওড়নার বন্ধনরজ্জুত্ব দশা ঘুচিয়া যখন তাহা বিমলার অঙ্গে শোভিত হইল, তখন তাঁহার লাবণ্য আরও প্রদীপ্ত হইল; যে লাবণ্য মুকুরে দেখিয়া বিমলা আপনা আপনি হাসিয়াছিলেন, সেই লাবণ্য দেখিয়া প্রহরী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিমলা কহিলেন, "সেখজী, তোমার স্ত্রী তোমাকে কি ভালবাসে না?"

সেখজী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন?"

বিমলা কহিলেন, "ভালবাসিলে এ বসন্তকালে (তখন ঘোর গ্রীষ্ম, বর্ষা আগত) কোন্ প্রাণে তোমা হেন স্বামীকে ছাড়িয়া আছে?"

সেখজী এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিমলার তূণ হইতে অনর্গল অস্ত্র বাহির হইতে লাগিল। "সেখজী! বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি আমার স্বামী হইতে, তবে আমি কখন তোমাকে যুদ্ধে আসিতে দিতাম না।"

প্রহরী আবার নিশ্বাস ছাড়িল। বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আহা! তুমি যদি আমার স্বামী হ'তে!"

বিমলাও এই বলিয়া একটি ছোট রকম নিশ্বাস ছাড়িলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজ তীক্ষ্ণ-কুটিল-কটাক্ষ বিসর্জ্জন করিলেন; প্রহরীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া বিমলার আরও নিকটে আসিয়া বসিল, বিমলাও আর একটু তাহার দিকে সরিয়া বসিলেন।

বিমলা প্রহরীর করে কোমল কর-পল্লব স্থাপন করিলেন। প্রহরী হতবুদ্ধি হইয়া উঠিল।

বিমলা কহিতে লাগিলেন, "বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি রণজয় করিয়া যাও, তবে আমাকে কি তোমার মনে থাকিবে?"

প্র। তোমাকে মনে থাকিবে না?

বি। মনের কথা তোমাকে বলিব?

প্র। বল না—বল।

বি। না, বলিব না, তুমি কি বলিবে?

প্র। না না—বল, আমাকে ভৃত্য বলিয়া জানিও।

বি। আমার মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, এ পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া যাই।

আবার সেই কটাক্ষ। প্রহরী আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল।

প্র। যাবে?

দিগ্‌গজের মত পণ্ডিত অনেক আছে!

বিমলা কহিলেন, "লইয়া যাও ত যাই!"

প্র। তোমাকে লইয়া যাইব না? তোমার দাস হইয়া থাকিব।

"তোমার এ ভালবাসার পুরস্কার কি দিব? ইহাই গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠস্থ স্বর্ণহার প্রহরীর কণ্ঠে পরাইলেন, প্রহরী সশরীরে স্বর্গে গেল। বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলে, একের মালা অন্যের গলায় দিলে বিবাহ হয়।"

হাসিতে প্রহরীর কালো দাড়ির অন্ধকারমধ্য হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়িল; বলিল, "তবে ত তোমার সাতে আমার সাদি হইল।"

"হইল বই আর কি?" বিমলা ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধে চিন্তামগ্নের ন্যায় রহিলেন। প্রহরী কহিল, "কি ভাবিতেছ?"

বি। ভাবিতেছি, আমার কপালে বুঝি সুখ নাই, তোমরা দুর্গজয় করিয়া যাইতে পারিবে না।

প্রহরী সদর্পে কহিল, "তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এতক্ষণ জয় হইল।"

বিমলা কহিলেন, "উঁহু, ইহার এক গোপন কথা আছে।"

প্রহরী কহিল, "কি ?"

বি। তোমাকে সে কথা বলিয়া দিই, যদি তুমি কোনরূপে দুর্গজয় করাইতে পার।

প্রহরী হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল; বিমলা কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। প্রহরী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি ?"

বিমলা কহিলেন, "তোমরা জান না, এই দুর্গপার্শ্বে জগৎসিংহ দশ সহস্র সেনা লইয়া বসিয়া আছে। তোমরা আজ গোপনে আসিবে জানিয়া, সে আগে আসিয়া বসিয়া আছে; এখন কিছু করিবে না, তোমরা দুর্গজয় করিয়া যখন নিশ্চিন্ত থাকিবে, তখন আসিয়া ঘেরাও করিবে।"

প্রহরী ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল; পরে বলিল, "সে কি ?"

বি। এই কথা, দুর্গস্থ সকলেই জানে; আমরাও শুনিয়াছি।

প্রহরী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, "জান্! আজ তুমি আমাকে বড়লোক করিলে; আমি এখনই গিয়া সেনাপতিকে বলিয়া আসি, এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব, তুমি এইখানে বসো, আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

প্রহরীর মনে বিমলার প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না।

বিমলা বলিলেন, "তুমি আসিবে ত ?"

প্র। আসিব বই কি, এই আসিলাম্।

বি। আমাকে ভুলিবে না ?

প্র। না—না।

বি। দেখ, মাথা খাও।

"চিন্তা কি ?" বলিয়া প্রহরী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গেল।

যেই প্রহরী অদৃশ্য হইল, অমনি বিমলাও উঠিয়া পলাইলেন। ওস্মানের কথা যথার্থ, "বিমলার কটাক্ষকেই ভয়।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে

বিমুক্তি লাভ করিয়া বিমলার প্রথম কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদদান। উর্দ্ধশ্বাসে বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষাভিমুখে ধাবমানা হইলেন।

…পথ যাইতে না যাইতেই "আল্লা—ল্লা—হো" পাঠান সেনার চীৎকারধ্বনি তাঁহার …প্রবেশ করিল।

"এ কি পাঠান সেনার জয়ধ্বনি।" বলিয়া বিমলা ব্যাকুলিত হইলেন। ক্রমে …য় কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইলেন;—বিমলা বুঝিলেন, দুর্গবাসীরা জাগরিত …াছে।

ব্যস্ত হইয়া বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গমন করিয়া দেখেন যে, কক্ষমধ্যেও অত্যন্ত কোলাহল; পাঠান সেনা দ্বার ভগ্ন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বিমলা উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, হস্তে নিষ্কোষিত অসি, অঙ্গে রুধিরধারা। তিনি উন্মত্তের ন্যায় অসি ঘূর্ণিত করিতেছেন। তাঁহার যুদ্ধোদ্যম বিফল হইল; এক জন মহাবল পাঠানের দীর্ঘ তরবারির আঘাতে বীরেন্দ্রের অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল; বীরেন্দ্রসিংহ বন্দী হইলেন।

বিমলা দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এখনও তিলোত্তমাকে রক্ষা করিবার সময় আছে। বিমলা তাহার কাছে দৌড়িয়া গেলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, তিলোত্তমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য; সর্ব্বত্র পাঠান সেনা ব্যাপিয়াছে। পাঠানদিগের যে দুর্গজয় হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

বিমলা দেখিলেন, তিলোত্তমার ঘরে যাইতে পাঠান সেনার হস্তে পড়িতে হয়। তিনি তখন ফিরিলেন। কাতর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া জগৎসিংহ আর তিলোত্তমাকে এই বিপত্তিকালে সংবাদ দিবেন। বিমলা একটা কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে কয়েক জন সৈনিক অন্য ঘর লুঠ করিয়া, সেই ঘর লুঠিতে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। বিমলা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ব্যস্তে কক্ষস্থ একটা সিন্দুকের পার্শ্বে লুকাইলেন। সৈনিকেরা আসিয়া ঐ কক্ষস্থ দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিলেন। বিমলা দেখিলেন, নিস্তার নাই, লুঠেরা সকল যখন ঐ সিন্দুক খুলিতে আসিবে, তখন তাঁহাকে অবশ্য ধৃত করিবে। বিমলা সাহসে নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিলেন, এবং সিন্দুকপার্শ্ব হইতে সাবধানে সেনাগণ কি করিতেছে দেখিতে লাগিলেন। বিমলার অতুল সাহস; বিপৎকালে সাহস বৃদ্ধি হইল। যখন দেখিলেন যে, সেনাগণ নিজ নিজ দস্যুবৃত্তিতে ব্যাপৃত হইয়াছে, তখন নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সিন্দুকপার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিলেন। সেনাগণ লুঠে ব্যস্ত, তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বিমলা প্রায় কক্ষদ্বার পশ্চাৎ করেন, এমন সময়ে এক জন সৈনিক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার

হস্ত ধারণ করিল। বিমলা ফিরিয়া দেখিলেন, রহিম সেখ। সে বলিয়া উঠিল, "তবে পলাতকা? আর কোথায় পলাবে?"

দ্বিতীয়বার রহিমের করকবলিত হওয়াতে বিমলার মুখ শুকাইয়া গেল; কিন্তু সে ক্ষণকালমাত্র; তেজস্বিনী বুদ্ধির প্রভাবে তখনই মুখ আবার হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিমলা মনে মনে কহিলেন, "ইহারই দ্বারা স্বকর্ম্ম উদ্ধার করিব।" তাহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "চুপ কর, আস্তে, বাহিরে আইস।"

এই বলিয়া বিমলা রহিম সেখের হস্ত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলেন; রহিমও ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিল। বিমলা তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, "ছি ছি ছি! তোমার এমন কর্ম্ম! আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমাকে না তল্লাস করিয়াছি এমন স্থান নাই।" বিমলা আবার সেই কটাক্ষ সেখজীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

সেখজীর গোসা দূর হইল; বলিল, "আমি সেনাপতিকে জগৎসিংহের সংবাদ দিবার জন্য তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেনাপতির নাগাল না পাইয়া তোমার তল্লাসে ফিরিয়া আসিলাম, তোমাকে ছাদে না দেখিয়া নানা স্থানে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছি।"

বিমলা কহিলেন, "আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে করিলাম, তুমি আমাকে ভুলিয়া গেলে, এজন্য তোমার তল্লাসে আসিয়াছিলাম। এখন আর বিলম্বে কাজ কি? তোমাদের দুর্গ অধিকার হইয়াছে; এই সময়ে পলাইবার উদ্যোগ দেখা ভাল।"

রহিম কহিল, "আজ না, কাল প্রাতে, আমি না বলিয়া কি প্রকারে যাইব? কাল প্রাতে সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া যাইব।"

বিমলা কহিলেন, "তবে চল, এই বেলা আমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে, হস্তগত করিয়া রাখি; নচেৎ আর কোন সিপাহি লুঠ করিয়া লইবে।"

সৈনিক কহিল, "চল।" রহিমকে সমভিব্যাহারে লইবার তাৎপর্য্য এই যে, সে বিমলাকে অন্য সৈনিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। বিমলার সতর্কতা অচিরাৎ প্রমাণীকৃত হইল। তাহারা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই আর এক দল অপহরণাসক্ত সেনার সম্মুখে পড়িল। বিমলাকে দেখিবামাত্র তাহারা কোলাহল করিয়া উঠিল, "ও রে, বড় শিকার মিলেছে রে!"

রহিম বলিল, "আপন আপন কর্ম্ম কর ভাই সব, এ দিকে নজর করিও না।"

সেনাগণ ভাব বুঝিয়া ক্ষান্ত হইল। এক জন কহিল, "রহিম! তোমার ভাগ্য ভাল। এখন নবাব মুখের গ্রাস না কাড়িয়া লয়।"

রহিম ও বিমলা চলিয়া গেল। বিমলা রহিমকে নিজ শয়নকক্ষের নীচের কক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন, "এই আমার নীচের ঘর ; এই ঘরের যে যে সামগ্রী লইতে ইচ্ছা হয়, সংগ্রহ কর ; ইহার উপরে আমার শুইবার ঘর, আমি তথা হইতে অলঙ্কারাদি লইয়া শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া তাহাকে এক গোছা চাবি ফেলিয়া দিলেন।

রহিম কক্ষে দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিন্দুক পেটারা খুলিতে লাগিল। বিমলার প্রতি আর তিলার্দ্ধ অবিশ্বাস রহিল না। বিমলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়াই ঘরের বহির্দ্দিকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া কুলুপ দিলেন। রহিম কক্ষমধ্যে বন্দী হইয়া রহিল।

বিমলা তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে উপরের ঘরে গেলেন। বিমলা ও তিলোত্তমার প্রকোষ্ঠ দুর্গের প্রান্তভাগে ; সেখানে এ পর্য্যন্ত অত্যাচারকারী সেনা আইসে নাই ; তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ কোলাহলও শুনিতে পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। বিমলা অকস্মাৎ তিলোত্তমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ না করিয়া কৌতূহল প্রযুক্ত দ্বারমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইতে গোপনে তিলোত্তমার ও রাজকুমারের ভাব দেখিতে লাগিলেন। যাহার যে স্বভাব ! এ সময়েও বিমলার কৌতূহল। যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন।

তিলোত্তমা পালঙ্কে বসিয়া আছেন, জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইয়া নীরবে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিলোত্তমা রোদন করিতেছেন ; জগৎসিংহও চক্ষু মুছিতেছেন।

বিমলা ভাবিলেন, "এ বুঝি বিদায়ের রোদন।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

খড়্গে খড়্গে

বিমলাকে দেখিয়া জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল ?"

বিমলা কহিলেন, "পাঠানের জয়ধ্বনি। শীঘ্র উপায় করুন ; শত্রু আর তিলার্দ্ধ মাত্রে এ ঘরের মধ্যে আসিবে।"

জগৎসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ কি করিতেছেন ?"

বিমলা কহিলেন, "তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।"

তিলোত্তমার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার নির্গত হইল; তিনি পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

জগৎসিংহ বিশুষ্কমুখ হইয়া বিমলাকে কহিলেন, "দেখ দেখ, তিলোত্তমাকে দেখ।"

বিমলা তৎক্ষণাৎ গোলাবপাশ হইতে গোলাব লইয়া তিলোত্তমার মুখে কণ্ঠে কপোলে সিঞ্চন করিলেন, এবং কাতর চিত্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

শত্রু-কোলাহল আরও নিকট হইল; বিমলা প্রায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "ঐ আসিতেছে!—রাজপুত্র! কি হইবে?"

জগৎসিংহের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "একা কি করিতে পারি? তবে তোমার সখীর রক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করিব।"

শত্রুর ভীমনাদ আরও নিকটবর্ত্তী হইল। অস্ত্রের ঝঞ্চনাও শুনা যাইতে লাগিল। বিমলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তিলোত্তমা! এ সময়ে কেন তুমি অচেতন হইলে? তোমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব?"

তিলোত্তমা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমার জ্ঞান হইতেছে; রাজকুমার! রাজকুমার! এখনও তিলোত্তমাকে বাঁচাও।"

রাজকুমার কহিলেন, "এ ঘরের মধ্যে থাকিলে কার সাধ্য রক্ষা করে! এখনও যদি ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতে, তবে আমি তোমাদিগকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিলেও পারিতাম; কিন্তু তিলোত্তমার ত গতিশক্তি নাই। বিমলে! ঐ পাঠান সিঁড়িতে উঠিতেছে। আমি অগ্রে প্রাণ দিবই, কিন্তু পরিতাপ যে, প্রাণ দিয়াও তোমাদের বাঁচাইতে পারিলাম না।"

বিমলা পলকমধ্যে তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কহিলেন, "তবে চলুন; আমি তিলোত্তমাকে লইয়া যাইতেছি।"

বিমলা আর জগৎসিংহ তিন লম্ফে কক্ষদ্বারে আসিলেন। চারি জন পাঠান সৈনিকও সেই সময়ে বেগে ধাবমান হইয়া কক্ষদ্বারে আসিয়া পড়িল। জগৎসিংহ কহিলেন, "বিমলা, আর হইল না, আমার পশ্চাৎ আইস।"

পাঠানেরা শিকার সম্মুখে পাইয়া "আল্লা—ল্লা—হো" চীৎকার করিয়া, পিশাচের ন্যায় লাফাইতে লাগিল। কটিস্থিত অস্ত্রে ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শেষ হইতে না হইতেই জগৎসিংহের অসি এক জন পাঠানের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইল। ভীম চীৎকার করিতে করিতে পাঠান প্রাণত্যাগ করিল। পাঠানের বক্ষঃ হইতে অসি

ফেলিবার পূর্ব্বেই আর এক জন পাঠানের বর্শাফলক জগৎসিংহের গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল; বর্শা পড়িতে না পড়িতেই বিদ্যুদ্বৎ হস্তচালনা দ্বারা কুমার সেই বর্শা বাম করে ধৃত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বর্শারই প্রতিঘাতে বর্শানিক্ষেপীকে ভূমিশায়ী করিলেন। বাকি দুই জন পাঠান নিমেষমধ্যে এককালে জগৎসিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিল; জগৎসিংহ পলক ফেলিতে অবকাশ না লইয়া দক্ষিণ হস্তস্থ অসির আঘাতে এক জনের অসি সহিত প্রকোষ্ঠচ্ছেদ করিয়া ভূতলে ফেলিলেন; দ্বিতীয়ের প্রহার নিবারণ করিতে পারিলেন না; অসি মস্তকে লাগিল না বটে, কিন্তু স্কন্ধদেশে দারুণ আঘাত পাইলেন। কুমার আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় ব্যাধশরস্পৃষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায় দ্বিগুণ প্রচণ্ড হইলেন; পাঠান অসি তুলিয়া পুনরাঘাতের উদ্যম করিতে না করিতেই কুমার, দুই হস্তে দৃঢ়তর মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া ভীষণ অসি ধারণ পূর্ব্বক লাফ দিয়া আঘাতকারী পাঠানের মস্তকে মারিলেন, উষ্ণীষ সহিত পাঠানের মস্তক দুই খণ্ড হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবসরে যে সৈনিকের হস্তচ্ছেদ হইয়াছিল, সে বাম হস্তে কটি হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা নির্গত করিয়া রাজপুত্র-শরীর লক্ষ্য করিল; যেমন রাজপুত্রের উল্লম্ফোত্থিত শরীর ভূতলে অবতরণ করিতেছিল, অমনি সেই ছুরিকা রাজপুত্রের বিশাল বাহুমধ্যে গভীর বিঁধিয়া গেল। রাজপুত্র সে আঘাত সূচীবেধ মাত্র জ্ঞান করিয়া পাঠানের কটিদেশে পর্ব্বতপাতবৎ পদাঘাত করিলেন, যবন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময়ে ভীমনাদে "আল্লা—ল্লা—হো" শব্দ করিয়া অগণিত পাঠানসেনাস্রোত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র দেখিলেন, যুদ্ধ করা কেবল মরণের কারণ।

রাজপুত্রের অঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইতেছে; রুধিরোৎসর্গে ক্রমে দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

তিলোত্তমা এখনও বিচেতন হইয়া বিমলার ক্রোড়ে রহিয়াছেন।

বিমলা তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছেন; তাঁহারও বস্ত্র রাজপুত্রের রক্তে আর্দ্র হইয়াছে।

কক্ষ পাঠান সেনায় পরিপূর্ণ হইল।

রাজপুত্র এবার অসির উপর ভর করিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন। এক জন পাঠান কহিল, "রে নফর! অস্ত্র ত্যাগ কর্; তোরে প্রাণে মারিব না।" নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে যেন কেহ ঘৃতাহুতি দিল। অগ্নিশিখাবৎ লম্ফ দিয়া, কুমার দাম্ভিক পাঠানের মস্তকচ্ছেদ

করিয়া নিজ চরণতলে পাড়িলেন। অসি ঘুরাইয়া ডাকিয়া কহিলেন, "যবন! রাজপুতেরা কি প্রকারে প্রাণত্যাগ করে, দেখ্।"

অনন্তর বিদ্যুদ্বৎ কুমারের অসি চমকিতে লাগিল। রাজপুত্র দেখিলেন যে, একাকী আর যুদ্ধ হইতে পারে না; কেবল যত পারেন শত্রুনিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। এই অভিপ্রায়ে শত্রুতরঙ্গের মধ্যস্থলে পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে দুই হস্তে অসি-ধারণপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আর আত্মরক্ষার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না; কেবল অজস্র আঘাত করিতে লাগিলেন। এক, দুই, তিন,—প্রতি আঘাতেই হয় কোন পাঠান ধরাশায়ী, নচেৎ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ হইতে লাগিল। রাজপুত্রের অঙ্গে চতুর্দ্দিক্ হইতে বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। আর হস্ত চলে না, ক্রমে ভূরি ভূরি আঘাতে শরীর হইতে রক্তপ্রবাহ নির্গত হইয়া বাহু ক্ষীণ হইয়া আসিল; মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চক্ষে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন; কর্ণে অস্পষ্ট কোলাহল মাত্র প্রবেশ করিতে লাগিল।

"রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না, জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরবদ্ধ করিতে হইবে।"

এই কথার পর আর কোন কথা রাজপুত্র শুনিতে পাইলেন না; ওস্মান খাঁ এই কথা বলিয়াছিলেন।

রাজপুত্রের বাহুযুগল শিথিল হইয়া লম্বমান হইয়া পড়িল; বলহীন মুষ্টি হইতে অসি ঝঞ্চনা-সহকারে ভূতলে পড়িয়া গেল; রাজপুত্রও বিচেতন হইয়া স্বকরনিহত এক পাঠানের মৃতদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিংশতি পাঠান রাজপুত্রের উষ্ণীষের রত্ন অপহরণ করিতে ধাবমান হইল। ওস্মান বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কেহ রাজপুত্রকে স্পর্শ করিও না।"

সকলে বিরত হইল। ওস্মান খাঁ ও অপর এক জন সৈনিক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কের উপর উঠাইয়া শয়ন করাইলেন। জগৎসিংহ চারি দণ্ড পূর্ব্বে তিলার্দ্ধ জন্য আশা করিয়াছিলেন যে, তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়া এক দিন সেই পালঙ্কে তিলোত্তমার সহিত বিরাজ করিবেন,—সে পালঙ্ক তাঁহার মৃত্যু-শয্যা-প্রায় হইল।

জগৎসিংহকে শয়ন করাইয়া ওস্মান খাঁ সৈনিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকেরা কই?"

ওস্মান, বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিতে পাইলেন না। যখন দ্বিতীয়বার সেনা-প্রবাহ কক্ষমধ্যে প্রধাবিত হয়, তখন বিমলা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; উপায়ান্তর

বিরহে পালঙ্ক-তলে তিলোত্তমাকে লইয়া লুকায়িত হইয়াছিলেন, কেহ তাহা দেখে নাই। ওস্‌মান তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকেরা কোথায়, তোমরা তাবৎ দুর্গমধ্যে অন্বেষণ কর। বাঁদী ভয়ানক বুদ্ধিমতী; সে যদি পলায়, তবে আমার মন নিশ্চিন্ত থাকিবেক না। কিন্তু সাবধান! বীরেন্দ্রের কন্যার প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়।"

সেনাগণ কতক কতক দুর্গের অন্যান্য ভাগ অন্বেষণ করিতে গেল। দুই এক জন কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক জন অন্য এক দিক্ দেখিয়া আলো লইয়া পালঙ্কতলমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা সন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া কহিল, "এইখানেই আছে।"

ওস্‌মানের মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "তোমরা বাহিরে আইস, কোন চিন্তা নাই।"

বিমলা অগ্রে বাহির হইয়া তিলোত্তমাকে বাহিরে আনিয়া বসাইলেন। তখন তিলোত্তমার চৈতন্য হইতেছে—বসিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কোথায় আসিয়াছি?"

বিমলা কাণে কাণে কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, অবগুণ্ঠন দিয়া বসো।"

যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিল, সে ওস্‌মানকে কহিল, "জুনাব্! গোলাম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।"

ওস্‌মান কহিল, "তুমি পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ? তোমার নাম কি?"

সে কহিল, "গোলামের নাম করিমবক্স; কিন্তু করিমবক্স বলিলে কেহ চেনে না। আমি পূর্ব্বে মোগল-সৈন্য ছিলাম, এজন্য সকলে রহস্যে আমাকে মোগল-সেনাপতি বলিয়া ডাকে।"

বিমলা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অভিরাম স্বামীর জ্যোতির্গণনা তাঁহার স্মরণ হইল।

ওস্‌মান কহিলেন, "আচ্ছা, স্মরণ থাকিবে।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়েষা

জগৎসিংহ যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তথায় যে আর কখন আসিয়াছিলেন, এমত বোধ হইল না; কক্ষটি অতি প্রশস্ত, অতি সুশোভিত; প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতল, পাদস্পর্শসুখজনক গালিচায় আবৃত; তদুপরি গোলাবপাশ প্রভৃতি স্বর্ণ রৌপ্য গজদন্তাদি নানা মহার্ঘবস্তু-নির্ম্মিত সামগ্রী রহিয়াছে; কক্ষদ্বারে বা গবাক্ষে নীল পর্দ্দা আছে; এজন্য দিবসের আলোক অতি স্নিগ্ধ হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছে; কক্ষ নানাবিধ স্নিগ্ধ সৌগন্ধে আমোদিত হইয়াছে।

কক্ষমধ্যে নীরব, যেন কেহই নাই। এক জন কিঙ্করী সুবাসিত বারিসিক্ত ব্যজনহস্তে রাজপুত্রকে নিঃশব্দে বাতাস দিতেছে, অপরা এক জন কিঙ্করী কিছু দূরে বাক্‌শক্তিবিহীনা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা আছে। যে দ্বিরদ-দন্ত-খচিত পালঙ্কে রাজপুত্র শয়ন করিয়া আছেন, তাহার উপরে রাজপুত্রের পার্শ্বে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক; তাঁহার অঙ্গের ক্ষতসকলে সাবধানহস্তে কি ঔষধ লেপন করিতেছে। হর্ম্ম্যতলে গালিচার উপরে উত্তম পরিচ্ছদবিশিষ্ট এক জন পাঠান বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে ও একখানি পারসী পুস্তক দৃষ্টি করিতেছে। কেহই কোন কথা কহিতেছে না বা শব্দ করিতেছে না।

রাজপুত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিলার্দ্ধ সরিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।

পর্য্যঙ্কে যে স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, সে রাজপুত্রের উদ্যম দেখিয়া অতি মৃদু, বীণাবৎ মধুর স্বরে কহিল, "স্থির থাকুন, চঞ্চল হইবেন না।"

রাজপুত্র ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?"

সেই মধুর স্বরে উত্তর হইল, "কথা কহিবেন না, আপনি উত্তম স্থানে আছেন। চিন্তা করিবেন না, কথা কহিবেন না।"

রাজপুত্র পুনশ্চ অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা কত?"

মধুরভাষিণী পুনরপি অস্ফুট বচনে কহিল, "অপরাহ্ণ। আপনি স্থির হউন, কথা কহিলে আরোগ্য পাইতে পারিবেন না। আপনি চুপ না করিলে আমরা উঠিয়া যাইব।"

রাজপুত্র কষ্টে কহিলেন, "আর একটি কথা; তুমি কে?"

রমণী কহিল, "আয়েষা।"

রাজপুত্র নিস্তব্ধ হইয়া আয়েষার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর কোথাও কি ইঁহাকে দেখিয়াছেন? না; আর কখন দেখেন নাই; সে বিষয় নিশ্চিত প্রতীতি হইল।

আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সে রীতির নহে; স্থিরযৌবনা বিমলারও এ কাল পর্য্যন্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্ণের স্থলপদ্মের ন্যায়; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল, অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, "রূপের আলো" কখন দেখিয়াছেন? না দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে "দশ দিক্ আলো" করে। শুনা যায়, অনেকের পুত্রবধূ "ঘর আলো" করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালো রূপেও আলো হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, "রূপের আলো" কাহাকে বলে? বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত; একটু একটু মিট্‌মিটে, তেল চাই, নহিলে জ্বলে না; গৃহকার্য্যে চলে; নিয়ে ঘর কর, ভাত রাঁধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে; কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায়; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য

হয় না ; তত প্রখর নয়, এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্ণিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা ; এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; না চম্পক, না রক্ত, না শ্বেতপদ্মকোরক, অথচ তিনই মিশ্রিত, এমত বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমিস্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম ; তাহার উপরে তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমা-রেখা দিতে পারিতাম ; সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনই কপালের গোলাকৃতির অনুগামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম ; কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম ; যদি তেমনই কালো রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম, কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সীঁতি কাটিয়া দিতে পারিতাম—তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম ; যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম ; যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম ; যদি সে অতি নিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম ; প্রথমে যথায় দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া মধ্যস্থলে না আসিতে আসিতেই যেরূপ স্থূলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে পারিতাম ; যদি সেই বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ, চঞ্চল, কোমল, চক্ষুঃপল্লব লিখিতে পারিতাম ; যদি সে নয়নযুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম ; তাহার উপরিপল্লব ও অধঃপল্লবের সুন্দর বঙ্ক ভঙ্গী, সে চক্ষুর নীলালক্তকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম ; যদি সে গর্ব্ববিস্ফারিত রন্ধ্রসমেত সুনাসা, সে রসময় ওষ্ঠাধর, সে কবরীস্পৃষ্ট প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণ-স্পর্শপ্রার্থী পীবরাংস, সে স্থূল কোমল রত্নালঙ্কারখচিত বাহু, যে অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষঃ, সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্য্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব ?

রাজপুত্র আয়েষার প্রতি অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিলোত্তমাকে মনে পড়িল। স্মৃতিমাত্র হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, শিরাসমূহমধ্যে রক্তস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রধাবিত হইল, গভীর ক্ষত হইতে পুনর্ব্বার রক্ত-প্রবাহ ছুটিল; রাজপুত্র পুনর্ব্বার বিচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

খট্টারূঢ়া সুন্দরী তৎক্ষণাৎ ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে ব্যক্তি গালিচায় বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল, সে মধ্যে মধ্যে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে আয়েষাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; এমন কি, যুবতী পালঙ্ক হইতে উঠিলে তাহার যে কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল, পাঠান তাহাই অনেকক্ষণ অপরিতৃপ্তলোচনে দেখিতে লাগিল। আয়েষা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে পাঠানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার কাণে কাণে কহিলেন, "ওস্‌মান, শীঘ্র হকিমের নিকট লোক পাঠাও।"

দুর্গজেতা ওস্‌মান খাঁই গালিচায় বসিয়া ছিলেন। আয়েষার কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আয়েষা, একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল, তাহা হইতে একটু জলবৎ দ্রব্য লইয়া পুনর্মূর্চ্ছাগত রাজপুত্রের কপালে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

ওস্‌মান খাঁ অচিরাৎ হকিম লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হকিম অনেক যত্নে রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন, এবং নানাবিধ ঔষধ আয়েষার নিকট দিয়া মৃদু মৃদু স্বরে সেবনের ব্যবস্থা উপদেশ করিলেন।

আয়েষা কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অবস্থা দেখিতেছেন?"

হকিম কহিলেন, "জ্বর অতি ভয়ঙ্কর।"

হকিম বিদায় লইয়া প্রতিগমন করেন, তখন ওস্‌মান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দ্বারদেশে তাঁহাকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "রক্ষা পাইবে?"

হকিম কহিলেন, "আকার নহে; পুনর্ব্বার যাতনা হইলে আমাকে ডাকিবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমের মধ্যে পাষাণ

সেই দিবস অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আয়েষা ও ওস্‌মান জগৎসিংহের নিকট বসিয়া রহিলেন। জগৎসিংহের কখন চেতনা হইতেছে, কখন মূর্চ্ছা হইতেছে; হকিম অনেকবার

আসিয়া দেখিয়া গেলেন। আয়েষা অবিশ্রান্তা হইয়া কুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন এক জন পরিচারিকা আসিয়া আয়েষাকে কহিল যে, বেগম তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

"যাইতেছি" বলিয়া আয়েষা গাত্রোত্থান করিলেন। ওস্‌মানও গাত্রোত্থান করিলেন। আয়েষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও উঠিলে ?"

ওস্‌মান কহিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, চল তোমাকে রাখিয়া আসি।"

আয়েষা দাসদাসীদিগকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিয়া মাতৃগৃহ অভিমুখে চলিলেন। পথে ওস্‌মান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আজ বেগমের নিকটে থাকিবে ?"

আয়েষা কহিলেন, "না, আমি আবার রাজপুত্রের নিকট প্রত্যাগমন করিব।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আয়েষা! তোমার গুণের সীমা দিতে পারি না; তুমি এই পরম শত্রুকে যে যত্ন করিয়া শুশ্রূষা করিতেছ, ভগিনী ভ্রাতার জন্য এমন করে না। তুমি উহার প্রাণদান করিতেছ।"

আয়েষা ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ওস্‌মান! আমি ত স্বভাবতঃ রমণী; পীড়িতের সেবা আমার পরম ধর্ম্ম; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই; কিন্তু তোমার কি? যে তোমার পরম বৈরী, রণক্ষেত্রে তোমার দর্পহারী প্রতিযোগী, স্বহস্তে যাহার এ দশা ঘটাইয়াছ, তুমি যে অনুদিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার সেবা করাইতেছ, তাহার আরোগ্যসাধন করাইতেছ, ইহাতে তুমিই যথার্থ প্রশংসাভাজন।"

ওস্‌মান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া কহিলেন, "তুমি, আয়েষা, আপনার সুন্দর স্বভাবের মত সকলকে দেখ। আমার অভিপ্রায় তত ভাল নহে। তুমি দেখিতেছ না, জগৎসিংহ প্রাণ পাইলে আমাদিগের কত লাভ? রাজপুত্রের এক্ষণে মৃত্যু হইলে আমাদিগের কি হইবে? রণক্ষেত্রে মানসিংহ জগৎসিংহের ন্যূন নহে, এক জন যোদ্ধার পরিবর্ত্তে আর এক জন যোদ্ধা আসিবে। কিন্তু যদি জগৎসিংহ জীবিত থাকিয়া আমাদিগের হস্তে কারারুদ্ধ থাকে, তবে মানসিংহকে হাতে পাইলাম; সে প্রিয় পুত্রের মুক্তির জন্য অবশ্য আমাদিগের মঙ্গলজনক সন্ধি করিবে; আকবরও এতাদৃশ দক্ষ সেনাপতিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য অবশ্য সন্ধির পক্ষে মনোযোগী হইতে পারিবে; আর যদি জগৎসিংহকে আমাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত সন্ধিবন্ধন পক্ষে অনুরোধ কি যত্ন করিতে পারে; তাহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল

হইবে না। নিতান্ত কিছু ফল না দর্শে, তবে জগৎসিংহের স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ মানসিংহের নিকট বিস্তর ধনও পাইতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে এক দিন জয়ী হওয়ার অপেক্ষাও জগৎসিংহের জীবনে আমাদিগের উপকার।"

ওস্‌মান এই সকল আলোচনা করিয়া রাজপুত্রের পুনর্জীবনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আর কিছুও ছিল। কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে, পাছে লোকে দয়ালু-চিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন; এবং দয়াশীলতা নারী-স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন, ওস্‌মান তাহারই এক জন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওস্‌মান! সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়। তাহা হইলে আর ধর্ম্মে কাজ নাই।"

ওস্‌মান কিঞ্চিৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুতরস্বরে কহিলেন, "আমি যে পরম স্বার্থপর, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।"

আয়েষা নিজ সবিদ্যুৎ মেঘতুল্য চক্ষুঃ ওস্‌মানের বদনের প্রতি স্থির করিলেন।

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি আশা-লতা ধরিয়া আছি, আর কত কাল তাহার তলে জলসিঞ্চন করিব?"

আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। ওস্‌মান এ ভাবান্তরেও নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ওস্‌মান! ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।"

ওস্‌মানের হর্ষোৎফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। কহিলেন, "ঐ কথা চিরকাল! সৃষ্টিকর্ত্তা! এ কুসুমের দেহমধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া রাখিয়াছ?"

ওস্‌মান আয়েষাকে মাতৃগৃহ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়া বিষণ্ণ মনে নিজ আবাসমন্দির মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর জগৎসিংহ?

বিষম জ্বর-বিকারে অচেতন শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তুমি না তিলোত্তমা?

পরদিন প্রদোষকালে জগৎসিংহের অবস্থান-কক্ষে আয়েষা, ওস্‌মান, আর চিকিৎসক পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন; আয়েষা পালঙ্কে বসিয়া স্বহস্তে ব্যজনাদি করিতেছেন; চিকিৎসক ঘন ঘন জগৎসিংহের নাড়ী দেখিতেছেন; জগৎসিংহ অচেতন; চিকিৎসক কহিয়াছেন, সেই রাত্রে জ্বরত্যাগের সময়ে জগৎসিংহের লয় হইবার সম্ভাবনা, যদি সে সময় শুধরাইয়া যান, তবে আর চিন্তা থাকিবে না, নিশ্চিত রক্ষা পাইবেন। জ্বর-বিশ্রামের সময় আগত, এই জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র; চিকিৎসক মুহুর্ম্মুহুঃ নাড়ী দেখিতেছেন, "নাড়ী ক্ষীণ," "আরও ক্ষীণ,"—"কিঞ্চিৎ সবল," 'ইত্যাদি মুহুর্মুহুঃ অস্ফুট-শব্দে বলিতেছেন। সহসা চিকিৎসকের মুখ কালিমাপ্রাপ্ত হইল। বলিলেন, "সময় আগত।"

আয়েষা ও ওস্‌মান নিস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। হকিম নাড়ী ধরিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিকিৎসক কহিলেন, "গতিক মন্দ।" আয়েষার মুখ আরও ম্লান হইল। হঠাৎ জগৎসিংহের মুখে বিকট ভঙ্গী উপস্থিত হইল; মুখ শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল; হস্তে দৃঢ়মুষ্টি বাঁধিল; চক্ষে অলৌকিক স্পন্দ হইতে লাগিল; আয়েষা বুঝিলেন, কৃতান্তের গ্রাস পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। চিকিৎসক হস্তস্থিত পাত্রে ঔষধ লইয়া বসিয়া ছিলেন; এরূপ লক্ষণ দেখিবামাত্রই অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর মুখব্যাদান করাইয়া ঐ ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ ওষ্ঠোপান্ত হইতে নির্গত হইয়া পড়িল; কিঞ্চিৎ উদরে গেল। উদরে প্রবেশমাত্রই রোগীর দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; ক্রমে মুখের বিকট ভঙ্গী দূরে গিয়া কান্তি স্থির হইল, বর্ণের অস্বাভাবিক শ্বেতভাব বিনষ্ট হইয়া ক্রমে রক্তসঞ্চার হইতে লাগিল; হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল; চক্ষু স্থির হইয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইল। হকিম অত্যন্ত মনোভিনিবেশপূর্ব্বক নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন, "আর চিন্তা নাই; রক্ষা পাইয়াছেন।"

ওস্‌মান জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্বরত্যাগ হইয়াছে?"

ভিষক্ কহিলেন, "হইয়াছে।"

আয়েষা ও ওস্‌মান উভয়েরই মুখ প্রফুল্ল হইল। ভিষক্ কহিলেন, "এখন আর কোন চিন্তা নাই, আমার বসিয়া থাকার প্রয়োজন করে না ; এই ঔষধ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ঘড়ী ঘড়ী খাওয়াইবেন।" এই বলিয়া ভিষক্ প্রস্থান করিলেন। ওস্‌মান আর দুই চারি দণ্ড বসিয়া নিজ আবাসগৃহে গেলেন। আয়েষা পূর্ব্ববৎ পালঙ্কে বসিয়া ঔষধাদি সেবন করাইতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজকুমার নয়ন উন্মীলন করিলেন। প্রথমেই আয়েষার সুখপ্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইলেন। চক্ষুর কটাক্ষভাব দেখিয়া আয়েষার বোধ হইল, যেন তাঁহার বুদ্ধির ভ্রম জন্মিতেছে, যেন তিনি কিছু স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যত্ন বিফল হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে আয়েষার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমি কোথায় ?" দুই দিবসের পর রাজপুত্র এই প্রথম কথা কহিলেন।

আয়েষা কহিলেন, "কতলু খাঁর দুর্গে।"

রাজপুত্র আবার পূর্ব্ববৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি কেন এখানে ?"

আয়েষা প্রথমে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন ; পরে কহিলেন, "আপনি পীড়িত।"

রাজপুত্র ভাবিতে ভাবিতে মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "না না, আমি বন্দী হইয়াছি।"

এই কথা বলিতে রাজপুত্রের মুখের ভাবান্তর হইল।

আয়েষা উত্তর করিলেন না ; দেখিলেন, রাজপুত্রের স্মৃতিক্ষমতা পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে।

ক্ষণপরে রাজপুত্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

"আমি আয়েষা।"

"আয়েষা কে ?"

"কতলু খাঁর কন্যা।"

রাজপুত্র আবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন ; এককালে অধিকক্ষণ কথা কহিতে শক্তি নাই। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বিশ্রাম লাভ করিয়া কহিলেন, "আমি কয় দিন এখানে আছি ?"

"চারি দিন।"

"গড় মান্দারণ অদ্যাপি তোমাদিগের অধিকারে আছে ?"

"আছে।"

জগৎসিংহ আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে ?"

"বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ আছেন, অদ্য তাঁহার বিচার হইবে।"

জগৎসিংহের মলিন মুখ আরও মলিন হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর পৌরবর্গ কি অবস্থায় আছে?"

আয়েষা উদ্বিগ্না হইলেন। কহিলেন, "সকল কথা আমি অবগত নহি।"

রাজপুত্র আপনা আপনি কি বলিলেন। একটি নাম তাঁহার কণ্ঠনির্গত হইল, আয়েষা তাহা শুনিতে পাইলেন, "তিলোত্তমা।"

আয়েষা ধীরে ধীরে উঠিয়া পাত্র হইতে ভিষগ্‌দত্ত সুস্বাদু ঔষধ আনিতে গেলেন; রাজপুত্র তাঁহার দোদুল্যমান কর্ণাভরণসংযুক্ত অলৌকিক দেহমহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আয়েষা ঔষধ আনিলেন; রাজপুত্র তাহা পান করিয়া কহিলেন, "আমি পীড়ার মোহে স্বপ্নে দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি, না তিলোত্তমা?"

আয়েষা কহিলেন, "আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অবগুণ্ঠনবতী

দুর্গজয়ের দুই দিবস পরে, বেলা প্রহরেকের সময়ে কতলু খাঁ নিজ দুর্গমধ্যে দরবারে বসিয়াছেন। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পারিষদ্‌গণ দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে বহু সহস্র লোক নিঃশব্দে রহিয়াছে। অদ্য বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড হইবে।

কয়েক জন শস্ত্রপাণি প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল। বীরেন্দ্রসিংহের মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভীতিচিহ্ন কিছুমাত্র নাই। প্রদীপ্ত চক্ষুঃ হইতে অগ্নিকণা বিস্ফুরিত হইতেছিল; নাসিকারন্ধ্র বর্দ্ধিতায়তন হইয়া কম্পিত হইতেছিল। দন্তে অধর দংশন করিতেছিলেন। কতলু খাঁর সম্মুখে আনীত হইলে, কতলু খাঁ বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ! তোমার অপরাধের দণ্ড করিব। তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে?"

বীরেন্দ্রসিংহ নিজ লোহিত-মূর্ত্তি-প্রকটিত ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে কোন্ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা অগ্রে আমাকে বল।"

এক জন পারিষদ্ কহিল, "বিনীত ভাবে কথা কহ।"

কতলু খাঁ বলিলেন, "কি জন্য আমার আদেশমত, আমাকে অর্থ আর সেনা পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলে?"

বীরেন্দ্রসিংহ অকুতোভয়ে কহিলেন, "তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু; তোমাকে কেন অর্থ দিব? তোমায় কি জন্য সেনা দিব?"

দ্রষ্টৃবর্গ দেখিলেন, বীরেন্দ্র আপন মুণ্ড আপনি ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন।

কতলু খাঁর ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ক্রোধ সংবরণ করিবার ক্ষমতা অভ্যাসসিদ্ধ করিয়াছিলেন; এজন্য কতক স্থিরভাবে কহিলেন, "তুমি আমার অধিকারে বসতি করিয়া, কেন মোগলের সহিত মিলন করিয়াছিলে?"

বীরেন্দ্র কহিলেন, "তোমার অধিকার কোথা?"

কতলু খাঁ আরও কুপিত হইয়া কহিলেন, "শোন্ দুরাত্মা! নিজ কর্ম্মোচিত ফল-পাইবি। এখনও তোর জীবনের আশা ছিল, কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, নিজ দর্পে আপন বধের উদ্যোগ করিতেছিস্।"

বীরেন্দ্রসিংহ সগর্ব্বে হাস্য করিলেন; কহিলেন, "কতলু খাঁ—আমি তোমার কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই। তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যার জীবন রক্ষা,—তাহার জীবনে প্রয়োজন? তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম; কিন্তু তুমি আমার পবিত্র কুলে কালি দিয়াছ; তুমি আমার প্রাণের অধিক ধনকে—"

বীরেন্দ্রসিংহ আর বলিতে পারিলেন না; স্বর বদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল; নির্ভীক গর্ব্বিত বীরেন্দ্রসিংহ অধোবদন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কতলু খাঁ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর; এতদূর নিষ্ঠুর যে, পরপীড়ায় তাঁহার উল্লাস জন্মিত। দাম্ভিক বৈরীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। কহিলেন, "বীরেন্দ্র-সিংহ! তুমি কি আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে না? বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার সময় নিকট।"

যে দুঃসহ সন্তাপাগ্নিতে বীরেন্দ্রের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, রোদন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ শমতা হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা স্থির ভাবে উত্তর করিলেন, "আর কিছুই চাহি না, কেবল এই ভিক্ষা যে, আমার বধ-কার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত কর।"

ক। তাহাই হইবে, আর কিছু?

উত্তর। "এ জন্মে আর কিছু না।"

ক। মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না?

এই প্রশ্ন শুনিয়া দ্রষ্টৃবর্গ পরিতাপে নিঃশব্দ হইল। বীরেন্দ্রের চক্ষে আবার উজ্জ্বলাগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

"যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে জীবিতা থাকে, তবে সাক্ষাৎ করিব না। যদি মরিয়া থাকে, লইয়া আইস, কোলে করিয়া মরিব।"

দ্রষ্টৃবর্গ একেবারে নীরব, অগণিত লোক এতাদৃশ গভীর নিস্তব্ধ যে, সূচীপাত হইলে শব্দ শুনা যাইত। নবাবের ইঙ্গিত পাইয়া, রক্ষিবর্গ বীরেন্দ্রসিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। তথায় উপনীত হইবার কিছু পূর্ব্বে এক জন মুসলমান বীরেন্দ্রের কাণে কাণে কি কহিল; বীরেন্দ্র তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মুসলমান তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বীরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে ঐ পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে, বিমলার হস্তের লেখা। বীরেন্দ্র ঘোর বিরক্তির সহিত লিপি মর্দ্দিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। লিপি-বাহক লিপি তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটস্থ কোন দর্শক বীরেন্দ্রের এই কর্ম্ম দেখিয়া অপরকে অনুচ্চৈঃস্বরে কহিল, "বুঝি কন্যার পত্র?"

কথা বীরেন্দ্রের কাণে গেল। সেই দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কে বলে আমার কন্যা? আমার কন্যা নাই।"

পত্রবাহক পত্র লইয়া গেল। রক্ষিবর্গকে কহিয়া গেল, "আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন না করি, ততক্ষণ বিলম্ব করিও।"

রক্ষিগণ কহিল, "যে আজ্ঞা প্রভো!"

স্বয়ং ওস্মান পত্রবাহক; এই জন্য রক্ষিবর্গ প্রভু-সম্বোধন করিল।

ওস্মান লিপিহস্তে অন্তঃপুর-প্রাচীর-মধ্যে গেলেন; তথায় এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা আছে। ওস্মান তাহার সন্নিধানে গিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবৃত্ত করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কহিলেন, "আপনাকে বহু ক্লেশ দিতেছি, কিন্তু আপনা হইতেই আমাদের এ দশা ঘটিয়াছে। আপনাকে আমার এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"

ওস্মান নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অবগুণ্ঠনবতী মনঃপীড়া-বিকম্পিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "না করেন—না করুন, আমরা এক্ষণে অনাথা; কিন্তু জগদীশ্বর আছেন!"

ওস্‌মান কহিলেন, "মা! তুমি জান না যে, কি কঠিন কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ। কতলু খাঁ জানিতে পারিলে আমার প্রাণান্ত করিবে।"

স্ত্রী কহিল, "কতলু খাঁ? আমাকে কেন প্রবঞ্চনা কর? কতলু খাঁর সাধ্য নাই যে, তোমার কেশ স্পর্শ করে।"

ও। কতলু খাঁকে চেন না।—কিন্তু চল, আমি তোমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইব।

ওস্‌মানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবগুণ্ঠনবতী বধ্যভূমিতে গিয়া নিস্তব্ধে দণ্ডায়মানা হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে না দেখিয়া এক জন ভিখারীর বেশধারী ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে দেখিলেন, ভিখারী অভিরাম স্বামী।

বীরেন্দ্র অভিরাম স্বামীকে কহিলেন, "গুরুদেব! তবে বিদায় হইলাম। আমি আর আপনাকে কি বলিয়া যাইব? ইহলোকে আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই; কাহার জন্য প্রার্থনা করিব?"

অভিরাম স্বামী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীকে দেখাইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন; অমনি রমণী অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরেন্দ্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদতলে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র গদগদ স্বরে ডাকিলেন, "বিমলা!"

"স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর!" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে? স্বামী! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও!"

বীরেন্দ্রসিংহের চক্ষে দরদর অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। হস্ত ধরিয়া বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা! প্রিয়তমে! এ সময়ে কেন আমায় রোদন করাও! শত্রুরা দেখিলে আমায় মরণে ভীত মনে করিবে।"

বিমলা নিস্তব্ধ হইলেন। বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "বিমলে! আমি যাই, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।"

বিমলা কহিলেন, "যাইব।"

আর কেহ না শুনিতে পায় এমত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "যাইব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপবৎ বীরেন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—কহিলেন, "পারিবে?"

বিমলা দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, "এই হস্তে! এই হস্তের স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম; আর কাজ কি!" বলিয়া কঙ্কণাদি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিব না।"

বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।"

জল্লাদ ডাকিয়া কহিল, "আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

বীরেন্দ্র বিমলাকে কহিলেন, "আর কি? তুমি এখন যাও।"

বিমলা কহিলেন, "না, আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।" বিমলার স্বর ভয়ঙ্কর স্থির।

"তাহাই হউক," বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহ জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলা দেখিতে পাইলেন, ঊর্দ্ধোত্থিত কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইল; তাঁহার নয়ন-পল্লব মুহূর্ত্ত জন্য আপনি মুদ্রিত হইল; পুনরুন্মীলন করিয়া দেখেন, বীরেন্দ্রসিংহের ছিন্ন শির রুধির-সিক্ত ধূলিতে অবলুণ্ঠন করিতেছে।

বিমলা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন, মস্তকের একটি কেশ বাতাসে দুলিতেছে না। এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না। চক্ষুর পলক নাই, একদৃষ্টে ছিন্ন শির প্রতি চাহিয়া আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিধবা

তিলোত্তমা কোথায়? পিতৃহীনা, অনাথিনী বালিকা কোথায়? বিমলাই বা কোথায়? কোথা হইতে বিমলা স্বামীর বধ্যভূমিতে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন? তাহার পরই আবার কোথায় গেলেন?

কেন বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুকালে প্রিয়তমা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না? কেনই বা নামমাত্রে হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন? কেন বলিয়াছেন, "আমার কন্যা নাই?"

কেন বিমলার পত্র বিনা পাঠে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন?

কেন? কতলু খাঁর প্রতি বীরেন্দ্রের তিরস্কার স্মরণ করিয়া দেখ, কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে।

"পবিত্র কুলে কালি পড়িয়াছে" এই কথা বলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিয়াছিল।

তিলোত্তমা আর বিমলা কোথায়, জিজ্ঞাসা কর? কতলু খাঁর উপপত্নীদিগের আবাসগৃহে সন্ধান কর, দেখা পাইবে।

সংসারের এই গতি! অদৃষ্টচক্রের এমনি নিদারুণ আবর্ত্তন! রূপ, যৌবন, সরলতা, অমলতা, সকলই নেমির পেষণে দলিত হইয়া যায়!

কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল যে, কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে, তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত। গড় মান্দারণ জয়ের পরদিবস, কতলু খাঁ তথায় উপনীত হইয়া বন্দীদিগের প্রতি যথা-বিহিত বিধান ও ভবিষ্যতে দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ পক্ষে সৈন্য নিয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিবামাত্র নিজ বিলাসগৃহ সাজাইবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইলেন। তৎপরে অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এমন শ্রুত ছিলেন যে, রাজপুত সেনা জগৎসিংহের বন্ধন শুনিয়া নিকটে কোথাও আক্রমণের উদ্যোগে আছে; অতএব তাহাদিগের পরাঙ্মুখ করিবার জন্য উচিত ব্যবস্থা বিধানাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এজন্য এ পর্য্যন্ত কতলু খাঁ নূতন দাসীদিগের সঙ্গ-সুখলাভ করিতে অবকাশ পান নাই।

বিমলা ও তিলোত্তমা পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে রক্ষিত হইয়াছিলেন। যথায় পিতৃহীনা নবীনার ধূলি-ধূসরা দেহলতা ধরাতলে পড়িয়া আছে, পাঠক! তথায় নেত্রপাত করিয়া কাজ নাই। কাজ কি? তিলোত্তমা প্রতি কে আর এখন নেত্রপাত করিতেছে? মধূদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ-বায়ু-হিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে, কে না তখন সুবাসাশয়ে সাদরে তাহার কাছে দণ্ডায়মান হয়? আর যখন নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ সহিত সে ভূতলশায়িনী হয়, তখন উন্মূলিত পদার্থরাশি মধ্যে বৃক্ষ ছাড়িয়া কে লতা দৃষ্টি করে? কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিয়া লইয়া যায়, লতাকে পদতলে দলিত করে মাত্র।

চল, তিলোত্তমাকে রাখিয়া অন্যত্র যাই। যথায় চঞ্চলা, চতুরা, রসপ্রিয়া, রসিকা বিমলার পরিবর্ত্তে গম্ভীরা, অনুতাপিতা, মলিনা বিধবা চক্ষে অঞ্চল দিয়া বসিয়া আছে, তথায় যাই।

এই কি বিমলা? তাহার সে কেশবিন্যাস নাই। মাথায় ধূলিরাশি; সে কারু-কার্য্য-খচিত ওড়না নাই; সে রত্ন-খচিত কাঁচলি নাই; বসন বড় মলিন। পরিধানে জীর্ণ, ক্ষুদ্র বসন। সে অলঙ্কার-ভার কোথায়? সে অংসসংস্পর্শলোভী কর্ণাভরণ কোথায়? চক্ষু ফুলিয়াছে কেন? সে কটাক্ষ কই? কপালে ক্ষত কেন? রুধির যে বাহিত হইতেছে!

বিমলা ওস্‌মানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ওস্‌মান পাঠানকুলতিলক। যুদ্ধ তাঁহার স্বার্থসাধন ও নিজ ব্যবসায় এবং ধর্ম্ম; সুতরাং যুদ্ধজয়ার্থ ওস্‌মান কোন কার্য্যেই সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না। যদি কতলু খাঁ স্বয়ং বিমলা, তিলোত্তমার অদৃষ্টে এ দারুণ বিধান না করিতেন, তবে ওস্‌মানের কৃপায় তাঁহারা কদাচ বন্দী থাকিতেন না। তাঁহারই অনুকম্পায় স্বামীর মৃত্যুকালে বিমলা তৎসাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। পরে যখন ওস্‌মান জানিতে পারিলেন যে, বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী, তখন তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত আরও আর্দ্রীভূত হইল। ওস্‌মান কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, * এজন্য অন্তঃপুরেও কোথাও তাঁহার গমনে বারণ ছিল না, ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। যে বিহারগৃহে কতলু খাঁর উপপত্নীসমূহ থাকিত, সে স্থলে কতলু খাঁর পুত্রেরাও যাইতে পারিতেন না, ওস্‌মানও নহে। কিন্তু ওস্‌মান কতলু খাঁর দক্ষিণ হস্ত, ওস্‌মানের বাহুবলেই তিনি আমোদর তীর পর্য্যন্ত উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং পৌরজন প্রায় কতলু খাঁর যাদৃশ, ওস্‌মানের তাদৃশ বাধ্য ছিল। এজন্যই অদ্য প্রাতে বিমলার প্রার্থনানুসারে, চরমকালে তাঁহার স্বামিসন্দর্শন ঘটিয়াছিল।

বৈধব্য-ঘটনার দুই দিবস পরে বিমলার যে কিছু অলঙ্কারাদি অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায় লইয়া তিনি কতলু খাঁর নিয়োজিত দাসীকে দিলেন। দাসী কহিল, "আমায় কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

বিমলা কহিলেন, "তুমি যেরূপ কা'ল ওস্‌মানের নিকট গিয়াছিলে, সেইরূপ আর একবার যাও; কহিও যে, আমি তাঁহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিতা; বলিও এই শেষ, আর তৃতীয়বার ভিক্ষা করিব না।"

দাসী সেইরূপ করিল। ওস্‌মান বলিয়া পাঠাইলেন, "সে মহাল মধ্যে আমার যাতায়াতে উভয়েরই সঙ্কট; তাঁহাকে আমার আবাসমন্দিরে আসিতে কহিও।"

* ইতিহাসে লেখে পুত্র।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাই কি প্রকারে?" দাসী কহিল, "তিনি কহিয়াছেন যে, তিনি তাহার উপায় করিয়া দিবেন।"

সন্ধ্যার পর আয়েষার এক জন দাসী আসিয়া অন্তঃপুররক্ষী খোজাদিগের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়া বিমলাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ওস্‌মানের নিকট লইয়া গেল।

ওস্‌মান কহিলেন, "আর তোমার কোন অংশে উপকার করিতে পারি?" বিমলা কহিলেন, "অতি সামান্য কথামাত্র; রাজপুতকুমার জগৎসিংহ কি জীবিত আছেন?"

ও। জীবিত আছেন।

বি। স্বাধীন আছেন কি বন্দী হইয়াছেন?

ও। বন্দী বটে, কিন্তু আপাততঃ কারাগারে নহে। তাঁহার অঙ্গের অস্ত্রক্ষতের হেতু পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছেন। কতলু খাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অন্তঃপুরেই রাখিয়াছি। সেখানে বিশেষ যত্ন হইবে বলিয়া রাখিয়াছি।

বিমলা শুনিয়া বলিলেন, "এ অভাগিনীদিগের সম্পর্কমাত্রেই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। সে সকল দেবতাকৃত। এক্ষণে যদি রাজপুত্র পুনর্জ্জীবিত হয়েন, তবে তাঁহার আরোগ্যপ্রাপ্তির পর, এই পত্রখানি তাঁহাকে দিবেন; আপাততঃ আপনার নিকট রাখিবেন। এইমাত্র আমার ভিক্ষা।"

ওস্‌মান লিপি প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "ইহা আমার অনুচিত কার্য্য; রাজপুত্র যে অবস্থাতেই থাকুন, তিনি বন্দী বলিয়া গণ্য। বন্দীদিগের নিকট কোন লিপি আমরা নিজে পাঠ না করিয়া যাইতে দেওয়া অবৈধ, এবং আমার প্রভুর আদেশবিরুদ্ধ।"

বিমলা কহিলেন, "এ লিপির মধ্যে আপনাদিগের অনিষ্টকারক কোন কথাই নাই, সুতরাং অবৈধ কার্য্য হইবে না। আর প্রভুর আদেশ? আপনি আপন প্রভু।"

ওস্‌মান কহিলেন, "অন্যান্য বিষয়ে আমি পিতৃব্যের আদেশবিরুদ্ধ আচরণ কখন করিতে পারি; কিন্তু এ সকল বিষয়ে নহে। আপনি যখন কহিতেছেন যে, এই লিপি-মধ্যে বিরুদ্ধ কথা নাই, তখন সেইরূপই আমার প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না।"

বিমলা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আপনি পাঠ করিয়াই দিবেন।"

ওস্‌মান লিপি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিমলার পত্র

"যুবরাজ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এক দিন আপনার পরিচয় দিব। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ভরসা করিয়াছিলাম, আমার তিলোত্তমা অম্বরের সিংহাসনারূঢ়া হইলে পরিচয় দিব। সে সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে। বোধ করি যে, কিছু দিন মধ্যে শুনিতে পাইবেন, এ পৃথিবীতে তিলোত্তমা কেহ নাই, বিমলা কেহ নাই। আমাদিগের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।

এই জন্যই এখন আপনাকে এ পত্র লিখিতেছি। আমি মহাপাপীয়সী, বহুবিধ অবৈধ কার্য্য করিয়াছি, আমি মরিলে লোকে নিন্দা করিবে, কত মত কদর্য্য কথা বলিবে, কে তখন আমার ঘৃণিত নাম হইতে কলঙ্কের কালি মুছাইয়া তুলিবে? এমন সুহৃদ্ কে আছে?

এক সুহৃদ্ আছেন, তিনি অচিরাৎ লোকালয় ত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রস্থান করিবেন। অভিরাম স্বামী হইতে দাসীর কার্য্যোদ্ধার হইবে না। রাজকুমার! এক দিনের তরেও আমি ভরসা করিয়াছিলাম, আমি আপনার আত্মীয়জনমধ্যে গণ্যা হইব। এক দিনের তরে আপনি আমার আত্মীয়জনের কর্ম্ম করুন। কাহাকেই বা এ কথা বলিতেছি? অভাগিনীদিগের মন্দ ভাগ্য অগ্নিশিখাবৎ, যে বন্ধু নিকটে ছিলেন, তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছে। যাহাই হউক, দাসীর এই ভিক্ষা স্মরণ রাখিবেন। যখন লোকে বলিবে বিমলা কুলটা ছিল, দাসী বেশে গণিকা ছিল, তখন কহিবেন, বিমলা নীচ-জাতি-সম্ভবা, বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা দুঃশাসিত রসনা-দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলা এক দিনের তরে নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বাস-ঘাতিনী নহে।

এত দিন এ কথা প্রকাশ ছিল না, আজ কে বিশ্বাস করিবে? কেনই বা পত্নী হইয়া দাসীবৎ ছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন—

গড় মান্দারণের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের বাস। শশিশেখর কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র; যৌবনকালে যথারীতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু

অধ্যয়নে স্বভাবদোষ দূর হয় না। জগদীশ্বর শশিশেখরকে সর্ব্বপ্রকার গুণ দান করিয়াও এক দোষ প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন, সে যৌবনকালের প্রবল দোষ।

গড় মান্দারণে জয়ধরসিংহের কোন অনুচরের বংশে একটি পতিবিরহিণী রমণী ছিল। তাহার সৌন্দর্য্য অলৌকিক। তাহার স্বামী রাজসেনামধ্যে সিপাহি ছিল, এজন্য বহুদিন দেশত্যাগী। সেই সুন্দরী শশিশেখরের নয়নপথের পথিক হইল। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ঔরসে পতিবিরহিতার গর্ভসঞ্চার হইল।

অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপনে থাকে না। শশিশেখরের দুষ্কৃতি তাঁহার পিতৃকর্ণে উঠিল। পুত্র-কৃত পরকুল-কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য শশিশেখরের পিতা সংবাদ লিখিয়া গর্ভবতীর স্বামীকে ত্বরিত গৃহে আনাইলেন। অপরাধী পুত্রকে বহুবিধ ভর্ৎসনা করিলেন। কলঙ্কিত হইয়া শশিশেখর দেশত্যাগী হইলেন।

শশিশেখর পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন, তথায় কোন সর্ব্ববিৎ দণ্ডীর বিদ্যার খ্যাতি শ্রুত হইয়া, তাঁহার নিকট অধ্যয়নারম্ভ করিলেন। বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; দর্শনাদিতে অত্যন্ত সুপটু হইলেন, জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

শশিশেখর এক জন শূদ্রীর গৃহের নিকটে বাস করিতেন। শূদ্রীর এক নবযুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণে ভক্তিপ্রযুক্ত যুবতী আহারীয় আয়োজন প্রভৃতি শশিশেখরের গৃহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিত। মাতৃপিতৃদুষ্কৃতিভারে আবরণ নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। অধিক কি কহিব, শূদ্রীকন্যার গর্ভে শশিশেখরের ঔরসে এ অভাগিনীর জন্ম হইল।

শ্রবণমাত্র অধ্যাপক ছাত্রকে কহিলেন, 'শিষ্য! আমার নিকট দুষ্কর্ম্মান্বিতের অধ্যয়ন হইতে পারে না। তুমি আর কাশীধামে মুখ দেখাইও না।'

শশিশেখর লজ্জিত হইয়া কাশীধাম হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাতাকে মাতামহ দুশ্চারিণী বলিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী মাতা আমাকে লইয়া এক কুটীরে রহিলেন। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবন-ধারণ করিতেন; কেহ দুঃখিনীর প্রতি ফিরিয়া চাহিত না। পিতারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে, শীতকালে এক জন আঢ্য পাঠান বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী নগরে গমনকালে কাশীধাম দিয়া যান। অধিক রাত্রিতে নগরে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে থাকিবার স্থান পান না; তাঁহার সঙ্গে বিবি ও একটি নবকুমার। তাঁহারা মাতার কুটীরসন্নিধানে আসিয়া কুটীরমধ্যে নিশাযাপনের প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন, 'এ রাত্রে হিন্দুপল্লীমধ্যে

কেহ আমাকে স্থান দিল না। এখন আমরা এ বালকটিকে লইয়া আর কোথা যাই ? ইহার হিম সহ্য হইবে না। আমার সহিত অধিক লোক জন নাই, কুটীরমধ্যে অনায়াসে স্থান হইবে। আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব।' বস্তুতঃ পাঠান বিশেষ প্রয়োজনে ত্বরিতগমনে দিল্লী যাইতেছিলেন ; তাঁহার সহিত একমাত্র ভৃত্য ছিল। মাতা দরিদ্রও বটে ; সদয়চিত্তও বটে ; ধনলোভেই হউক বা বালকের প্রতি দয়া করিয়াই হউক, পাঠানকে কুটীরমধ্যে স্থান দিলেন। পাঠান স-স্ত্রী-সন্তান নিশাযাপনার্থ কুটীরের এক ভাগে প্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করিল—দ্বিতীয় ভাগে আমরা শয়ন করিলাম।

ঐ সময়ে কাশীধামে অত্যন্ত বালকচোরের ভয় প্রবল হইয়াছিল। আমি তখন ছয় বৎসরের বালিকামাত্র, আমি সকল স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। মাতার নিকটে যেরূপ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

নিশীথে প্রদীপ জ্বলিতেছিল ; এক জন চোর পর্ণকুটীরমধ্যে সিঁদ দিয়া পাঠানের বালকটি অপহরণ করিয়া যাইতেছিল ; আমার তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল ; আমি চোরের কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। চোর বালক লইয়া যায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। আমার চীৎকারে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

পাঠানের স্ত্রী দেখিলেন, বালক শয্যায় নাই। একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। চোর তখন বালক লইয়া শয্যাতলে লুকায়িত হইয়াছিল। পাঠান তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়া বালক কাড়িয়া লইলেন। চোর বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতে অসি দ্বারা কর্ণচ্ছেদ মাত্র করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।"

এই পর্য্যন্ত লিপি পাঠ করিয়া ওস্মান অন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে বিমলাকে কহিলেন, "তোমার কখন কি অন্য কোন নাম ছিল না ?"

বিমলা কহিলেন, "ছিল। সে যাবনিক নাম বলিয়া পিতা নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।"

"কি সে নাম ? মাহরু ?"

বিমলা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?"

ওস্মান কহিলেন, "আমিই সেই অপহৃত বালক।"

বিমলা বিস্মিত হইলেন। ওস্মান পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন।

"পরদিন প্রাতে পাঠান বিদায় কালে মাতাকে কহিলেন, 'তোমার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রত্যুপকার করি, এমত সাধ্য নাই ; কিন্তু তোমার যে

কিছুতে অভিলাষ থাকে, আমাকে কহ; আমি দিল্লী যাইতেছি, তথা হইতে আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু পাঠাইয়া দিব। অর্থ চাহ, তাহাও পাঠাইয়া দিব।'

মাতা কহিলেন, 'আমার ধনে প্রয়োজন নাই। আমি নিজ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করি, তবে যদি বাদশাহের নিকট আপনার প্রতিপত্তি থাকে,—'

এই সমস্ত কথা হইতে না হইতে পাঠান কহিলেন, 'যথেষ্ট আছে। আমি রাজদরবারে তোমার উপকার করিতে পারি।'

মাতা কহিলেন, 'তবে এই বালিকার পিতার অনুসন্ধান করাইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন।'

পাঠান প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। মাতার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিলেন; মাতা তাহা গ্রহণ করিলেন না। পাঠান নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুরুষদিগকে পিতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাজপুরুষেরা পিতার সন্ধান পাইয়া পূর্ব্বপ্রচারিত রাজাজ্ঞানুসারে মাতাকে সংবাদলিপি পাঠাইলেন। পিতা দিল্লীতে ছিলেন। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নাম ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। যখন এই সংবাদ আসিল, তখন মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূতি ব্যতীত যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পিতৃসংবাদ পাইলে আর কাশীধামে আমার মন তিষ্ঠিল না। সংসার মধ্যে কেবল আমার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি যদি দিল্লীতে, তবে আমি আর কাহার জন্য কাশীতে থাকি, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি একাকিনী পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলাম। পিতা আমার গমনে প্রথমে রুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি বহুতর রোদন করায় আমাকে তাঁহার সেবার্থ নিকটে থাকিতে অনুমতি করিলেন। মাহরু নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিমলা নাম রাখিলেন। আমি পিত্রালয়ে থাকিয়া পিতার সেবায় বিধিমতে মনোভিনিবেশ করিলাম; তাঁহার যাহাতে তুষ্টি জন্মে, তাহাতে যত্ন করিতে লাগিলাম। স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা পিতার স্নেহের আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ করিতাম, তাহা নহে; বস্তুতঃ পিতৃসেবায় আমার আন্তরিক আনন্দ জন্মিত; পিতা ব্যতীত আমার আর কেহ ছিল না। মনে করিতাম, পিতৃসেবা অপেক্ষা আর সুখ সংসারে নাই। পিতাও আমার ভক্তি দেখিয়াই হউক বা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ গুণবশতঃই হউক, আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। স্নেহ সমুদ্রমুখী নদীর

স্রায়ঃ যত প্রবাহিত হয়, তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন আমার সুখবাসর প্রভাত হইল, তখন জানিতে পারিয়াছিলাম যে, পিতা আমাকে কত ভালবাসিতেন।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমলার পত্র সমাপ্ত

“আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গড় মান্দারণের কোন দরিদ্রা রমণী আমার পিতার ঔরসে গর্ব্ভবতী হয়েন। আমার মাতার যেরূপ অদৃষ্টলিপির ফল, ইঁহারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। ইঁহার গর্ব্ভেও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং কন্যার মাতা অচিরাৎ বিধবা হইলে, তিনি আমার মাতার ন্যায়, নিজ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বিধাতার এমত নিয়ম নহে যে, যেমন আকর, তদুপযুক্ত সামগ্রীরই উৎপত্তি হইবে। পর্ব্বতের পাষাণেও কোমল কুসুমলতা জন্মে; অন্ধকার খনিমধ্যেও উজ্জ্বল রত্ন জন্মে। দরিদ্রের ঘরেও অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা জন্মিল। বিধবার কন্যা গড় মান্দারণ গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হইতে লাগিলেন। কালে সকলেরই লয়; কালে বিধবার কলঙ্কেরও লয় হইল। বিধবার সুন্দরী কন্যা যে জারজা, এ কথা অনেকে বিস্মৃত হইল। অনেকে জানিত না। দুর্গমধ্যে প্রায় এ কথা কেহই জানিত না। আর অধিক কি বলিব? সেই সুন্দরী তিলোত্তমার গর্ব্ভধারিণী হইলেন।

তিলোত্তমা যখন মাতৃগর্ব্ভে, তখন এই বিবাহ কারণেই আমার জীবনমধ্যে প্রধান ঘটনা ঘটিল। সেই সময়ে এক দিন পিতা তাঁহার জামাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আশ্রমে আসিলেন। আমার নিকট মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, স্বর্গীয় প্রভুর নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইলাম।

যে অবধি তাঁহাকে দেখিলাম, সেই অবধি আপন চিত্ত পরের হইল। কিন্তু কি বলিয়াই বা সে সব কথা আপনাকে বলি? বীরেন্দ্রসিংহ বিবাহ ভিন্ন আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না বুঝিলেন। পিতাও সকল বৃত্তান্ত অনুভবে জানিতে পারিলেন; এক দিন উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইলাম।

পিতা কহিলেন, ‘আমি বিমলাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। কিন্তু বিমলা যদি তোমার ধর্ম্মপত্নী হয়, তবে আমি তোমার নিকটে থাকিব। আর যদি তোমার সে অভিপ্রায় না থাকে—’

পিতার কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই স্বর্গীয় দেব কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ঠাকুর! শূদ্রী-কন্যাকে কি প্রকারে বিবাহ করিব?'

পিতা শ্লেষ করিয়া কহিলেন, 'জারজা কন্যাকে বিবাহ করিলে কি প্রকারে?'

প্রাণেশ্বর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, 'যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে, সে জারজা। জানিয়া শুনিয়া শূদ্রীকে কি প্রকারে বিবাহ করিব? আর আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা জারজা হইলেও শূদ্রী নহে।'

পিতা কহিলেন, 'তুমি বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, উত্তম। তোমার যাতায়াতে বিমলার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তোমার আর এ আশ্রমে আসিবার প্রয়োজন করে না। তোমার গৃহেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক।'

সে অবধিই তিনি কিয়দ্দিবস যাতায়াত ত্যাগ করিলেন। আমি চাতকীর ন্যায় প্রতিদিবস তাঁহার আগমন প্রত্যাশা করিতাম; কিন্তু কিছু কাল আশা নিষ্ফল হইতে লাগিল। বোধ করি, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এজন্য পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শন পাইয়া আর তত লজ্জাশীলা রহিলাম না। পিতা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। এক দিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আমি অনাশ্রম-ব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি; চিরদিন আমার কন্যার সহ বাস ঘটিবেক না। আমি স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতে যাইব, তুমি তখন-কোথায় থাকিবে?'

আমি পিতার বিরহাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। কহিলাম, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। না হয়, যেরূপ কাশীধামে একাকিনী ছিলাম, এখানেও সেইরূপ থাকিব।'

পিতা কহিলেন, 'না বিমলে! আমি তদপেক্ষা উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছি। আমার অনবস্থানকালে তোমার সুরক্ষক বিধান করিব। তুমি মহারাজ মানসিংহের নবোঢ়া মহিষীর সাহচর্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।'

আমি কাঁদিয়া কহিলাম, 'তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।' পিতা কহিলেন, 'না, আমি এক্ষণে কোথাও যাইব না। তুমি এখন মানসিংহের গৃহে যাও। আমি এখানেই রহিলাম; প্রত্যহই তোমাকে দেখিয়া আসিব। তুমি তথায় কিরূপ থাক, তাহা বুঝিয়া কর্ত্তব্য বিধান করিব।'

যুবরাজ! আমি তোমাদিগের গৃহে পুরাঙ্গনা হইলাম। কৌশলে পিতা আমাকে নিজ জামাতার চক্ষুঃপথ হইতে দূর করিলেন।

যুবরাজ! আমি তোমার পিতৃভবনে অনেক দিন পৌরস্ত্রী হইয়া ছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। তুমি তখন দশমবর্ষীয় বালক মাত্র, অম্বরের রাজবাটীতে মাতৃ-সন্নিধানে থাকিতে, আমি তোমার (নবোঢ়া) বিমাতার সাহচর্য্যে দিল্লীতে নিযুক্ত থাকিতাম। কুসুমের মালার তুল্য মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতসংখ্যা রমণীরাজি গ্রথিত থাকিত; তুমি কি তোমার বিমাতা সকলকেই চিনিতে? যোধপুরসম্ভূতা উর্ম্মিলা দেবীকে তোমার স্মরণ হইবে? উর্ম্মিলার গুণ তোমার নিকট কত পরিচয় দিব? তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না; আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন। তিনি আমারে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন। তাঁহারই অনুকম্পায় শিল্পকার্য্যাদি শিখিলাম। তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম। তিনি আমাকে স্বয়ং লেখা পড়া শিখাইলেন। এই যে কদক্ষরসম্বদ্ধ পত্রী তোমার নিকট পাঠাইতে সক্ষম হইতেছি, ইহা কেবল তোমার বিমাতা উর্ম্মিলা দেবীর অনুকম্পায়।

সখী উর্ম্মিলার কৃপায় আরও গুরুতর লাভ হইল। তিনি নিজ প্রীতিচক্ষে আমাকে যেমন দেখিতেন, মহারাজের নিকট সেইরূপ পরিচয় দিতেন। আমার সঙ্গীতাদিতে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; তদ্দর্শন শ্রবণেও মহারাজের প্রীতি জন্মিত। যে কারণেই হউক, মহারাজ মানসিংহ আমাকে নিজ পরিবারস্থার ন্যায় ভাবিতেন। তিনি আমার পিতাকে ভক্তি করিতেন; পিতা সর্ব্বদা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

উর্ম্মিলা দেবীর নিকট আমি সর্ব্বাংশে সুখী ছিলাম। কেবল এক মাত্র পরিতাপ যে, যাঁহার জন্য ধর্ম্ম ভিন্ন সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত ছিলাম, তাঁহার দর্শন পাইতাম না। তিনিই কি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন? তাহা নহে। যুবরাজ! আশ্‌মানি নাম্নী পরিচারিকাকে কি আপনার স্মরণ হয়? হইতেও পারে। আশ্‌মানির সহিত আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিল; আমি তাহাকে প্রভুর সংবাদ আনিতে পাঠাইলাম। সে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া আসিল। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে কত কথা কহিয়া পাঠাইলেন, তাহা কি বলিব? আমি আশ্‌মানির হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম, তিনিও তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার অদর্শনেও পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

এই প্রণালীতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। যখন তিন বৎসরের বিচ্ছেদেও পরস্পর বিস্মৃত হইলাম না, তখন উভয়েই বুঝিলাম যে, এ প্রণয় শৈবালপুষ্পের ন্যায় কেবল উপরে

ভাসমান নহে, পদ্মের ন্যায় ভিতরে বদ্ধমূল। কি কারণে বলিতে পারি না, এই সময়ে তাঁহারও ধৈর্য্যাবশেষ হইল। এক দিন তিনি বিপরীত ঘটাইলেন। নিশাকালে একাকিনী শয়নকক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্তিমিত দীপালোকে দেখিলাম, শিওরে এক জন মনুষ্য।

মধুর শব্দে আমার কর্ণরন্ধ্রে এই বাক্য প্রবেশ করিল যে, 'প্রাণেশ্বরী! ভয় পাইও না। আমি তোমারই একান্ত দাস।'

আমি কি উত্তর দিব? তিন বৎসরের পর সাক্ষাৎ। সকল কথা ভুলিয়া গেলাম—তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। শীঘ্র মরিব, তাই আর আমার লজ্জা নাই—সকল কথা বলিতে পারিতেছি।

যখন আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কেমন করিয়া এ পুরীর মধ্যে আসিলে?'

তিনি কহিলেন, 'আশ্‌মানিকে জিজ্ঞাসা কর; তাহার সমভিব্যাহারে বারিবাহক দাস সাজিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম; সেই পর্য্যন্ত লুক্কায়িত আছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন?'

তিনি কহিলেন, 'আর কি? তুমি যাহা কর।'

আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি করি? কোন্ দিক্ রাখি? চিত্ত যে দিকে লয়, সেই দিকে মতি হইতে লাগিল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ আমার শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। সম্মুখে দেখি, মহারাজ মানসিংহ!

বিস্তারে আবশ্যক কি? বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। মহারাজ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আমার হৃদয়মধ্যে কিরূপ হইতে লাগিল, তাহা বোধ করি বুঝিতে পারিবেন। আমি কান্দিয়া ঊর্ম্মিলা দেবীর পদতলে পড়িলাম, আত্মদোষ সকল ব্যক্ত করিলাম; সকল দোষ আপনার স্কন্ধে স্বীকার করিয়া লইলাম। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারও চরণে লুণ্ঠিত হইলাম। মহারাজ তাঁহাকে ভক্তি করেন; তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করেন; অবশ্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কহিলাম, 'আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করুন।' বোধ করি, পিতা মহারাজের সহিত একত্র যুক্তি করিয়াছিলেন। তিনি আমার রোদনে কর্ণপাতও করিলেন না। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'পাপীয়সি! তুই একেবারে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিস্!'

ঊর্ম্মিলা দেবী আমার প্রাণরক্ষার্থ মহারাজের নিকট বহুবিধ কহিলেন, মহারাজ কহিলেন, 'আমি তবে চোরকে মুক্ত করি, সে যদি বিমলাকে বিবাহ করে।'

আমি তখন মহারাজের অভিসন্ধি বুঝিয়া নিঃশব্দ হইলাম। প্রাণেশ্বর মহারাজের বাক্যে বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'আমি যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিব, সেও ভাল; প্রাণদণ্ড দিব, সেও ভাল; তথাপি শূদ্রী-কন্যাকে কখন বিবাহ করিব না। আপনি হিন্দু হইয়া কি প্রকারে এমন অনুরোধ করিতেছেন?'

মহারাজ কহিলেন, 'যখন আমার ভগিনীকে শাহজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ দিতে পারিয়াছি, তখন তোমাকে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব, বিচিত্র কি?'

তথাপি তিনি সম্মত হইলেন না। বরং কহিলেন, 'মহারাজ, যাহা হইবার, তাহা হইল। আমাকে মুক্তি দিউন, আমি বিমলার আর কখনও নাম করিব না।'

মহারাজ কহিলেন, 'তাহা হইলে তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল কই? তুমি বিমলাকে ত্যাগ করিবে, অন্য জনে তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিবে না।'

তথাপি আশু তাঁহার বিবাহে মতি লইল না। পরিশেষে যখন আর কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য হইল না, তখন অগত্যা অর্দ্ধসম্মত হইয়া কহিলেন, 'বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কখন পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি, নচেৎ নহে।'

আমি বিপুল পুলকসহকারে তাহাই স্বীকার করিলাম। আমি ধন গৌরব পরিচয়াদির জন্য কাতর ছিলাম না। পিতা এবং মহারাজ উভয়েই সম্মত হইলেন। আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্তৃভবনে আসিলাম।

অনিচ্ছায়, পরবল-পীড়ায় তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে কে স্ত্রীকে আদর করিতে পারে? বিবাহের পরে প্রভু আমাকে বিষ দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের প্রণয় তৎকালে একেবারে দূর হইল। মহারাজ মানসিংহকৃত অপমান সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আমাকে তিরস্কার করিতেন, সে তিরস্কারও আমার আদর বোধ হইত। এইরূপে কিছুকাল গেল; কিন্তু সে সকল পরিচয়েই বা প্রয়োজন কি? আমার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, অন্য কথা আবশ্যক নহে। কালে আমি পুনর্ব্বার স্বামিপ্রণয়-ভাগিনী হইয়াছিলাম, কিন্তু অম্বরপতির প্রতি তাঁহার পূর্ব্ববৎ বিষদৃষ্টি রহিল। কপালের লিখন! নচেৎ এ সব ঘটিবে কেন?

আমার পরিচয় দেওয়া শেষ হইল। কেবল আত্মপ্রতিশ্রুতি উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে। অনেকে মনে করে, আমি কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া গড় মান্দারণের অধিপতির নিকট ছিলাম। আমার লোকান্তর হইলে, নাম হইতে সে কালি আপনি মুছাইবেন, এই ভরসাতেই আপনাকে এত লিখিলাম।

এই পত্রে কেবল আত্মবিবরণই লিখিলাম। যাহার সংবাদ জন্য আপনি চঞ্চলচিত্ত, তাহার নামোল্লেখও করিলাম না। মনে করুন, সে নাম এ পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। তিলোত্তমা বলিয়া যে কেহ কখন ছিল, তাহা বিস্মৃত হউন।—"

ওস্‌মান লিপিপাঠ সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মা! আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।"

বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আর আমার পৃথিবীতে উপকার কি আছে? তুমি আমার কি উপকার করিবে? তবে এক উপকার—"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি তাহাই সাধন করিব।"

বিমলার চক্ষুঃ প্রোজ্জ্বল হইল, কহিলেন, "ওস্‌মান! কি কহিতেছ? এ দগ্ধ হৃদয়কে আর কেন প্রবঞ্চনা কর?"

ওস্‌মান হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরীয় মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, দুই এক দিন মধ্যে কিছু সাধন হইবে না। কতলু খাঁর জন্মদিন আগতপ্রায়, সে দিবস বড় উৎসব হইয়া থাকে। প্রহরিগণ আমোদে মত্ত থাকে। সেই দিবস আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি সেই দিবস নিশীথে অন্তঃপুরদ্বারে আসিও; যদি তথায় কেহ তোমাকে এইরূপ দ্বিতীয় অঙ্গুরীয় দৃষ্ট করায়, তবে তুমি তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিও; [illegible]া করি, নিষ্কণ্টকে আসিতে পারিবে। তবে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

বিমলা কহিলেন, "জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমি অধিক কি বলিব।"

বিমলা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বিমলা ওস্‌মানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইবেন, এমন সময় ওস্‌মান কহিলেন, "এক কথা সাবধান করিয়া দিই। একাকিনী আসিবেন। আপনার সঙ্গে কেহ সঙ্গিনী থাকিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, বরং প্রমাদ ঘটিবে।"

বিমলা বুঝিতে পারিলেন যে, ওস্‌মান তিলোত্তমাকে সঙ্গে আনিতে নিষেধ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল, [illegible] না যাইতে পারি, তিলোত্তমা একাই আসিবে।"

বিমলা বিদায় হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরোগ্য

দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে, রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা, সে অবস্থায় থাক, দিন যাবে, রবে না। পথিক! বড় দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? উচ্চ রবে শিরোপরি ঘনগর্জ্জন হইতেছে? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ? অনাবৃত শরীরে করকাভিঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে—রবে না। ক্ষণেক অপেক্ষা কর; দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে; ভানূদয় হইবে; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কাহার না দিন যায়? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন রোদন কর?

কার দিন গেল না? তিলোত্তমা ধূলায় পড়িয়া আছে, তবু দিন যাইতেছে।

বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা-কালফণী বসতি করিয়া সর্ব্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত তাহার দংশন অসহ্য; এক দিনে কত মুহূর্ত্ত! তথাপি দিন কি গেল না?

কতলু খাঁ মসনদে; শত্রুজয়ী; সুখে দিন যাইতেছে। দিন যাইতেছে, রহে না।

জগৎসিংহ রুগ্নশয্যায়; রোগীর দিন কত দীর্ঘ, কে না জানে? তথাপি দিন গেল।

দিন গেল। দিনে দিনে জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল। একেবারে যমদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রাজপুত্র দিনে দিনে নিরাপদ্ হইতে লাগিলেন। প্রথমে শরীরের গ্লানি দূর; পরে আহার; পরে বল; শেষে চিন্তা।

প্রথম চিন্তা—তিলোত্তমা কোথায়? রাজপুত্র যত আরোগ্য পাইতে লাগিলেন, তত সংবর্দ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কেহ তুষ্টিজনক উত্তর দিল না। আয়েষা জানেন না; ওস্‌মান বলেন না; দাস দাসী জানে না, কি ইঙ্গিত মতে বলে না। রাজপুত্র কণ্টকশয্যাশায়ীর ন্যায় চঞ্চল হইলেন।

দ্বিতীয় চিন্তা—নিজ ভবিষ্যৎ। "কি হইবে" অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে? রাজপুত্র দেখিলেন, তিনি বন্দী। করুণহৃদয় ওস্‌মান ও আয়েষার অনুকম্পায় তিনি কারাগারের বিনিময়ে সুসজ্জিত, সুবাসিত শয়নকক্ষে বসতি করিতেছেন; দাস দাসী

তাঁহার সেবা করিতেছে ; যখন যাহা প্রয়োজন, তাহা ইচ্ছা-ব্যক্তির পূর্ব্বেই পাইতেছেন ; আয়েষা সহোদরাধিক স্নেহের সহিত তাঁহার যত্ন করিতেছেন ; তথাপি দ্বারে প্রহরী ; স্বর্ণ-পিঞ্জরবাসী সুরস পানীয়ে পরিতৃপ্ত বিহঙ্গমের ন্যায় রুদ্ধ আছেন। কবে মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ? মুক্তিপ্রাপ্তির কি সম্ভাবনা ? তাঁহার সেনা সকল কোথায় ? সেনাপতিশূন্য হইয়া তাহাদের কি দশা হইল ?

তৃতীয় চিন্তা—আয়েষা। এ চমৎকারকারিণী, পরহিত মূর্ত্তিমতী, কেমন করিয়া এই মৃণ্ময় পৃথিবীতে অবতরণ করিল ?

জগৎসিংহ দেখিলেন, আয়েষার বিরাম নাই, শ্রান্তি বোধ নাই, অবহেলা নাই। রাত্রিদিন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। যত দিন না রাজপুত্র নীরোগ হইলেন, তত দিন তিনি প্রত্যহ প্রভাতে দেখিতেন, প্রভাতসূর্য্যরূপিণী কুসুম-দাম হস্তে করিয়া লাবণ্যময় পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে আগমন করিতেছেন। প্রতিদিন দেখিতেন, যতক্ষণ স্নানাদি কার্য্যের সময় অতীত না হইয়া যায়, ততক্ষণ আয়েষা সে কক্ষ ত্যাগ করিতেন না। প্রতিদিন দেখিতেন, ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগমন করিয়া কেবল নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ গাত্রোত্থান করিতেন ; যতক্ষণ না তাঁহার জননী বেগম তাঁহার নিকট কিঙ্করী পাঠাইতেন, ততক্ষণ তাঁহার সেবায় ক্ষান্ত হইতেন না।

কে রুগ্ন-শয্যায় না শয়ন করিয়াছেন ? যদি কাহারও রুগ্নশয্যার শিওরে বসিয়া মনোমোহিনী রমণী ব্যজন করিয়া থাকে, তবে সেই জানে রোগেও সুখ।

পাঠক ! তুমি জগৎসিংহের অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত করিতে চাহ ? তবে মনে মনে সেই শয্যায় শয়ন কর, শরীরে ব্যাধিযন্ত্রণা অনুভূত কর ; স্মরণ কর যে, শত্রুমধ্যে বন্দী হইয়া আছ ; তার পর সেই সুবাসিত, সুসজ্জিত, সুস্নিগ্ধ শয়নকক্ষ মনে কর। শয্যায় শয়ন করিয়া তুমি দ্বারপানে চাহিয়া আছ ; অকস্মাৎ তোমার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; এই শত্রু-পুরীমধ্যে যে তোমাকে সহোদরের ন্যায় যত্ন করে, সেই আসিতেছে। সে আবার রমণী, যুবতী, পূর্ণবিকসিত পদ্ম ! অমনই শয়ন করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ ; দেখ কি মূর্ত্তি ! ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র দীর্ঘ আয়তন, তদুপযুক্ত গঠন, মহামহিম দেবী-প্রতিমা স্বরূপ। প্রকৃতি-নিয়মিত রাজ্ঞী স্বরূপ ! দেখ কি ললিত পাদবিক্ষেপ ! গজেন্দ্রগমন শুনিয়াছ ? সে কি ? মরালগমন বল ? ঐ পাদবিক্ষেপ দেখ ; সুরের লয়, বাদ্যে হয় ; ঐ পাদবিক্ষেপের লয়, তোমার হৃদয় মধ্যে হইতেছে। হস্তে ঐ কুসুমদাম দেখ, হস্তপ্রভায় কুসুম মলিন হইয়াছে দেখিয়াছ ? কণ্ঠের প্রভায় স্বর্ণহার দীপ্তিহীন হইয়াছে দেখিয়াছ ? তোমার চক্ষুর পলক

পড়ে না কেন? দেখিয়াছ কি সুন্দর গ্রাবাভঙ্গী? দেখিয়াছ প্রস্তরধবল গ্রীবার উপর কেমন নিবিড় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে? দেখিয়াছ তৎপার্শ্বে কেমন কর্ণভূষা দুলিতেছে? মস্তকের ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়াছ? ও কেবল ঈষৎ দৈর্ঘ্যহেতু। অত একদৃষ্টিতে চাহিতেছ কেন? আয়েষা কি মনে করিবে?

যত দিন জগৎসিংহের রোগের শুশ্রূষা আবশ্যকতা হইল, তত দিন পর্য্যন্ত আয়েষা প্রত্যহ ঐইরূপ অনবরত তাহাতে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে যেমন রাজপুত্রের রোগের উপশম হইতে লাগিল, তেমনই আয়েষারও যাতায়াত কমিতে লাগিল; যখন রাজপুত্রের রোগ নিঃশেষ হইল, তখন আয়েষার জগৎসিংহের নিকট যাতায়াত প্রায় একেবারে শেষ হইল; কদাচিৎ দুই একবার আসিতেন। যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়, আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্য কালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন।

এক দিন গৃহমধ্যে অপরাহ্নে জগৎসিংহ গবাক্ষে দাঁড়াইয়া দুর্গের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; কত লোক অবাধে নিজ নিজ ঈপ্সিত বা প্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াত করিতেছে, রাজপুত্র দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অবস্থার সহিত আত্মাবস্থা তুলনা করিতে-ছিলেন। এক স্থানে কয়েক জন লোক মণ্ডলীকৃত হইয়া কোন ব্যক্তি বা বস্তু বেষ্টন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিল। রাজপুত্রের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইল। বুঝিতে পারিলেন যে, লোকগুলি কোন আমোদে নিযুক্ত আছে, মন দিয়া কিছু শুনিতেছে। মধ্যস্থ ব্যক্তি কে, বা বস্তুটি কি, তাহা কুমার দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিছু কৌতূহল জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েক জন শ্রোতা চলিয়া গেলে কুমারের কৌতূহল নিবারণ হইল; দেখিতে পাইলেন, মণ্ডলীমধ্যে এক ব্যক্তি একখানা পুতির ন্যায় কয়েকখণ্ড পত্র লইয়া তাহা হইতে কি পড়িয়া শুনাইতেছে। আবৃত্তিকর্ত্তার আকার দেখিয়া রাজকুমারের কিছু কৌতুক জন্মিল। তাঁহাকে মনুষ্য বলিলেও বলা যায়, বজ্রাঘাতে পত্রভ্রষ্ট মধ্যমাকার তালগাছ বলিলেও বলা যায়। প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ, প্রস্থেও তদ্রূপ; তবে তালগাছে কখন তাদৃশ গুরু নাসিকাভার ন্যস্ত হয় না। আকারেঙ্গিতে উভয়ই সমান; পুতি পড়িতে পড়িতে পাঠক যে হাত নাড়া, মাথা নাড়া দিতেছিলেন, রাজকুমার তাহা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ওস্‌মান গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরস্পর অভিবাদনের পর ওস্‌মান কহিলেন, "আপনি গবাক্ষে অন্যমনস্ক হইয়া কি দেখিতেছিলেন?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "সরল কাষ্ঠবিশেষ। দেখিলে দেখিতে পাইবেন।"

ওস্‌মান দেখিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, উহাকে কখন দেখেন নাই?"

রাজপুত্র কহিলেন, "না।"

ওস্‌মান কহিলেন, "ও আপনাদিগের ব্রাহ্মণ। কথাবার্ত্তায় বড় সরস; ও ব্যক্তিকে গড় মান্দারণে দেখিয়াছিলাম।"

রাজকুমার অন্তঃকরণে চিন্তিত হইলেন। গড় মান্দারণে ছিল? তবে এ ব্যক্তি কি তিলোত্তমার কোন সংবাদ বলিতে পারিবে না?

এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, উহার নাম কি?"

ওস্‌মান চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উহার নামটি কিছু কঠিন, হঠাৎ স্মরণ হয় না, গনপত? না;—গনপত—গজপত—না; গজপত কি?"

"গজপত? গজপত এদেশীয় নাম নহে, অথচ দেখিতেছি, ও ব্যক্তি বাঙ্গালী।"

"বাঙ্গালী বটে, ভট্টাচার্য্য। উহার একটা উপাধি আছে, এলেম্—এলেম্ কি?"

"মহাশয়! বাঙ্গালীর উপাধিতে 'এলেম্' শব্দ ব্যবহার হয় না। এলেম্‌কে বাঙ্গালায় বিদ্যা কহে। বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হইবে।"

"হাঁ হাঁ বিদ্যা কি একটা,--রসুন, বাঙ্গালায় হস্তীকে কি বলে বলুন দেখি?"

"হস্তী।"

"আর?"

"করী, দন্তী, বারণ, নাগ, গজ—"

"হাঁ হাঁ, স্মরণ হইয়াছে; উহার নাম 'গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ'।"

"বিদ্যাদিগ্‌গজ! চমৎকার উপাধি! যেমন নাম, তেমনই উপাধি। উহার সহিত আলাপ করিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।"

ওস্‌মান খাঁ একটু একটু গজপতির কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন; বিবেচনা করিলেন, ইহার সহিত কথোপকথনে ক্ষতি হইতে পারে না। কহিলেন, "ক্ষতি কি?"

উভয়ে নিকটস্থ বাহিরের ঘরে গিয়া ভৃত্যদ্বারা গজপতিকে আহ্বান করিয়া আনিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজ সংবাদ

ভৃত্যসঙ্গে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ ?"

দিগ্‌গজ হস্তভঙ্গী সহিত কহিলেন,

"যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে,
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং।"

জগৎসিংহ হাস্য সংবরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। গজপতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "খোদা খাঁ বাবুজীকে ভাল রাখুন।"

রাজপুত্র কহিলেন, "মহাশয়, আমি মুসলমান নহি, আমি হিন্দু।"

দিগ্‌গজ মনে করিলেন, "বেটা যবন, আমাকে ফাঁকি দিতেছে ; কি একটা মতলব আছে ; নহিলে আমাকে ডাকিবে কেন ?" ভয়ে বিষন্নবদনে কহিলেন, "খাঁ বাবুজী, আমি আপনাকে চিনি ; আপনার অন্নে প্রতিপালন, আমায় কিছু বলিবেন না, আপনার শ্রীচরণের দাস আমি।"

জগৎসিংহ দেখিলেন, ইহাও এক বিঘ্ন। কহিলেন, "মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ ; আমি রাজপুত, আপনি এরূপ কহিবেন না ; আপনার নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ?"

দিগ্‌গজ ভাবিলেন, "ঐ গো ! নাম জানে ! কি বিপদে ফেলিবে ?" করযোড়ে কহিলেন, "দোহাই সেখজীর। আমি গরিব ! আপনার পায়ে পড়ি।"

জগৎসিংহ দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যেরূপ ভীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ উহার নিকট কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। অতএব বিষয়ান্তরে কথা কহিবার জন্য কহিলেন, "আপনার হাতে ও কি পুতি ?"

"আজ্ঞা এ মাণিকপীরের পুতি !"

"ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুতি !"

"আজ্ঞা,—আজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, এখন ত আর ব্রাহ্মণ নই।"

রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বিরক্তও হইলেন। কহিলেন, "সে কি? আপনি গড় মান্দারণে থাকিতেন না?"

দিগ্‌গজ ভাবিলেন, "এই সর্ব্বনাশ করিল! আমি বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে থাকিতাম, টের পেয়েছে! বীরেন্দ্রসিংহের যে দশা করিয়াছে, আমারও তাই করিবে।" ব্রাহ্মণ ত্রাসে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমার কহিলেন, "ও কি ও!"

দিগ্‌গজ হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন, "দোহাই খাঁ বাবা! আমায় মের না বাবা! আমি তোমার গোলাম বাবা! তোমার গোলাম বাবা!"

"তুমি কি বাতুল হইয়াছ?"

"না বাবা! আমি তোমারই দাস বাবা! আমি তোমারই বাবা!"

জগৎসিংহ অগত্যা ব্রাহ্মণকে সুস্থির করিবার জন্য কহিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি একটু মাণিকপীরের পুতি পড়, আমি শুনি।"

ব্রাহ্মণ মাণিকপীরের পুতি লইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। যেরূপ যাত্রার বালক অধিকারীর কাণমলা খাইয়া গীত গায়, দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সেই দশা হইল।

ক্ষণেক পরে রাজকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া মাণিক-পীরের পুতি পড়িতেছিলেন কেন?"

ব্রাহ্মণ সুর থামাইয়া কহিল, "আমি মোছলমান হইয়াছি।"

রাজপুত্র কহিলেন, "সে কি?" গজপতি কহিলেন, "যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারিব। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগির পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।"

"পালো কি?"

দিগ্‌গজ কহিলেন, "আতপ চাউল ঘৃতের পাক।"

রাজপুত্র বুঝিলেন পদার্থ টা কি। কহিলেন, "বলিয়া যাও!"

"তার পর আমাকে বলিলেন, 'তুই মোছলমান হইয়াছিস্'; সেই অবধি আমি মোছলমান।"

রাজপুত্র এই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর সকলের কি হইয়াছে?"

"আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে।"

রাজপুত্র ওস্‌মানের মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। ওস্‌মান রাজপুত্রকৃত নির্ব্বাক্ তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, ইহাতে দোষ কি? মোছলমানের বিবেচনায়

মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম ; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্মপ্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।"

রাজপুত্র উত্তর না করিয়া বিদ্যাদিগ্‌গজকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয় !"

"আজ্ঞা এখন সেখ দিগ্‌গজ।"

"আচ্ছা তাই ; সেখজী, গড়ের আর কাহারও সংবাদ আপনি জানেন না ?"

ওস্‌মান রাজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। দিগ্‌গজ কহিলেন, "আর অভিরাম স্বামী পলায়ন করিয়াছেন।"

রাজপুত্র বুঝিলেন, নির্ব্বোধকে স্পষ্ট স্পষ্ট জিজ্ঞাসা না করিলে কিছুই শুনিতে পাইবেন না। কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "নবাব কতলু খাঁ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন !"

রাজপুত্রের মুখ রক্তিমবর্ণ হইল। ওস্‌মানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ? এ ব্রাহ্মণ অলীক কথা কহিতেছে ?"

ওস্‌মান গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "নবাব বিচার করিয়া রাজবিদ্রোহী জ্ঞানে প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।"

রাজপুত্রের চক্ষুতে অগ্নি প্রোজ্জ্বল হইল।

ওস্‌মানকে জিজ্ঞাসিলেন, "আর একটা নিবেদন করিতে পারি কি ? কার্য্য কি আপনার অভিমতে হইয়াছে ?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে।"

রাজকুমার বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ওস্‌মান সুসময় পাইয়া দিগ্‌গজকে কহিলেন, "তুমি এখন বিদায় হইতে পার।"

দিগ্‌গজ গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যায়, কুমার তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "আর এক কথা জিজ্ঞাসা ; বিমলা কোথায় ?"

ব্রাহ্মণ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, একটু রোদনও করিল। কহিল, "বিমলা এখন নবাবের উপপত্নী।"

রাজকুমার বিদ্যুদ্দৃষ্টিতে ওস্‌মানের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এও সত্য ?"

ওস্‌মান কোন উত্তর না করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "তুমি আর কি করিতেছ ? চলিয়া যাও।"

রাজপুত্র ব্রাহ্মণের হস্ত দৃঢ়তর ধারণ করিলেন, যাইবার শক্তি নাই। কহিলেন, "আর এক মুহূর্ত্ত রহ; আর একটা কথা মাত্র।" তাঁহার আরক্ত লোচন হইতে দ্বিগুণতর অগ্নি বিস্ফুরণ হইতেছিল, "আর একটা কথা। তিলোত্তমা ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হইয়াছে। দাস দাসী লইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আছে।"

রাজকুমার বেগে ব্রাহ্মণের হস্ত নিক্ষেপ করিলেন, ব্রাহ্মণ পড়িতে পড়িতে রহিল।

ওস্‌মান লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, "আমি সেনাপতি মাত্র।"

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "আপনি পিশাচের সেনাপতি।"

দশম পরিচ্ছেদ

প্রতিমা বিসর্জ্জন

বলা বাহুল্য যে, জগৎসিংহের সে রাত্রে নিদ্রা আসিল না। শয্যা অগ্নিবিকীর্ণবৎ, হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে। যে তিলোত্তমা মরিলে জগৎসিংহ পৃথিবী শূন্য দেখিতেন, এখন সে তিলোত্তমা প্রাণত্যাগ করিল না কেন, ইহাই পরিতাপের বিষয় হইল।

সে কি ? তিলোত্তমা মরিল না কেন ? কুসুমকুমার দেহ, মাধুর্য্যময় কোমলালোকে বেষ্টিত যে দেহ, যে দিকে জগৎসিংহ নয়ন ফিরান, সেই দিকে মানসিক দর্শনে দেখিতে পান, সে দেহ শ্মশানমৃত্তিকা হইবে ? এই পৃথিবী—অসীম পৃথিবীতে কোথাও সে দেহের চিহ্ন থাকিবে না ? যখন এইরূপ চিন্তা করেন, জগৎসিংহের চক্ষুতে দর দর বারিধারা পড়িতে থাকে; অমনই আবার দুরাত্মা কতলু খাঁর বিহারমন্দিরের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে বিদ্যুদ্বৎ চমকিত হয়, সেই কুসুমসুকুমার বপু পাপিষ্ঠ পাঠানের অঙ্কন্যস্ত দেখিতে পান, আবার দারুণাগ্নিতে হৃদয় জ্বলিতে থাকে।

তিলোত্তমা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি।

সেই তিলোত্তমা পাঠানভবনে।

সেই তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্নী।

আর কি সে মূর্ত্তি রাজপুতে আরাধনা করে ?

সে প্রতিমা স্বহস্তে স্থানচ্যুত করিতে সঙ্কোচ না করা কি রাজপুতের কুলোচিত ?

সে প্রতিমা জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাকে উন্মূলিত করিতে মূলাধার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইবে। কেমন করিয়া চিরকালের জন্য সে মোহিনী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবেন? সে কি হয়? যত দিন মেধা থাকিবে, যত দিন অস্থি-মজ্জা-শোণিত-নির্ম্মিত দেহ থাকিবে, তত দিন সে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবে!

এই সকল উৎকট চিন্তায় রাজপুত্রের মনের স্থিরতা দূরে থাকুক, বুদ্ধিরও অপভ্রংশ হইতে লাগিল, স্মৃতির বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল; নিশাশেষে দুই করে মস্তক ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, কিছুই আলোচনা করিবার আর শক্তি নাই।

এক ভাবে বহুক্ষণ বসিয়া জগৎসিংহের অঙ্গবেদনা করিতে লাগিল; মানসিক যন্ত্রণার প্রগাঢ়তায় শরীরে জ্বরের ন্যায় সন্তাপ জন্মিল, জগৎসিংহ বাতায়নসন্নিধানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

শীতল নৈদাঘ বায়ু আসিয়া জগৎসিংহের ললাট স্পর্শ করিল। নিশা অন্ধকার; আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত; নক্ষত্রাবলী দেখা যাইতেছে না, কদাচিৎ সচল মেঘ-খণ্ডের আবরণাভ্যন্তরে কোন ক্ষীণ তারা দেখা যাইতেছে; দূরস্থ বৃক্ষশ্রেণী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খদ্যোতমালা হীরকচূর্ণবৎ জ্বলিতেছে; সম্মুখস্থ এক তড়াগে আকাশ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব অন্ধকারে অস্পষ্টরূপ স্থিত রহিয়াছে।

মেঘস্পৃষ্ট শীতল নৈশ বায়ুসংলগ্নে জগৎসিংহের কিঞ্চিৎ দৈহিক সন্তাপ দূর হইল। তিনি বাতায়নে হস্তরক্ষাপূর্ব্বক তদুপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। উন্নিদ্রায় বহুক্ষণাবধি উৎকট মানসিক যন্ত্রণা সহনে অবসন্ন হইয়াছিলেন; এক্ষণে স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে কিঞ্চিৎ চিন্তাবিরত হইলেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেন। এতক্ষণ যে ছুরিকা সঞ্চালনে হৃদয় বিদ্ধ হইতেছিল, এক্ষণে তাহা দূর হইয়া অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্নতাশূন্য নৈরাশ্য মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আশা ত্যাগ করাই অধিক ক্লেশ; একবার মনোমধ্যে নৈরাশ্য স্থিরতর হইলে আর তত ক্লেশকর হয় না। অস্ত্রাঘাতই সমধিক ক্লেশকর; তাহার পর যে ক্ষত হয়, তাহার যন্ত্রণা স্থায়ী বটে, কিন্তু তত উৎকট নহে। জগৎসিংহ নিরাশার মৃদুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নক্ষত্রহীন গগন প্রতি চাহিয়া, এক্ষণে নিজ হৃদয়াকাশও যে তদ্রূপ অন্ধকার নক্ষত্রহীন হইল, সজল চক্ষুতে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভূতপূর্ব্ব সকল মৃদুভাবে স্মরণ পথে আসিতে লাগিল; বাল্যকাল, কৈশোরপ্রমোদ, সকল মনে পড়িতে লাগিল; জগৎসিংহের চিত্ত তাহাতে মগ্ন হইল; ক্রমে অধিক অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন, ক্রমে অধিক শরীর শীতল হইতে লাগিল; ক্লান্তিবশে চেতনাপহরণ হইতে

লাগিল; বাতায়ন অবলম্বন করিয়া জগৎসিংহের তন্দ্রা আসিল। নিদ্রিতাবস্থায় রাজকুমার স্বপ্ন দেখিলেন; গুরুতর যন্ত্রণাজনক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন; নিদ্রিত বদনে ভ্রূকুটি হইতে লাগিল; মুখে উৎকট ক্লেশব্যঞ্জক ভঙ্গী হইতে লাগিল; অধর কম্পিত, বিচলিত হইতে লাগিল; ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল; করে দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ হইল।

চমকের সহিত নিদ্রাভঙ্গ হইল; অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কতক্ষণ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন; যখন প্রাতঃসূর্য্যকরে হর্ম্ম্য-প্রাকার দীপ্ত হইতেছিল, তখন জগৎসিংহ হর্ম্ম্যতলে বিনা শয্যায়, বিনা উপাধানে লম্বমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন।

ওস্‌মান আসিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। রাজপুত্র নিদ্রোত্থিত হইলে, ওস্‌মান তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। রাজপুত্র পত্র হস্তে লইয়া নিরুত্তরে ওস্‌মানের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ওস্‌মান বুঝিলেন, রাজপুত্র আত্ম-বিহ্বল হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রয়োজনীয় কথোপকথন হইতে পারিবে না, বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আপনার ভূশয্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আমার কৌতূহল নাই। এই পত্র-প্রেরিকার নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এই পত্র আপনাকে দিব; যে কারণে এত দিন এই পত্র আপনাকে দিই নাই, সে কারণ দূর হইয়াছে। আপনি সকল জ্ঞাত হইয়াছেন। অতএব পত্র আপনার নিকট রাখিয়া চলিলাম, আপনি অবসরমতে পাঠ করিবেন; অপরাহ্ণে আমি পুনর্ব্বার আসিব। প্রত্যুত্তর দিতে চাহেন, তাহাও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারিব।"

এই বলিয়া ওস্‌মান রাজপুত্রের নিকট পত্র রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র একাকী বসিয়া সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, বিমলার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। যতক্ষণ পত্রখানি জ্বলিতে লাগিল, ততক্ষণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যখন পত্র নিঃশেষ দগ্ধ হইয়া গেল, তখন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "স্মৃতিচিহ্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিলাম, স্মৃতিও ত সন্তাপে পুড়িতেছে, নিঃশেষ হয় না কেন?"

জগৎসিংহ রীতিমত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পূজাহ্নিক শেষ করিয়া ভক্তি-ভাবে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন; পরে করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! দাসকে ত্যাগ করিবেন না। আমি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিব; ক্ষত্রকুলোচিত কার্য্য করিব; ও পাদপদ্মের প্রসাদ ভিক্ষা করি। বিধর্ম্মীর উপপত্নী এ চিত্ত হইতে দূর

করিব; তাহাতে শরীর পতন হয়, অন্তকালে তোমাকে পাইব। মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিতেছি, মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। দেখ গুরুদেব! তুমি অন্তর্যামী, অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া দেখ, আর আমি তিলোত্তমার প্রণয়প্রার্থী নহি, আর আমি তাহার দর্শনাভিলাষী নহি; কেবল কাল ভূতপূর্ব্বস্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, স্মৃতিলোপ কি হইবে না? গুরুদেব! ও পদপ্রসাদ ভিক্ষা করি। নচেৎ স্মরণের যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল।

তিলোত্তমা তখন ধূলিশয্যায় কি স্বপ্ন দেখিতেছিল? এ ঘোর অন্ধকারে, যে এক নক্ষত্র প্রতি সে চাহিয়াছিল, সেও তাহাকে আর করবিতরণ করিবে না। এ ঘোর ঝটিকায় যে লতায় প্রাণ বাঁধিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িল; যে ভেলায় বুক দিয়া সমুদ্র পার হইতেছিল, সে ভেলা ডুবিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহান্তর

অপরাহ্ণে কথামত ওস্‌মান রাজপুত্র সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ প্রত্যুত্তর পাঠাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে কি?"

যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পত্র হস্তে লইয়া ওস্‌মানকে দিলেন। ওস্‌মান লিপি হস্তে লইয়া কহিলেন, "আপনি অপরাধ লইবেন না; আমাদের পদ্ধতি আছে, দুর্গবাসী কেহ কাহাকে পত্র প্রেরণ করিলে, দুর্গ-রক্ষকেরা পত্র পাঠ না করিয়া পাঠান না।"

যুবরাজ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "এ ত বলা বাহুল্য। আপনি পত্র খুলিয়া পড়ুন; অভিপ্রায় হয়, পাঠাইয়া দিবেন।"

ওস্‌মান পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই মাত্র লেখা ছিল—

"মন্দভাগিনি! আমি তোমার অনুরোধ বিস্মৃত হইব না। কিন্তু তুমি যদি পতিব্রতা হও, তবে শীঘ্র পতিপথাবলম্বন করিয়া আত্মকলঙ্ক লোপ করিবে।

জগৎসিংহ।"

ওস্‌মান পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আপনার হৃদয় অতি কঠিন।"

রাজপুত্র নীরস হইয়া কহিলেন, "পাঠান অপেক্ষা নহে।"

ওস্‌মানের মুখ একটু আরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ কর্কশ ভঙ্গিতে কহিলেন, "বোধ করি, পাঠান সর্ব্বাংশে আপনার সহিত অভদ্রতা না করিয়া থাকিবে।"

রাজপুত্র কুপিতও হইলেন, লজ্জিতও হইলেন। এবং কহিলেন, "না মহাশয়! আমি নিজের কথা কহিতেছি না। আপনি আমার প্রতি সর্ব্বাংশে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং বন্দী করিয়াও প্রাণদান দিয়াছেন; সেনা-হস্তা শত্রুর সাংঘাতিক পীড়ার শমতা করাইয়াছেন;—যে ব্যক্তি কারাবাসে শৃঙ্খলবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে প্রমোদাগারে বাস করাইতেছেন। আর অধিক কি করিবেন? কিন্তু আমি বলি কি,—আপনাদের ভদ্রতা-জালে জড়িত হইতেছি; এ সুখের পরিণাম কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বন্দী হই, আমাকে কারাগারে স্থান দিন, এ দয়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। আর যদি বন্দী না হই, তবে আমাকে এ হেমপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখায় প্রয়োজন কি?"

ওস্‌মান স্থির চিত্তে উত্তর করিলেন, "রাজপুত্র! অশুভের জন্য ব্যস্ত কেন? অমঙ্গলকে ডাকিতে হয় না, আপনিই আইসে।"

রাজপুত্র গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "আপনার এ কুসুমশয্যা ছাড়িয়া কারাগারের শিলাশয্যায় শয়ন করা রাজপুতেরা অমঙ্গল বলিয়া গণে না।"

ওস্‌মান কহিলেন, "শিলাশয্যা যদি অমঙ্গলের চরম হইত, তবে ক্ষতি কি?"

রাজপুত্র ওস্‌মান প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "যদি কতলু খাঁকে সমুচিত দণ্ড দিতে না পারিলাম, তবে মরণেই বা ক্ষতি কি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "যুবরাজ! সাবধান! পাঠানের যে কথা সেই কাজ!"

রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি, আপনি যদি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন, তবে যত্ন বিফল জ্ঞান করুন।"

ওস্‌মান কহিলেন, "রাজপুত্র, আমরা পরস্পর সন্নিধানে এরূপ পরিচিত আছি যে, মিথ্যা বাগাড়ম্বর কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমি আপনার নিকট বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আসিয়াছি।"

জগৎসিংহ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "অনুমতি করুন।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি এক্ষণে যে প্রস্তাব করিব, তাহা কতলু খাঁর আদেশমত কহিতেছি জানিবেন।"

জ। উত্তম।

ও। শ্রবণ করুন। রাজপুত পাঠানের যুদ্ধে উভয় কুল ক্ষয় হইতেছে।

রাজপুত্র কহিলেন, "পাঠানকুল ক্ষয় করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য।"

ওস্‌মান কহিলেন, "সত্য বটে, কিন্তু উভয় কুল নিপাত ব্যতীত একের উচ্ছেদ কত দূর সম্ভাবনা, তাহাও দেখিতে পাইতেছেন। গড় মান্দারণ-জেতৃগণ নিতান্ত বলহীন নহে দেখিয়াছেন।"

জগৎসিংহ ঈষন্মাত্র সহাস্য হইয়া কহিলেন, "তাঁহারা কৌশলময় বটেন।"

ওস্‌মান কহিতে লাগিলেন, "যাহাই হউক, আত্মগরিমা আমার উদ্দেশ্য নহে। মোগল সম্রাটের সহিত চিরদিন বিবাদ করিয়া পাঠানের উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না। কিন্তু মোগল সম্রাট্‌ও পাঠানদিগকে কদাচ নিজকরতলস্থ করিতে পারিবেন না। আমার কথা আত্মশ্লাঘা বিবেচনা করিবেন না। আপনি ত রাজনীতিজ্ঞ বটেন, ভাবিয়া দেখুন, দিল্লী হইতে উৎকল কত দূর। দিল্লীশ্বর যেন মানসিংহের বাহুবলে এবার পাঠান জয় করিলেন; কিন্তু কত দিন তাঁহার জয়-পতাকা এ দেশে উড়িবে? মহারাজ মানসিংহ সসৈন্য পশ্চাৎ হইবেন, আর উৎকলে দিল্লীশ্বরের অধিকার লোপ হইবে। ইতিপূর্ব্বেও ত আক্‌বর শাহা উৎকল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কত দিন তথাকার করগ্রাহী ছিলেন? এবারও জয় করিলে, এবারও তাহা ঘটিবে। না হয় আবার সৈন্য প্রেরণ করিবেন; আবার উৎকল জয় করুন, আবার পাঠান স্বাধীন হইবে। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই; এক জন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম। তবে আর রাজপুত পাঠানের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া কাজ কি?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আপনি কিরূপ করিতে বলেন?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি কিছুই বলিতেছি না। আমার প্রভু সন্ধি করিতে বলেন।"

জ। কিরূপ সন্ধি?

ও। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ লাঘব স্বীকার করুন। নবাব কতলু খাঁ বাহুবলে বঙ্গদেশের যে অংশ জয় করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। আক্‌বর শাহাও উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সৈন্য লইয়া যাউন, আর ভবিষ্যতে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত থাকুন। ইহাতে বাদশাহের কোন ক্ষতি নাই; বরং পাঠানের ক্ষতি। আমরা যাহা

ক্লেশে হস্তগত করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিতেছি ; আক্‌বর শাহা যাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই, তাহাই ত্যাগ করিতেছেন।

রাজকুমার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "উত্তম কথা ; কিন্তু এ সকল প্রস্তাব আমার নিকট কেন ? সন্ধিবিগ্রহের কর্ত্তা মহারাজ মানসিংহ ; তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করুন।"

ওস্‌মান কহিলেন, "মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল ; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট কে রটনা করিয়াছে যে, পাঠানেরা মহাশয়ের প্রাণহানি করিয়াছে। মহারাজ সেই শোকে ও ক্রোধে সন্ধির নামও শ্রবণ করিলেন না ; দূতের কথায় বিশ্বাস করিলেন না ; যদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাবকর্ত্তা হয়েন, তবে তিনি সম্মত হইতে পারিবেন।"

রাজপুত্র ওস্‌মানের প্রতি পুনর্ব্বার স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন। আমার হস্তাক্ষর প্রেরণ করিলেও মহারাজের প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনা। তবে আমাকে স্বয়ং যাইতে কেন কহিতেছেন ?"

ও। তাহার কারণ এই যে, মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং আমাদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত নহেন ; আপনার নিকট প্রকৃত বলবত্তা জানিতে পারিবেন। আর মহাশয়ের অনুরোধে বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা ; লিপি দ্বারা সেরূপ নহে। সন্ধির আশু এক ফল হইবে যে, আপনি পুনর্ব্বার কারামুক্ত হইবেন। সুতরাং নবাব কতলু খাঁ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আপনি এ সন্ধিতে অবশ্য অনুরোধ করিবেন।

জ। আমি পিতৃসন্নিধানে যাইতে অস্বীকৃত নহি।

ও। শুনিয়া সুখী হইলাম ; কিন্তু আরও এক নিবেদন আছে। আপনি যদি ঐরূপ সন্ধি সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে আবার এ দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে অঙ্গীকার করিয়া যাউন।

জ। আমি অঙ্গীকার করিলেই যে প্রত্যাগমন করিব, তাহার নিশ্চয় কি ?

ওস্‌মান হাসিয়া কহিলেন, "তাহা নিশ্চয় বটে। রাজপুতের বাক্য যে লঙ্ঘন হয় না, তাহা সকলেই জানে।"

রাজপুত্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, পিতার সহিত সাক্ষাৎ পরেই একাকী দুর্গে প্রত্যাগমন করিব।"

ও। আর কোন বিষয়ও স্বীকার করুন ; তাহা হইলেই আমরা বিশেষ বাধিত হই।—আপনি যে মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলে আমাদিগের বাসনানুযায়ী সন্ধির উদ্যোগী হইবেন, তাহাও স্বীকার করিয়া যাউন।

রাজপুত্র কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! এ অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না। দিল্লীর সম্রাট্ আমাদিগকে পাঠানজয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাঠান জয়ই করিব। সন্ধি করিতে নিযুক্ত করেন নাই, সন্ধি করিব না। কিম্বা সে অনুরোধও করিব না।"

ওস্মানের মুখভঙ্গীতে সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল; কহিলেন, "যুবরাজ! আপনি রাজপুতের ন্যায় উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।"

জ। আমার মুক্তিতে দিল্লীশ্বরেব কি? রাজপুতকুলেও অনেক রাজপুত্র আছে।

ওস্মান কাতর হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমার পরামর্শ শুনুন, এ অভিপ্রায় ত্যাগ করুন।"

জ। কেন মহাশয়?

ও। রাজপুত্র! স্পষ্ট কথা কহিতেছি, আপনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়াই নবাব সাহেব আপনাকে এ পর্য্যন্ত আদরে রাখিয়াছিলেন; আপনি যদি তাহাতে বক্র হয়েন, তবে আপনার সমূহ পীড়া ঘটাইবেন।

জ। আবার ভয়প্রদর্শন! এইমাত্র আমি কারাবাসের প্রার্থনা আপনাকে জানাইয়াছি।

ও। যুবরাজ! কেবল কারাবাসেই যদি নবাব তৃপ্ত হয়েন, তবে মঙ্গল জানিবেন।

যুবরাজ ভ্রূভঙ্গী করিলেন। কহিলেন, "না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তস্রোতঃ বৃদ্ধি করাইব।" চক্ষুঃ হইতে তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।

ওস্মান কহিলেন, "আমি বিদায় হইলাম। আমার কার্য্য আমি করিলাম, কতলু খাঁর আদেশ অন্য দূতমুখে শ্রবণ করিবেন।"

কিছু পরে কথিত দূত আগমন করিল। সে ব্যক্তি সৈনিক পুরুষের বেশধারী, সাধারণ পদাতিক অপেক্ষা কিছু উচ্চপদস্থ সৈনিকের ন্যায়। তাহার সমভিব্যাহারী আর চারি জন অস্ত্রধারী পদাতিক ছিল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কার্য্য কি?"

সৈনিক কহিল, "আপনার বাসগৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক।"

"আমি প্রস্তুত আছি, চল" বলিয়া রাজপুত্র দূতের অনুগামী হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অলৌকিক আভরণ

মহোৎসব উপস্থিত। অদ্য কতলু খাঁর জন্মদিন। দিবসে রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার, পান ইত্যাদিতে সকলেই ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। এইমাত্র সায়াহ্ন কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে; দুর্গমধ্যে আলোকময়; সৈনিক, সিপাহি, ওমরাহ, ভৃত্য, পৌরবর্গ, ভিক্ষুক, মদ্যপ, নট, নর্ত্তকী, গায়ক, গায়িকা, বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, তাম্বূলবিক্রেতা, আহারীয়বিক্রেতা, শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাতবিক্রেতা, এই সকলে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ। যথায় যাও, তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাদ্য, গন্ধবারি, পান, পুষ্প, বাজী, বেশ্যা। অন্তঃপুরমধ্যেও কতক কতক ঐরূপ। নবাবের বিহারগৃহ অপেক্ষাকৃত স্থিরতর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রমোদময়। কক্ষে কক্ষে রজতদীপ, স্ফাটিক দীপ, গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে; সুগন্ধি কুসুমদাম পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, শয্যায়, আসনে, আর পুরবাসিনীদিগের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে; বায়ু আর গোলাবের গন্ধের ভার বহন করিতে পারে না; অগণিত দাসীবর্গ কেহ বা হৈমকার্য্যখচিত বসন, কেহ বা ইচ্ছামত নীল, লোহিত, শ্যামল, পাটলাদি বর্ণের চীনবাস পরিধান করিয়া অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার প্রতি দীপের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা যাঁহাদিগের দাসী, সে সুন্দরীরা কক্ষে কক্ষে বসিয়া মহাযত্নে বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন। আজ নবাব প্রমোদমন্দিরে আসিয়া সকলকেই লইয়া প্রমোদ করিবেন; নৃত্যগীত হইবে। যাহার যাহা অভীষ্ট, সে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবে। কেহ আজ ভ্রাতার চাকরি করিয়া দিবেন আশায় মাথায় চিরুণী জোরে দিতেছিলেন। অপরা, দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন ভাবিয়া অলকগুচ্ছ বক্ষ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিলেন। কাহারও নবপ্রসূত পুত্রের দানস্বরূপ কিছু সম্পত্তি হস্তগত করা অভিলাষ, এজন্য গণ্ডে রক্তিমাবিকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঘর্ষণ করিতে করিতে রুধির বাহির করিলেন। কেহ বা নবাবের কোন প্রেয়সী ললনার নবপ্রাপ্ত রত্নালঙ্কারের অনুরূপ অলঙ্কার কামনায় চক্ষুর নীচে আকর্ণ কজ্জল লেপন করিলেন। কোন চণ্ডীকে বসন পরাইতে দাসী পেশোয়াজ মাড়াইয়া ফেলিল; চণ্ডী তাহার গালে একটা চাপড় মারিলেন। কোন প্রগল্ভার বয়োমাহাত্ম্যে কেশরাশির ভার ক্রমে শিথিলমূল হইয়া

আসিতেছিল, কেশবিন্যাসকালে দাসী চিরুণী দিতে কতকটি চুল চিরুণীর সঙ্গে উঠিয়া আসিল ; দেখিয়া কেশাধিকারিণী দরবিগলিত চক্ষুতে উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

কুসুমবনে স্থলপদ্মবৎ, বিহঙ্গকুলে কলাপীবৎ এক সুন্দরী বেশবিন্যাস সমাপন করিয়া, কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অন্ত কাহারও কোথাও যাইতে বাধা ছিল না। যেখানকার যে সৌন্দর্য্য, বিধাতা সে সুন্দরীকে তাহা দিয়াছেন ; যে স্থানের যে অলঙ্কার, কতলু খাঁ তাহা দিয়াছিল ; তথাপি সে রমণীর মুখ-মধ্যে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব বা অলঙ্কার-গর্ব্বচিহ্ন ছিল না। আমোদ, হাসি, কিছুই ছিল না। মুখকান্তি গম্ভীর, স্থির ; চক্ষুতে কঠোর জ্বালা।

বিমলা এইরূপ পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া এক সুসজ্জীভূত গৃহে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশানন্তর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। এ উৎসবের দিনেও সে কক্ষমধ্যে একটি মাত্র ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। কক্ষের এক প্রান্তভাগে একখানি পালঙ্ক ছিল। সেই পালঙ্কে আপাদমস্তক শয্যোত্তরচ্ছদে আবৃত হইয়া কেহ শয়ন করিয়া ছিল। বিমলা পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি আসিয়াছি।"

শয়ান ব্যক্তি চমকিতের ন্যায় মুখের আবরণ দূর করিল। বিমলাকে চিনিতে পারিয়া, শয্যোত্তরচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া বসিল, কোন উত্তর করিল না।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি আসিয়াছি।"

তিলোত্তমা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে বিমলার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশা বালিকা নহে। তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সেই ক্ষীণালোকে দেখিলে বোধ হইত যে, দশ বৎসর পরিমাণ বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ ; মুখ মলিন। পরিধান একখানি সঙ্কীর্ণায়তন বাস। অবিন্যস্ত কেশভারে ধূলিরাশি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গে অলঙ্কারের লেশ নাই ; কেবল পূর্ব্বে যে অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে মাত্র।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "আমি আসিব বলিয়াছিলাম—আসিয়াছি। কথা কহিতেছ না কেন?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "যে কথা ছিল, তাহা সকল কহিয়াছি, আর কি কহিব?"

বিমলা তিলোত্তমার স্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তিলোত্তমা রোদন করিতেছিলেন ; মস্তকে হস্ত দিয়া তাঁহার মুখ তুলিয়া দেখিলেন, চক্ষুর জলে মুখ প্লাবিত রহিয়াছে ; অঞ্চল

স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, অঞ্চল সম্পূর্ণ আর্দ্র। যে উপাধানে মাথা রাখিয়া তিলোত্তমা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও প্লাবিত। বিমলা কহিলেন, "এমন দিবানিশি কাঁদিলে শরীর কয় দিন বহিবে?"

তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে কহিলেন, "বহিয়া কাজ কি? এত দিন বহিল কেন, এই মনস্তাপ।"

বিমলা নিরুত্তর হইলেন। তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এখন আজিকার উপায়?"

তিলোত্তমা অসন্তোষের সহিত বিমলার অলঙ্কারাদির দিকে পুনর্ব্বার চক্ষুঃপাত করিয়া কহিলেন, "উপায়ের প্রয়োজন কি?"

বিমলা কহিলেন, "বাছা, তাচ্ছিল্য করিও না; আজও কি কতলু খাঁকে বিশেষ জান না? আপনার অবকাশ অভাবেও বটে, আমাদিগের শোক নিবারণার্থ অবকাশ দেওয়ার অভিলাষেও বটে, এ পর্য্যন্ত দুরাত্মা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছে; আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের অবসরের যে সীমা, পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আজ আমাদিগকে নৃত্যশালায় না দেখিলে না জানি কি প্রমাদ ঘটাইবে।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার প্রমাদ কি?"

বিমলা কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিলেন, "তিলোত্তমা, একবারে নিরাশ হও কেন? এখনও আমাদিগের প্রাণ আছে, ধর্ম্ম আছে; যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন ধর্ম্ম রাখিব।"

তিলোত্তমা তখন কহিলেন, "তবে মা! এই সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল; তুমি অলঙ্কার পরিয়াছ, আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সকল আভরণ না দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করিও না।"

এই বলিয়া বিমলা নিজ পরিধেয় বাস মধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন; দীপপ্রভায় তাহার শাণিত ফলক বিদ্যুদ্বৎ চমকিয়া উঠিল। তিলোত্তমা বিস্মিতা ও বিশুষ্কমুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পাইলে?"

বিমলা কহিলেন, "কাল হইতে অন্তঃপুরমধ্যে এক জন নূতন দাসী আসিয়াছে দেখিয়াছ?"

তি। দেখিয়াছি—আশ্‌মানি আসিয়াছে।

বি। আশ্‌মানির দ্বারা ইহা অভিরাম স্বামীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।

তিলোত্তমা নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন ; তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বেশ অস্ত্র ত্যাগ করিবে না ?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "না।"

বি। নৃত্যগীতাদিতে যাইবে না ?

তি। না।

বি। তাহাতেও নিস্তার পাইবে না।

তিলোত্তমা কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলা কহিলেন, "স্থির হইয়া শুন, আমি তোমার নিষ্কৃতির উপায় করিয়াছি।" তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে বিমলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা তিলোত্তমার হস্তে ওস্‌মানের অঙ্গুরীয় দিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় ধর ; নৃত্যগৃহে যাইও না ; অর্দ্ধরাত্রের এ দিকে উৎসব সম্পূর্ণ হইবেক না ; সে পর্য্যন্ত আমি পাঠানকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিব। আমি যে তোমার বিমাতা, তাহা সে জানিয়াছে, তুমি আমার সাক্ষাতে আসিতে পারিবে না, এই ছলে নৃত্যগীত সমাধা পর্য্যন্ত তাহার দর্শন-বাঞ্ছা ক্ষান্ত রাখিতে পারিব। অর্দ্ধরাত্রে অন্তঃপুরদ্বারে যাইও ; তথায় আর এক ব্যক্তি তোমাকে এইরূপ আর এক অঙ্গুরীয় দেখাইবে। তুমি নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে গমন করিও, যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, সে তোমাকে তথা লইয়া যাইবে। তুমি তাহাকে অভিরাম স্বামীর কুটীরে লইয়া যাইতে কহিও।"

তিলোত্তমা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; বিস্ময়ে হউক বা আহ্লাদে হউক, কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, পরে কহিলেন, "এ বৃত্তান্ত কি ? এ অঙ্গুরীয় তোমাকে কে দিল ?"

বিমলা কহিলেন, "সে সকল বিস্তর কথা ; অন্য সময়ে অবকাশ মত কহিব। এক্ষণে নিঃসঙ্কোচচিত্তে, যাহা বলিলাম, তাহা করিও।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তোমার কি গতি হইবে ? তুমি কি প্রকারে বাহির হইবে ?"

বিমলা কহিলেন, "আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি অন্য উপায়ে বাহির হইয়া কাল প্রাতে তোমার সহিত মিলিত হইব।"

এই বলিয়া বিমলা তিলোত্তমাকে প্রবোধ দিলেন ; কিন্তু তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজ মুক্তিপথ রোধ করিলেন, তাহা তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনেক দিন তিলোত্তমার মুখে হর্ষবিকাশ হয় নাই; বিমলার কথা শুনিয়া তিলোত্তমার মুখ আজ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

বিমলা দেখিয়া অন্তরে পুলকপূর্ণ হইলেন। বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

তিলোত্তমা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি দুর্গের সকল সংবাদ পাইয়াছ, আমাদিগের আত্মীয়বর্গ কোথায়? কে কেমন আছে বলিয়া যাও।"

বিমলা দেখিলেন, এ বিপদ্‌সাগরেও জগৎসিংহ তিলোত্তমার মনোমধ্যে জাগিতেছেন। বিমলা রাজপুত্রের নিষ্ঠুর পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তিলোত্তমার নামও নাই; এ কথা তিলোত্তমা শুনিলে কেবল দগ্ধের উপর দগ্ধ হইবেন মাত্র; অতএব সে সকল কথা কিছুমাত্র না বলিয়া উত্তর করিলেন, "জগৎসিংহ এই দুর্গমধ্যেই আছেন; তিনি শারীরিক কুশলে আছেন।"

তিলোত্তমা নীরব হইয়া রহিলেন।

বিমলা চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে তথা হইতে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্গুরীয় প্রদর্শন

বিমলা গমন করিলে পর, একাকিনী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিলোত্তমা যে সকল চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা সুখ দুঃখ উভয়েরই কারণ। পাপাত্মার পিঞ্জর হইতে যে আশু মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, এ কথা মুহুর্মুহুঃ মনে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেবল এই কথাই নহে, বিমলা যে তাঁহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, বিমলা হইতেই যে তাঁহার উদ্ধার হইবার উপায় হইল, ইহা পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দ্বিগুণ সুখী হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন, "মুক্ত হইলেই বা কোথা যাইব? আর কি পিতৃগৃহ আছে?" তিলোত্তমা আবার কাঁদিতে লাগিলেন। সকল চিন্তার শমতা করিয়া আর এক চিন্তা মনোমধ্যে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। "রাজকুমার তবে কুশলে আছেন? কোথায় আছেন? কি ভাবে আছেন? তিনি কি বন্দী?" এই ভাবিতে ভাবিতে তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইতে লাগিলেন। "হা অদৃষ্ট! রাজপুত্র আমারই জন্য বন্দী।

তাঁহার চরণে প্রাণ দিলেও কি ইহার শোধ হইবে? আমি তাঁহার জন্য কি করিব?" আবার ভাবিতে লাগিলেন, "তিনি কি কারাগারে আছেন? কেমন সে কারাগার? সেখানে কি আর কেহই যাইতে পারে না? তিনি কারাগারে বসিয়া কি ভাবিতেছেন? তিলোত্তমা কি তাঁহার মনে পড়িতেছে? পড়িতেছে বই কি? আমিই যে তাঁহার এ যন্ত্রণার মূল! না জানি, মনে মনে আমাকে কত কটূ বলিতেছেন!" আবার ভাবিতেছেন, "সে কি? আমি এ কথা কেন ভাবি! তিনি কি কাহাকে কটূ বলেন? তা নয়, তবে এই আশঙ্কা, যদি আমাকে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। কি যদি আমি যবনগৃহবাসিনী হইয়াছি বলিয়া ঘৃণায় আমাকে আর মনোমধ্যে স্থান না দেন।" আবার ভাবেন, "না না—তা কেন করিবেন; তিনিও যেমন দুর্গমধ্যে বন্দী, আমিও তেমনই বন্দীমাত্র; তবে কেন ঘৃণা করিবেন? তবু যদি করেন, তবে আমি তাঁর পায়ে ধরিয়া বুঝাইব। বুঝিবেন না? বুঝিবেন বই কি। না বুঝেন, তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। আগে আগুনে পরীক্ষা হইত; কলিতে তাহা হয় না; না হউক, আমি না হয় তাঁহার সম্মুখে আগুনে প্রাণত্যাগই করিব!" আবার ভাবেন, "কবেই বা তাঁহার দেখা পাইব? কেমন করিয়া তিনি মুক্ত হইবেন? আমি মুক্ত হইলে কি কার্য্য সিদ্ধ হইল? এ অঙ্গুরীয় বিমাতা কোথা পাইলেন? তাঁহার মুক্তির জন্য এ কৌশল হয় না? এ অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট পাঠাইলে হয় না? কে আমাকে লইতে আসিবে? তাহার দ্বারা কি কোন উপায় হইতে পারিবে না? ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কি বলে। একবার সাক্ষাৎও কি পাইতে পারিব না?" আবার ভাবেন, "কেমন করিয়াই বা সাক্ষাৎ করিতে চাহিব? সাক্ষাৎ হইলেই বা কি বলিয়াই কথা কহিব? কি কথা বলিয়াই বা মনের জ্বালা জুড়াইব?"

তিলোত্তমা অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এক জন পরিচারিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি কত?"

দাসী কহিল, "দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে।" তিলোত্তমা দাসীর বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দাসী প্রয়োজন সমাপন করিয়া চলিয়া গেল, তিলোত্তমা বিমলা-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া কক্ষমধ্য হইতে যাত্রা করিলেন। তখন আবার মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল; পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়; একপদে অগ্রসর, একপদে পশ্চাৎ হইতে লাগিলেন। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। পৌরবর্গ

খোজা হাব্‌সী প্রভৃতি সকলেই প্রমোদে ব্যস্ত; কেহ তাঁহাকে দেখিল না; দেখিলেও তৎপ্রতি মনোযোগ করিল না; কিন্তু তিলোত্তমার বোধ হইতে লাগিল, যেন সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কোন ক্রমে অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; তথায় প্রহরিগণ আনন্দে উন্মত্ত। কেহ নিদ্রিত, কেহ জাগ্রতে অচেতন, কেহ অর্দ্ধচেতন। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। এক জন মাত্র দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল; সেও প্রহরীর বেশধারী। সে তিলোত্তমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনার হাতে আঙ্গ‌ুটি আছে?"

তিলোত্তমা সভয়ে বিমলাদত্ত অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। প্রহরিবেশী উত্তমরূপে সেই অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া নিজ হস্তস্থ অঙ্গুরীয় তিলোত্তমাকে দেখাইল। পরে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন, কোন চিন্তা নাই।"

তিলোত্তমা চঞ্চল চিত্তে প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্তঃপুরদ্বারে প্রহরিগণ যেরূপ শিথিলভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র প্রহরিগণ প্রায় সেইরূপ। বিশেষ অদ্য রাত্রে অবারিত দ্বার, কেহই কোন কথা কহিল না। প্রহরী তিলোত্তমাকে লইয়া নানা দ্বার, নানা প্রকোষ্ঠ, নানা প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল। পরিশেষে দুর্গপ্রান্তে ফটকে আসিয়া কহিল, "এক্ষণে কোথায় যাইবেন, আজ্ঞা করুন, লইয়া যাই।"

বিমলা কি বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিলোত্তমার স্মরণ হইল না। আগে জগৎসিংহকে স্মরণ হইল। ইচ্ছা, প্রহরীকে কহেন, "যথায় রাজপুত্র আছেন, তথায় লইয়া চল।" কিন্তু পূর্ব্বশত্রু লজ্জা আসিয়া বৈর সাধিল। কথা মুখে বাধিয়া আসিল। প্রহরী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় লইয়া যাইব?"

তিলোত্তমা কিছুই বলিতে পারিলেন না; যেন জ্ঞানশূন্যা হইলেন, আপনা আপনিই হৃৎকম্প হইতে লাগিল। নয়নে দেখিতে, কর্ণে শুনিতে পান না; মুখ হইতে কি কথা বাহির হইল, তাহাও কিছু জানিতে পারিলেন না; প্রহরীর কর্ণে অর্দ্ধস্পষ্ট "জগৎসিংহ" শব্দটি প্রবেশ করিল।

প্রহরী কহিল, "জগৎসিংহ এক্ষণে কারাগারে আবদ্ধ আছেন, সে অন্যের অগম্য। কিন্তু আমার প্রতি এমন আজ্ঞা আছে যে, আপনি যথায় যাইতে চাহিবেন, তথায় লইয়া যাইব, আসুন।"

প্রহরী দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল। তিলোত্তমা কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন; সেই ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রহরী কারাগারদ্বারে গমন করিয়া দেখিল যে,

অন্যত্র প্রহরিগণ যেরূপ প্রমোদাসক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, এখানে সেরূপ নহে, সকলেই স্ব স্ব স্থানে সতর্ক আছে। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজপুত্র কোন্ স্থানে আছেন ?" সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া দিল। অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী কারাগার-রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্দী এক্ষণে নিদ্রিত না জাগরিত আছেন ?" কারাগার-রক্ষী কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিল, "বন্দীর উত্তর পাইয়াছি, জাগিয়া আছে।"

অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী রক্ষীকে কহিল, "আমাকে ও কক্ষের দ্বার খুলিয়া দাও, এই স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে যাইবেক।"

রক্ষী চমৎকৃত হইয়া কহিল, "সে কি। এমত হুকুম নাই, তুমি কি জান না ?"

অঙ্গুরীয়বাহক কারাগারের প্রহরীকে ওস্‌মানের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখাইল। সে তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল।

রাজকুমার কক্ষমধ্যে এক সামান্য চৌপায়ার উপর শয়ন করিয়াছিলেন; দ্বারোদ্ঘাটন-শব্দ শুনিয়া কৌতূহলপ্রযুক্ত দ্বার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিলোত্তমা বাহির দিকে দ্বারের নিকট আসিয়া আর আসিতে পারিলেন না। আবার পা চলে না; দ্বারপার্শ্বে কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া কহিল, "এ কি ? আপনি এখানে বিলম্ব করেন কেন ?" তথাপি তিলোত্তমার পা উঠিল না।

প্রহরী পুনর্ব্বার কহিল, "না যান, তবে প্রত্যাগমন করুন। এ দাঁড়াইবার স্থান নহে।"

তিলোত্তমা প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন। আবার সে দিকেও পা সরে না। কি করেন। প্রহরী ব্যস্ত হইল। ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাতসারে তিলোত্তমা এক পা অগ্রসর হইলেন। তিলোত্তমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্রের দর্শনমাত্র আবার তিলোত্তমার গতিশক্তি রহিত হইল, আবার দ্বারপার্শ্বে প্রাচীর অবলম্বনে অধোমুখে দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র প্রথমে তিলোত্তমাকে চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রমণী প্রাচীর ধরিয়া অধোমুখে দাঁড়াইল, নিকটে আইসে না, দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারের নিকটে আসিলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন।

তিলার্দ্ধ জন্য নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমার চক্ষু অমনই পৃথিবী-পানে নামিল; কিন্তু শরীর ঈষৎ সম্মুখে হেলিল, যেন রাজপুত্রের চরণতলে পতিত হইবেন।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন; অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া স্থির রহিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। রাজপুত্র কথা কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?"

তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধিল। "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?" এখনকার কি এই সম্বোধন? জগৎসিংহ কি তিলোত্তমার নামও ভুলিয়া গিয়াছেন? উভয়েই ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার রাজপুত্র কথা কহিলেন, "এখানে কি অভিপ্রায়ে?"

"এখানে কি অভিপ্রায়ে!" কি প্রশ্ন! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চারি দিকে কক্ষ, শয্যা, প্রদীপ, প্রাচীর সকলই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবলম্বনার্থ প্রাচীরে মস্তক দিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; কে প্রত্যুত্তর দিবে? প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনা না দেখিয়া কহিলেন, "তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও।"

তিলোত্তমার আর ভ্রম রহিল না, অকস্মাৎ বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মোহ

জগৎসিংহ আনত হইয়া দেখিলেন, তিলোত্তমার স্পন্দ নাই। নিজ বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার কোন সংজ্ঞাচিহ্ন না দেখিয়া প্রহরীকে ডাকিলেন।

তিলোত্তমার সঙ্গী তাঁহার নিকটে আসিল। জগৎসিংহ তাঁহাকে কহিলেন, "ইনি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। কে ইঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। তাহাকে আসিয়া শুশ্রূষা করিতে বল।"

প্রহরী কহিল, "কেবল আমিই সঙ্গে আসিয়াছি।" রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "তুমি?"

প্রহরী কহিল, "আর কেহ আইসে নাই।"

"তবে কি উপায় হইবে? কোন পৌরদাসীকে সংবাদ কর।"

প্রহরী চলিল। রাজপুত্র আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শোন, অপর কাহাকে সংবাদ দিলে গোলযোগ হইবে। আর আজ রাত্রে কেই বা প্রমোদ ত্যাগ করিয়া ইহার সাহায্যে আসিবে?"

প্রহরী কহিল, "সেও বটে। আর কাহাকেই বা প্রহরীরা কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে? অন্য অন্য লোককে কারাগারে আনিতে আমার সাহস হয় না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "তবে কি করিব? ইহার একমাত্র উপায় আছে; তুমি ঝটিতি দাসীর দ্বারা নবাবপুত্রীর নিকট এ কথার সংবাদ কর।"

প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কি না, কে বলিবে?

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে?

তিলোত্তমার ক্রমে অল্প অল্প চেতনা হইতে লাগিল। সেই ক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, প্রহরীর সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক আসিতেছে, এক জন অবগুণ্ঠনবতী। দূর হইতেই, অবগুণ্ঠনবতীর উন্নত শরীর, সঙ্গীতমধুর-পদবিন্যাস, লাবণ্যময় গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া রাজপুত্র জানিতে পারিলেন যে, দাসী সঙ্গে আয়েষা স্বয়ং আসিতেছেন, আর যেন সঙ্গে সঙ্গে ভরসা আসিতেছে।

আয়েষা ও দাসী প্রহরীর সঙ্গে কারাগার-দ্বারে আসিলে, দ্বাররক্ষক, অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদেরও যাইতে দিতে হইবে কি?"

অঙ্গুরীয়বাহক কহিল, "তুমি জান—আমি জানি না।" রক্ষী কহিল, "উত্তম।" এই বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। নিষেধ শুনিয়া আয়েষা মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কহিলেন, "প্রহরী! আমাকে প্রবেশ করিতে দাও; যদি ইহাতে তোমার প্রতি কোন মন্দ ঘটে, আমার দোষ দিও।"

প্রহরী আয়েষাকে চিনিত না। কিন্তু দাসী চুপি চুপি পরিচয় দিল। প্রহরী বিস্মিত হইয়া অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল, "দীনের অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনার কোথাও যাইতে নিষেধ নাই।"

আয়েষা কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে তিনি হাসিতেছিলেন না, কিন্তু মুখ স্বতঃ সহাস্য; বোধ হইল হাসিতেছেন। কারাগারের শ্রী ফিরিল; কাহারও বোধ রহিল না যে, এ কারাগার।

আয়েষা রাজপুত্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! এ কি সংবাদ?"

রাজপুত্র কি উত্তর করিবেন? উত্তর না করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ভূতলশায়িনী তিলোত্তমাকে দেখাইয়া দিলেন।

আয়েষা তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

রাজপুত্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। আর কেহ কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত; সাত পাঁচ ভাবিত; আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

আয়েষা যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর দেখাইত; সকল কার্য্য সুন্দর করিয়া করিতে পারিতেন। যখন তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, জগৎসিংহ আর দাসী উভয়েই মনে মনে ভাবিলেন, "কি সুন্দর!"

দাসীর হস্ত দিয়া আয়েষা গোলাব সরবত প্রভৃতি আনিয়াছিলেন; তিলোত্তমাকে তৎসমুদায় সেবন ও সেচন করাইতে লাগিলেন। দাসী ব্যজন করিতে লাগিল, পূর্ব্বে তিলোত্তমার চেতনা হইয়া আসিতেছিল; এক্ষণে আয়েষার শুশ্রূষায় সম্পূর্ণরূপ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন।

চারি দিক্ চাহিবা মাত্র পূর্ব্বকথা মনে পড়িল; তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু এ রাত্রির শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে শীর্ণ তনু অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; যাইতে পারিলেন না, পূর্ব্বকথা স্মরণ হইবামাত্র মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া অমনি আবার বসিয়া পড়িলেন। আয়েষা তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "ভগিনি! তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? তুমি এক্ষণে অতি দুর্ব্বল, আমার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিবে চল, পরে তোমার যখন ইচ্ছা তখন অভিপ্রেত স্থানে তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

তিলোত্তমা উত্তর করিলেন না।

আয়েষা প্রহরীর নিকট, সে যতদূর জানে, সকলই শুনিয়াছিলেন, অতএব তিলোত্তমার মনে সন্দেহ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ কেন? আমি তোমার শত্রুকন্যা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে অবিশ্বাসিনী বিবেচনা করিও না! আমা হইতে কোন কথা প্রকাশ হইবে না। রাত্রি অবসান হইতে না হইতে

যেখানে যাইবে, সেইখানে দাসী দিয়া পাঠাইয়া দিব। কেহ কোন কথা প্রকাশ করিবে না।”

এই কথা আয়েষা এমন সুমিষ্টস্বরে কহিলেন যে, তিলোত্তমার তৎপ্রতি কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না। বিশেষ এক্ষণে চলিতেও আর পারেন না, জগৎসিংহের নিকট বসিয়াও থাকিতে পারেন না, সুতরাং স্বীকৃতা হইলেন। আয়েষা কহিলেন, “তুমি ত চলিতে পারিবে না। এই দাসীর উপর শরীরের ভর রাখিয়া চল।”

তিলোত্তমা দাসীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তদবলম্বনে ধীরে ধীরে চলিলেন। আয়েষাও রাজপুত্রের নিকট বিদায় হয়েন; রাজপুত্র তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিবেন। আয়েষা ভাব বুঝিতে পারিয়া দাসীকে কহিলেন, “তুমি ইহাকে আমার শয়নাগারে বসাইয়া পুনর্ব্বার আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও।”

দাসী তিলোত্তমাকে লইয়া চলিল।

জগৎসিংহ মনে মনে কহিলেন, “তোমায় আমায় এই দেখা শুনা।” গম্ভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। যতক্ষণ তিলোত্তমাকে দ্বারপথে দেখা গেল, ততক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমাও ভাবিতেছিলেন, “আমার এই দেখা শুনা।” যতক্ষণ দৃষ্টিপথে ছিলেন, ততক্ষণ ফিরিয়া চাহিলেন না। যখন ফিরিয়া চাহিলেন, তখন আর জগৎসিংহকে দেখা গেল না।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমার নিকটে আসিয়া কহিল, “তবে আমি বিদায় হই?”

তিলোত্তমা উত্তর দিলেন না। দাসী কহিল, “হাঁ।” প্রহরী কহিল, “তবে আপনার নিকট যে সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় আছে, ফিরাইয়া দিউন।”

তিলোত্তমা অঙ্গুরীয় লইয়া প্রহরীকে দিলেন। প্রহরী বিদায় হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মুক্ত কণ্ঠ

তিলোত্তমা ও দাসী কক্ষমধ্য হইতে গমন করিলে আয়েষা শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন; তথায় আর বসিবার আসন ছিল না। জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইলেন।

আয়েষা কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিলেন, "রাজকুমার, ভাবে বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে কি বলিবেন। আমা হইতে যদি কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, তবে বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না; আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব।"

রাজকুমার কহিলেন, "নবাবপুত্রি, এক্ষণে আমার কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে জন্য আপনার সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলাম না। আমার এই কথা যে, আমি যে দশাপন্ন হইয়াছি, ইহাতে আপনার সহিত পুনর্ব্বার দেখা হইবে, এমন ভরসা করি না, বোধ করি এই শেষ দেখা। আপনার কাছে যে ঋণে বদ্ধ আছি, তাহা কথায় প্রতিশোধ কি করিব? আর কার্য্যেও কখন যে তাহার প্রতিশোধ করিব, সে অদৃষ্টের ভরসা করি না। তবে এই ভিক্ষা যে, যদি কখন সাধ্য হয়, যদি কখন অন্য দিন হয়, তবে আমার প্রতি কোন আজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ করিবেন না।"

জগৎসিংহের স্বর এতাদৃশ সকাতর, নৈরাশ্যব্যঞ্জক যে, তাহাতে আয়েষাও ক্লিষ্ট হইলেন, আয়েষা কহিলেন, "আপনি এত নির্ভরসা হইতেছেন কেন? এক দিনের অমঙ্গল পর দিনে থাকে না।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আমি নির্ভরসা হই নাই, কিন্তু আমার আর ভরসা করিতে ইচ্ছা করে না। এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না। এ কারাগার ত্যাগ করিতে বাসনা করি না। আমার মনের সকল দুঃখ আপনি জানেন না, আমি জানাইতেও পারি না।"

যে করুণ স্বরে রাজপুত্র কথা কহিলেন, তাহাতে আয়েষা বিস্মিত হইলেন, অধিকতর কাতর হইলেন। তখন আর নবাবপুত্রী-ভাব রহিল না; দূরতা রহিল না; স্নেহময়ী রমণী, রমণীর ন্যায় যত্নে, কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের কর ধারণ করিলেন, আবার তখনই তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিয়া, রাজপুত্রের মুখপানে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কুমার! এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয়মধ্যে কেন? আমাকে পর জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দাও, তবে বলি,—বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি—"

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার কহিলেন, "ও কথায় আর কাজ কি! সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।"

আয়েষা নীরবে রহিলেন; জগৎসিংহও নীরবে রহিলেন, উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; আয়েষা তাঁহার উপর মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

রাজপুত্র অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল। জগৎসিংহ দৃষ্টি নিম্ন করিয়া আয়েষার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন; উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে দর দর ধারা বহিতেছে।

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি আয়েষা? তুমি কাঁদিতেছ?"

আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাব ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিলেন। পুষ্প শত খণ্ড হইলে কহিলেন, "যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট এ ভাবে বিদায় লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে যাইও।"

তদ্দণ্ডে যদি ইষ্টদেবী ভবানী সশরীরে আসিয়া বরপ্রদা হইতেন, তথাপি রাজপুত্র অধিক চমৎকৃত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্র প্রথমে উত্তর করিতে পারিলেন না। আয়েষা পুনর্ব্বার কহিলেন, "জগৎসিংহ! রাজকুমার! এস।"

জগৎসিংহ অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আয়েষা! তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে?"

আয়েষা কহিলেন, "এই দণ্ডে।"

রা। তোমার পিতার অজ্ঞাতে?

আ। সে জন্য চিন্তা করিও না, তুমি শিবিরে গেলে—আমি তাঁহাকে জানাইব।

"প্রহরীরা যাইতে দিবে কেন?"

আয়েষা কণ্ঠ হইতে রত্নকণ্ঠী ছিঁড়িয়া দেখাইয়া কহিলেন, "এই পুরস্কার লোভে প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিবে।"

রাজপুত্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "এ কথা প্রকাশ হইলে তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাইবে।"

"তাহাতে ক্ষতি কি?"

"আয়েষা! আমি যাইব না।"

আয়েষার মুখ শুষ্ক হইল। ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমি কদাচ করিব না।

আয়েষা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চিত যাইবে না ?"

রাজকুমার কহিলেন, "তুমি একাকিনী যাও।"

আয়েষা পুনর্ব্বার নীরব হইয়া রহিলেন। আবার চক্ষে দর দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল ; আয়েষা কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আয়েষার নিঃশব্দ রোদন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, "আয়েষা ! রোদন করিতেছ কেন ?"

আয়েষা কথা কহিলেন না। রাজপুত্র আবার কহিলেন, "আয়েষা ! আমার অনুরোধ রাখ, রোদনের কারণ যদি প্রকাশ্য হয়, তবে আমার নিকট প্রকাশ কর। যদি আমার প্রাণদান করিলে তোমার নীরব রোদনের কারণ নিরাকরণ হয়, তাহা আমি করিব। আমি যে বন্দিত্ব স্বীকার করিলাম, কেবল ইহাতেই কখনও আয়েষার চক্ষে জল আইসে নাই। তোমার পিতার কারাগারে আমার ন্যায় অনেক বন্দী কষ্ট পাইয়াছে।"

আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র ! আমি আর কাঁদিব না।"

রাজপুত্র প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উভয়ে আবার নীরবে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

প্রকোষ্ঠ-প্রাকারে আর এক ব্যক্তির ছায়া পড়িল ; কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের নিকটে দাঁড়াইল, তথাপি দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্তম্ভের ন্যায় স্থির দাঁড়াইয়া, পরে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল, "নবাবপুত্রি ! এ উত্তম।"

উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—ওস্মান।

ওস্মান তাঁহার অনুচর অঙ্গুরীয়বাহকের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া আয়েষার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। রাজপুত্র, ওস্মানকে সে স্থলে দেখিয়া আয়েষার জন্য শঙ্কান্বিত হইলেন, পাছে আয়েষা, ওস্মান বা কতলু খাঁর নিকট তিরস্কৃতা বা অপমানিতা হন। ওস্মান যে ক্রোধপ্রকাশক স্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিলেন, তাহাতে সেইরূপ সম্ভাবনা বোধ হইল। ব্যঙ্গোক্তি শুনিবামাত্র আয়েষা ওস্মানের কথার অভিপ্রায় নিঃশেষ বুঝিতে পারিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। আর কোন অধৈর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। স্থির স্বরে উত্তর করিলেন, "কি উত্তম, ওস্মান ?"

ওস্মান পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন, "নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।"

আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল। ওস্‌মানের মুখপানে চাহিয়া উত্তর করিলেন। সেরূপ গর্ব্বিত স্বর ওস্‌মান কখন আয়েষার কণ্ঠে শুনেন নাই।

আয়েষা কহিলেন, "এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

ওস্‌মান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন; কহিলেন, "প্রয়োজন আছে কি না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"

আয়েষা পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

ওস্‌মানও পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওস্‌মানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখ-পদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ এক দিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওস্‌মান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্রের মনে অন্ধকার-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আয়েষার নীরব রোদন এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। ওস্‌মান কতক কতক ঘুণাক্ষরে পূর্ব্বেই এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই আয়েষার প্রতি এরূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু আয়েষা তাঁহার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে কথা ব্যক্ত করিবেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। ওস্‌মান নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

আয়েষা পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "শুন, ওস্‌মান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইঁহার শোণিতে আর্দ্র হয়—" বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন; "তথাপি দেখিবে, হৃদয়-মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইঁহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইঁহার

প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব। আরও শুন; মনে কর এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, আমি দৌবারিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি বশীভূত করিয়া দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃশিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন। নচেৎ তুমি এতক্ষণ ইহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।"

আয়েষা আবার অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য প্রকার স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওস্‌মান, এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি; এ আমার অনুচিত। কিন্তু তুমি আজি আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয়, কাল পিতার সমক্ষে বলিব।"

পরে জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওস্‌মান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইত না।"

রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; অন্তঃকরণ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল।

ওস্‌মানও কথা কহিলেন না। আয়েষা আবার বলিতে লাগিলেন, "ওস্‌মান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্বমত স্নেহ-পরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।"

এই বলিয়া সুন্দরী দাসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকিনী বহির্গতা হইলেন। ওস্‌মান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় বিনা বাক্যে থাকিয়া, নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দাসী চরণে

সেই রজনীতে কতলু খাঁর বিলাস-গৃহমধ্যে নৃত্য হইতেছিল। তথায় অপরা নর্ত্তকী কেহ ছিল না—বা অপর শ্রোতা কেহ ছিল না। জন্মদিনোপলক্ষে মোগল

সম্রাটেরা যেরূপ পারিষদমণ্ডলী মধ্যে আমোদ-পরায়ণ থাকিতেন, কতলু খাঁর সেরূপ ছিল না। কতলু খাঁর চিত্ত একান্ত আত্মসুখরত, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষী। অন্ত রাত্রে তিনি একাকী নিজ বিলাস-গৃহনিবাসিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের নৃত্যগীত কৌতুকে মত্ত ছিলেন। খোজাগণ ব্যতীত অন্য পুরুষ তথায় আসিবার অনুমতি ছিল না। রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গায়িতেছে, কেহ বাদ্য করিতেছে; অপর সকলে কতলু খাঁকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া শুনিতেছে।

ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর সামগ্রী সকলই তথায় প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কক্ষমধ্যে প্রবেশ কর; প্রবেশ করিবামাত্র অবিরত সিঞ্চিত গন্ধবারির স্নিগ্ধ ঘ্রাণে আপাদমস্তক শীতল হয়। অগণিত রজত দ্বিরদরদ স্ফাটিক শামাদানের তীব্রোজ্জ্বল জ্বালা নয়ন ঝলসিতেছিল; অপরিমিত পুষ্পরাশি কোথাও মালাকারে, কোথাও স্তূপাকারে, কোথাও স্তবকাকারে, কোথাও রমণী-কেশপাশে, কোথাও রমণীকণ্ঠে, স্নিগ্ধতর প্রভা প্রকাশিত করিতেছে। কাহার পুষ্পব্যজন, কাহারও পুষ্প আভরণ, কেহ বা অন্যের প্রতি পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণ করিতেছে; পুষ্পের সৌরভ, সুরভি বারির সৌরভ; সুগন্ধ দীপের সৌরভ; গন্ধদ্রব্য-মার্জ্জিত বিলাসিনীগণের অঙ্গের সৌরভ; পুরীমধ্যে সর্ব্বত্র সৌরভে ব্যাপ্ত। প্রদীপের দীপ্তি, পুষ্পের দীপ্তি, রমণীগণের রত্নালঙ্কারের দীপ্তি, সর্ব্বোপরি ঘন ঘন কটাক্ষ-বর্ষিণী কামিনী-মণ্ডলীর উজ্জ্বল নয়নদীপ্তি। সপ্তসুরসম্মিলিত মধুর বীণাদি বাদ্যের ধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া উঠিতেছে, তদধিক পরিষ্কার মধুরনিনাদিনী রমণীকণ্ঠগীতি তাহার সহিত মিশিয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাললয়মিলিত পাদবিক্ষেপে নর্ত্তকীর অলঙ্কারশিঞ্জিত শব্দ মনোমুগ্ধ করিতেছে।

ঐ দেখ পাঠক! যেন পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে; প্রফুল্ল পদ্মমুখী সবে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, ঐ যে সুন্দরী নীলাম্বরপরিধানা, ঐ যার নীল বাস স্বর্ণতারাবলীতে খচিত, দেখ! ঐ যে দেখিতেছ, সুন্দরী সীমন্তপার্শ্বে হীরকতারা ধারণ করিয়াছে, দেখিয়াছ উহার কি সুন্দর ললাট! প্রশান্ত, প্রশস্ত, পরিষ্কার; এ ললাটে কি বিধাতা বিলাসগৃহ লিখিয়াছিলেন? ঐ যে শ্যামা পুষ্পাভরণা, দেখিয়াছ উহার কেমন পুষ্পাভরণ সাজিয়াছে? নারীদেহ শোভার জন্যই পুষ্প-সৃজন হইয়াছিল। ঐ যে দেখিতেছ সম্পূর্ণ, মৃদুরক্ত, ওষ্ঠাধর যার; যে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে, দেখ, উহা সুচিক্কণ নীল বাস ফুটিয়া কেমন বর্ণপ্রভা বাহির হইতেছে; যেন নির্ম্মল নীলাম্বুমধ্যে পূর্ণচন্দ্রালোক দেখা যাইতেছে। এই যে সুন্দরী মরালনিন্দিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, দেখিয়াছ উহার কেমন কর্ণের কুণ্ডল দুলিতেছে?

কে তুমি সুকেশি সুন্দরি? কেন উরঃপর্য্যন্ত কুঞ্চিতালক-রাশি লম্বিত করিয়া দিয়াছ? পদ্মবৃক্ষে কেমন করিয়া কাল ফণিনী জড়ায়, তাহাই কি দেখাইতেছ?

আর, তুমি কে সুন্দরি, যে কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুরা ঢালিতেছ? কে তুমি, যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণলাবণ্য দেহ প্রতি কতলু খাঁ ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? কে তুমি অব্যর্থ কটাক্ষে কতলু খাঁর হৃদয় ভেদ করিতেছ? ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি বিমলা। অত সুরা ঢালিতেছ কেন? ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল, বসন মধ্যে ছুরিকা আছে ত? আছে বই কি। তবে অত হাসিতেছ কিরূপে? কতলু খাঁ তোমার মুখপানে চাহিতেছে। ও কি? কটাক্ষ! ও কি, আবার কি! ঐ দেখ, সুরাস্বাদ-প্রমত্ত যবনকে ক্ষিপ্ত করিলে। এই কৌশলেই বুঝি সকলকে বর্জ্জিত করিয়া কতলু খাঁর প্রেয়সী হইয়া বসিয়াছ? না হবে কেন, যে হাসি, যে অঙ্গভঙ্গী, যে সরস কথারহস্য, যে কটাক্ষ! আবার সরাব! কতলু খাঁ, সাবধান! কতলু খাঁ কি করিবে! যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে সুরাপাত্র দিতেছে! ও কি ধ্বনি? এ কে গায়? এ কি মানুষের গান, না, সুররমণী গায়? বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গায়িতেছে। কি সুর! কি ধ্বনি! কি লয়! কতলু খাঁ, এ কি? মন কোথায় তোমার? কি দেখিতেছ? সমে সমে হাসিয়া কটাক্ষ করিতেছে; ছুরির অধিক তোমার হৃদয়ে বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ? অমনি কটাক্ষে প্রাণহরণ করে, আবার সঙ্গীতের সন্ধিসম্বন্ধ কটাক্ষ! আরও দেখিয়াছ কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক-দোলন? দেখিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণাভরণ দুলিতেছে? হাঁ। আবার সুরা ঢাল, দে মদ দে, এ কি! এ কি! বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গী! দে মদ! কি অঙ্গ! কি গঠন! কতলু খাঁ! জাঁহাপনা! স্থির হও! স্থির! উঃ! কতলুর শরীরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পিয়ালা! আহা! দে পিয়ালা! মেরি পিয়ারী! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব! দে সরাব!

কতলু খাঁ উন্মত্ত হইল। বিমলাকে ডাকিয়া কহিল, "তুমি কোথা, প্রিয়তমে!"

বিমলা কতলু খাঁর স্কন্ধে এক বাহু দিয়া কহিলেন, "দাসী শ্রীচরণে।"—অপর করে ছুরিকা—

তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি করিয়া বিমলাকে কতলু খাঁ দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং যেই নিক্ষেপ করিল, অমনি আপনিও ধরাতলশায়ী হইল। বিমলা তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন।

"পিশাচী—সয়তানী!" কতলু খাঁ এই কথা বলিয়া চীৎকার করিল। "পিশাচী নহি—সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।" এই বলিয়া বিমলা কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

কতলু খাঁর বাঙ্‌নিষ্পত্তি-ক্ষমতা ঝটিতি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সাধ্যমত চীৎকার করিতে লাগিল। বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিল। বিমলাও চীৎকার করিতে করিতে ছুটিলেন। কক্ষান্তরে গিয়া কথোপকথন শব্দ পাইলেন। বিমলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। এক কক্ষপরে দেখেন, তথায় প্রহরী ও খোজাগণ রহিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ও বিমলার ত্রস্ত ভাব দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শীঘ্র যাও, কক্ষমধ্যে মোগল প্রবেশ করিয়াছে, বুঝি নবাবকে খুন করিল।"

প্রহরী ও খোজাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে কক্ষাভিমুখে ছুটিল। বিমলাও ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুর-দ্বারাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দ্বারে প্রহরী প্রমোদক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, বিমলা বিনা বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই প্রায় ঐরূপ, অবাধে দৌড়িতে লাগিলেন। বাহির ফটকে দেখিলেন, প্রহরিগণ জাগরিত। এক জন বিমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও, কোথা যাও?"

তখন অন্তঃপুরমধ্যে মহা কোলাহল উঠিয়াছে, সকল লোক জাগিয়া সেই দিকে ছুটিতেছিল। বিমলা কহিলেন, "বসিয়া কি করিতেছ, গোলযোগ শুনিতেছ না?"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলযোগ?"

বিমলা কহিলেন, "অন্তঃপুরে সর্ব্বনাশ হইতেছে, নবাবের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে।"

প্রহরিগণ ফটক ফেলিয়া দৌড়িল; বিমলা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিমলা ফটক হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, এক জন পুরুষ এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছেন। দৃষ্টিমাত্র বিমলা তাঁহাকে অভিরাম স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বিমলা তাঁহার নিকট যাইবা মাত্র অভিরাম স্বামী কহিলেন, "আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম; দুর্গমধ্যে কোলাহল কিসের?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আমি বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে আর অধিক কথায় কাজ নাই, শীঘ্র আশ্রমে চলুন; পরে সবিশেষ নিবেদিব। তিলোত্তমা আশ্রমে গিয়াছে ত?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "তিলোত্তমা অগ্রে অগ্রে আশ্‌মানির সহিত যাইতেছে, শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবেক।"

এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতবেগে চলিলেন। অচিরাৎ কুটীর মধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ক্ষণপূর্ব্বেই আয়েষার অনুগ্রহে তিলোত্তমা আশ্‌মানির সঙ্গে তথায় আসিয়াছেন। তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর পদযুগলে প্রণত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অভিরাম স্বামী তাঁহাকে স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, এখন আর তিলার্দ্ধ এদেশে তিষ্ঠান নহে। যবনেরা সন্ধান পাইলে এবারে প্রাণে মারিয়া প্রভুর মৃত্যুশোক নিবারণ করিবে। আমরা অদ্য রাত্রিতে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই চল।"

সকলেই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিম কাল

বিমলার পলায়নের ক্ষণমাত্র পরেই এক জন কর্ম্মচারী অতিব্যস্তে জগৎসিংহের কারাগারমধ্যে আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! নবাব সাহেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি!"

রাজপুরুষ কহিলেন, "অন্তঃপুর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিয়া নবাব সাহেবকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এখনও প্রাণত্যাগ হয় নাই, কিন্তু আর বিলম্ব নাই, আপনি ঝটিতি চলুন, নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এ সময়ে আমার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন?"

দূত কহিল, "কি জানি? আমি বার্ত্তাবহ মাত্র।"

যুবরাজ দূতের সহিত অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে, কতলু খাঁর জীবন-প্রদীপ সত্য সত্যই নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকারের আর বিলম্ব নাই, চতুর্দ্দিকে ওস্‌মান, আয়েষা, মুমূর্ষুর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ, পত্নী, উপপত্নী, দাসী, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। রোদনাদির কোলাহল পড়িয়াছে; প্রায়

সকলেই উচ্চরবে কাঁদিতেছে; শিশুগণ না বুঝিয়া কাঁদিতেছে; আয়েষা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না। আয়েষার নয়ন-ধারায় মুখ প্লাবিত হইতেছে; নিঃশব্দে পিতার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জগৎসিংহ দেখিলেন, সে মূর্ত্তি স্থির, গম্ভীর, নিস্পন্দ।

যুবরাজ প্রবেশ মাত্র খ্বাজা ইসা নামে অমাত্য তাঁহার কর ধরিয়া কতলু খাঁর নিকটে লইলেন; যেরূপ উচ্চস্বরে বধিরকে সম্ভাষণ করিতে হয়, সেইরূপ স্বরে কহিলেন, "যুবরাজ জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

কতলু খাঁ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি শক্র; মরি;—রাগ দ্বেষ ত্যাগ।"

জগৎসিংহ বুঝিয়া কহিলেন, "এ সময়ে ত্যাগ করিলাম।"

কতলু খাঁ পুনরপি সেইরূপ স্বরে কহিলেন, "যাজ্ঞা—স্বীকার।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্বীকার করিব?"

কতলু খাঁ পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "বালক সব—যুদ্ধ—বড় তৃষা।"

আয়েষা মুখে সর্‌বত সিঞ্চন করিলেন।

"যুদ্ধ—কাজ নাই—সন্ধি—"

কতলু খাঁ নীরব হইলেন। জগৎসিংহ কোন উত্তর করিলেন না। কতলু খাঁ তাঁহার মুখপানে উত্তর প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়া কষ্টে কহিলেন, "অস্বীকার?"

যুবরাজ কহিলেন, "পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিলে, আমি সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকার করিলাম।"

কতলু খাঁ পুনরপি অর্দ্ধস্ফুটশ্বাসে কহিলেন, "উড়িষ্যা?"

রাজপুত্র বুঝিয়া কহিলেন, "যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তবে আপনার পুত্রেরা উড়িষ্যাচ্যুত হইবে না।"

কতলুর মৃত্যু-ক্লেশ-নিপীড়িত মুখকান্তি প্রদীপ্ত হইল।

মুমূর্ষু কহিল, "আপনি—মুক্ত—জগদীশ্বর—মঙ্গল—" জগৎসিংহ চলিয়া যান, আয়েষা মুখ অবনত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কতলু খাঁ খ্বাজা ইসার প্রতি চাহিয়া আবার প্রতিগমনকারী রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। খ্বাজা ইসা রাজপুত্রকে কহিলেন, "বুঝি আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

রাজপুত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কতলু খাঁ কহিলেন, "কাণ।"

রাজপুত্র বুঝিলেন। মুমূর্ষুর অধিকতর নিকটে দাঁড়াইয়া মুখের নিকট কর্ণাবনত করিলেন। কতলু খাঁ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "বীর।—"

ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ—তৃষা।"

আয়েষা পুনরপি অধরে পেয় সিঞ্চন করিলেন।

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

রাজপুত্রকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল; চমকিতের ন্যায় ঋজ্বায়ত হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইলেন। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন, "পিতৃহীনা—আমি পাপিষ্ঠ—উঃ তৃষা।"

আয়েষা পুনঃ পুনঃ পানীয়াভিষিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বাক্যস্ফুরণ দুর্ঘট হইল। শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "দারুণ জ্বালা—সাধ্বী—তুমি দেখিও—"

রাজপুত্র কহিলেন, "কি?" কতলু খাঁর কর্ণে এই প্রশ্ন মেঘগর্জ্জনবৎ বোধ হইল। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন, "এই ক—কন্যার—মত পবিত্রা।—তুমি।—উঃ!—বড় তৃষা—যাই যে—আয়েষা।"

আর কথা সরিল না; সাধ্যাতীত পরিশ্রম হইয়াছিল, শ্রমাতিরেক ফলে নির্জ্জীব মস্তক ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। কন্যার নাম মুখে থাকিতে থাকিতে নবাব কতলু খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতা

জগৎসিংহ কারামুক্ত হইয়া পিতৃশিবিরে গমনানন্তর নিজ স্বীকারানুযায়ী মোগল পাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ করাইলেন। পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও উৎকলাধিকারী হইয়া রহিলেন। সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ ইতিবৃত্তে বর্ণনীয়। এ স্থলে অতি-বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। সন্ধি সমাপনান্তে উভয় দল কিছু দিন পূর্ব্বাবস্থিতির স্থানে রহিলেন। নবপ্রীতিসম্বর্দ্ধনার্থে কতলু খাঁর পুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রধান রাজমন্ত্রী খাজা ইসা ও সেনাপতি ওস্মান রাজা মানসিংহের শিবিরে গমন করিলেন; সার্দ্ধশত হস্তী আর অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া রাজার পরিতোষ জন্মাইলেন; রাজাও তাঁহাদিগের বহুবিধ সম্মান করিয়া সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপ সন্ধিসম্বন্ধ সমাপন করিতে ও শিবির-ভঙ্গোদ্যোগ করিতে কিছু দিন গত হইল।

পরিশেষে রাজপুত সেনার পাটনায় যাত্রার সময় আগত হইলে, জগৎসিংহ এক দিবস অপরাহ্ণে সহচর সমভিব্যাহারে পাঠান-দুর্গে ওস্‌মান প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। কারাগারে সাক্ষাতের পর, ওস্‌মান রাজপুত্রের প্রতি আর সৌহৃদ্যভাব প্রকাশ করেন নাই। অত্য সামান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় দিলেন।

জগৎসিংহ ওস্‌মানের নিকট ক্ষুণ্ণমনে বিদায় লইয়া খাজা ইসার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তথা হইতে আয়েষার নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে চলিলেন। এক জন অন্তঃপুর-রক্ষী দ্বারা আয়েষার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আর রক্ষীকে কহিয়া দিলেন যে, "বলিও, নবাব সাহেবের লোকান্তর পরে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এক্ষণে আমি পাটনায় চলিলাম, পুনর্ব্বার সাক্ষাতের সম্ভাবনা অতি বিরল; অতএব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যাইতে চাহি।"

খোজা কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "নবাবপুত্রী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না ; অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাজপুত্র সম্বর্দ্ধিত বিষাদে আত্মশিবিরাভিমুখ হইলেন। দুর্গদ্বারে দেখিলেন, ওস্‌মান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজপুত্র ওস্‌মানকে দেখিয়া পুনরপি অভিবাদন করিয়া চলিয়া যান, ওস্‌মান পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজপুত্র কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, আপনার যদি কোন আজ্ঞা থাকে প্রকাশ করুন, আমি প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হই।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে, এত সহচর সাক্ষাৎ তাহা বলিতে পারিব না, সহচরদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করুন, একাকী আমার সঙ্গে আসুন।"

রাজপুত্র বিনা সঙ্কোচে সহচরগণকে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়া একা অশ্বারোহণে পাঠানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ; ওস্‌মানও অশ্ব আনাইয়া আরোহণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ওস্‌মান রাজপুত্র সঙ্গে এক নিবিড় শাল-বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনের মধ্যস্থলে এক ভগ্ন অট্টালিকা ছিল, বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালে কোন রাজবিদ্রোহী এ স্থলে আসিয়া কাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল। শালবৃক্ষে ঘোটক বন্ধন করিয়া ওস্‌মান রাজপুত্রকে সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেলেন। অট্টালিকা মনুষ্যশূন্য। মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ; তাহার এক পার্শ্বে এক যাবনিক সমাধিখাত প্রস্তুত রহিয়াছে, অথচ শব নাই ; অপর পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে, অথচ কোন মৃতদেহ নাই।

প্রাঙ্গণমধ্যে আসিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "এ সকল আমার আজ্ঞাক্রমে হইয়াছে; আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমাকে এই কবরমধ্যে সমাধিস্থ করিবেন, কেহ জানিবে না; যদি আপনি দেহত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সৎকার করাইব, অপর কেহ জানিবে না।"

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না; এ পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, এক জন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।"

তখন রাজপুত্র আদ্যোপান্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কহিলেন, "আপনার কি অভিপ্রায়?"

ওস্‌মান কহিলেন, "সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর। সাধ্য হয়, আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া যাও।"

এই বলিয়া ওস্‌মান জগৎসিংহকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ দিলেন না, অসিহস্তে তৎপ্রতি আক্রমণ করিলেন। রাজপুত্র অগত্যা আত্মরক্ষার্থ শীঘ্রহস্তে কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া ওস্‌মানের আঘাতের প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। ওস্‌মান রাজপুত্রের প্রাণনাশে পুনঃ পুনঃ বিষমোদ্যম করিতে লাগিলেন; রাজপুত্র ভ্রমক্রমেও ওস্‌মানকে আঘাতের চেষ্টা করিলেন না; কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। উভয়েই শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না। ফলতঃ যবনের অস্ত্রাঘাতে রাজপুত্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল; রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইল; ওস্‌মান প্রতি তিনি একবারও আঘাত করেন নাই, সুতরাং ওস্‌মান অক্ষত। রক্তস্রাবে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল দেখিয়া, আর এরূপ সংগ্রামে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া জগৎসিংহ কাতরস্বরে কহিলেন, "ওস্‌মান, ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করিলাম।"

ওস্‌মান উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "এ ত জানিতাম না যে, রাজপুত সেনাপতি মরিতে ভয় পায়; যুদ্ধ কর, আমি তোমায় বধ করিব, ক্ষমা করিব না। তুমি জীবিতে আয়েষাকে পাইব না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।"

ওস্‌মান অসি ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"

রাজপুত্র অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

ওস্‌মান সক্রোধে রাজপুত্রকে পদাঘাত করিলেন, কহিলেন, "যে সিপাহি যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।"

রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালদংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার যবন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওস্‌মান ভূমিশায়ী হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া হস্ত হইতে অসি উন্মোচন করিয়া লইলেন, এবং নিজ করস্থ প্রহরণ তাঁহার গলদেশে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "কেমন, সমর-সাধ মিটিয়াছে ত?"

ওস্‌মান কহিলেন, "জীবন থাকিতে নহে।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এখনই ত জীবন শেষ করিতে পারি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "কর; নচেৎ তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাকিবে।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "থাকুক, রাজপুত তাহাতে ডরে না; তোমার জীবন শেষ করিতাম, কিন্তু তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, আমিও করিলাম।"

এই বলিয়া দুই চরণের সহিত ওস্‌মানের দুই হস্ত বদ্ধ রাখিয়া, একে একে তাঁহার সকল অস্ত্র শরীর হইতে হরণ করিলেন। তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি যবন হইয়া রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গস্পর্শ করে।"

ওস্‌মান মুক্ত হইলে আর একটি কথা না কহিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একেবারে দুর্গাভিমুখে দ্রুতগমনে চলিলেন।

রাজপুত্র বস্ত্র দ্বারা প্রাঙ্গণস্থ কূপ হইতে জল আহরণ করিয়া গাত্র ধৌত করিলেন। গাত্র ধৌত করিয়া শালতরু হইতে অশ্ব মোচনপূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। অশ্বারোহণ করিয়া দেখেন, অশ্বের বল্গায়, লতা গুল্মাদির দ্বারা একখানি লিপি বাঁধা রহিয়াছে। বল্গা হইতে পত্র মোচন করিয়া দেখিলেন যে, পত্রখানি মনুষ্যের কেশ দ্বারা বদ্ধ করা

আছে, তাহার উপরিভাগে লেখা আছে যে, "এই পত্র দুই দিবস মধ্যে খুলিবেন না, যদি খুলেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করাই স্থির করিলেন। পত্র কবচ মধ্যে রাখিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

রাজপুত্র শিবিরে উপনীত হইবার পরদিন দ্বিতীয় এক লিপি দূতহস্তে পাইলেন। এই লিপি আয়েষার প্রেরিত। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত পর-পরিচ্ছেদে বক্তব্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়েষার পত্র

আয়েষা লেখনী হস্তে পত্র লিখিতে বসিয়াছেন। মুখকান্তি অত্যন্ত গম্ভীর, স্থির; জগৎসিংহকে পত্র লিখিতেছেন। একখানা কাগজ লইয়া পত্র আরম্ভ করিলেন। প্রথমে লিখিলেন, "প্রাণাধিক," তখনই প্রাণাধিক শব্দ কাটিয়া দিয়া লিখিলেন, "রাজকুমার," "প্রাণাধিক" শব্দ কাটিয়া "রাজকুমার" লিখিতে আয়েষার অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পত্রে পড়িল। আয়েষা অমনি সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পুনর্ব্বার অন্য কাগজে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কয়েক ছত্র লেখা হইতে না হইতে আবার পত্র অশ্রুকলঙ্কিত হইল। আয়েষা সে লিপিও বিনষ্ট করিলেন। অন্য বারে অশ্রুচিহ্নশূন্য একখণ্ড লিপি সমাধা করিলেন। সমাধা করিয়া একবার পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে নয়নবাষ্পে দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। কোন মতে লিপি বদ্ধ করিয়া দূতহস্তে দিলেন। লিপি লইয়া দূত রাজপুত-শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। আয়েষা একাকিনী পালঙ্ক-শয়নে রোদন করিতে লাগিলেন।

জগৎসিংহ পত্র পাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"রাজকুমার!

আমি যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, সে আত্মধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া নহে। মনে করিও না আয়েষা অধীরা। ওস্‌মান নিজ হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বালিত করিয়াছে, কি জানি আমি তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলে, যদি সে ক্লেশ পায়, এই জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সাক্ষাৎ না হইলে তুমি যে ক্লেশ পাইবে, সে ভরসাও

করি নাই। নিজের ক্লেশ—সে সকল সুখ দুঃখ জগদীশ্বরচরণে সমর্পণ করিয়াছি। তোমাকে যদি সাক্ষাতে বিদায় দিতে হইত, তবে সে ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতাম। তোমার সহিত যে সাক্ষাৎ হইল না, এ ক্লেশও পাষাণীর ন্যায় সহ্য করিতেছি।

তবে এ পত্র লিখি কেন? এক ভিক্ষা আছে, সেই জন্যই এ পত্র লিখিলাম। যদি শুনিয়া থাক যে, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তবে তাহা বিস্মৃত হও। এ দেহ বর্ত্তমানে এ কথা প্রকাশ করিব না সঙ্কল্প ছিল, বিধাতার ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে বিস্মৃত হও।

আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী; কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি!

তোমাকে অসুখী দেখিয়াছিলাম। যদি কখন সুখী হও, আয়েষাকে স্মরণ করিয়া সংবাদ দিও। ইচ্ছা না হয়, সংবাদ দিও না। যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তবে আয়েষাকে কি স্মরণ করিবে?

আমি যে তোমাকে পত্র লিখিলাম, কি যদি ভবিষ্যতে লিখি, তাহাতে লোকে নিন্দা করিবে। আমি নির্দ্দোষী, সুতরাং তাহাতে ক্ষতি বিবেচনা করিও না—যখন ইচ্ছা হইবে, পত্র লিখিও।

তুমি চলিলে, আপাততঃ এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলে। এই পাঠানেরা শান্ত নহে। সুতরাং পুনর্ব্বার তোমার এ দেশে আসাই সম্ভব। কিন্তু আমার সহিত আর সন্দর্শন হইবে না। পুনঃ পুনঃ হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি। রমণীহৃদয় যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত।

আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব। যিনি তোমার মহিষী হইবেন, তাঁহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম, যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

আর এক প্রার্থনা। যখন আয়েষার মৃত্যুসংবাদ তোমার নিকট যাইবে, তখন একবার এ দেশে আসিও, তোমার নিমিত্ত সিন্দুকমধ্যে যাহা রহিল, তাহা আমার অনুরোধে গ্রহণ করিও।

আর কি লিখিব? অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন, আয়েষার কথা মনে করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।"

জগৎসিংহ পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ তাম্বুমধ্যে পত্রহস্তে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে অকস্মাৎ শীঘ্রহস্তে একখানা কাগজ লইয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দিলেন।

"আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন। জগতে মনঃপীড়াই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা! আমি তোমার কোন প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। এ পত্রের যে উত্তর, তাহা এক্ষণে দিতে পারিলাম না। আমাকে ভুলিও না। বাঁচিয়া থাকি, তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।"

দূত এই প্রত্যুত্তর লইয়া আয়েষার নিকট প্রতিগমন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ

যে পর্য্যন্ত তিলোত্তমা আশ্‌মানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পায় নাই। তিলোত্তমা, বিমলা, আশ্‌মানি, অভিরাম স্বামী, কাহারও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। যখন মোগলপাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ হইল, তখন বীরেন্দ্রসিংহ আর তৎপরিজনের অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া উভয় পক্ষই সম্মত হইলেন যে, বীরেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে গড় মান্দারণে পুনরবস্থাপিত করা যাইবে। সেই কারণেই, ওস্‌মান, খ্বাজা ইসা, মানসিংহ প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তিলোত্তমার আশ্‌মানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে আসা ব্যতীত আর কিছুই কেহ অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মানসিংহ নিরাশ হইয়া এক জন বিশ্বাসী অনুচরকে গড় মান্দারণে স্থাপন করিয়া এই আদেশ করিলেন যে, "তুমি এইখানে থাকিয়া মৃত জায়গীরদারের স্ত্রীকন্যার উদ্দেশ করিতে থাক; সন্ধান পাইলে তাহাদিগকে দুর্গে স্থাপনা করিয়া আমার নিকট যাইবে, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব, এবং অন্য জায়গীর দিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া মানসিংহ পাটনায় গমনোদ্যোগী হইলেন।

মৃত্যুকালে কতলু খাঁর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে কোন ভাবান্তর জন্মিয়াছিল কি না, তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না। জগৎসিংহ অর্থব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যত্ন কেবল পূর্ব্ব সম্বন্ধের স্মৃতিজনিত, কি যে যে অপরাপর কারণে মানসিংহ প্রভৃতি সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই কারণসম্ভূত, কি পুনঃসঞ্চারিত প্রেমানুরোধে উৎপন্ন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। যত্ন যে কারণেই হইয়া থাকুক, বিফল হইল।

মানসিংহের সেনাসকল শিবির ভঙ্গ করিতে লাগিল, পরদিন প্রভাতে "কুচ" করিবে। যাত্রার পূর্ব্ব দিবস অশ্ববল্গায় প্রাপ্ত লিপি পড়িবার সময় উপনীত হইল। রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া লিপি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা আছে,

"যদি ধর্ম্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্র পাঠমাত্র এই স্থানে একা আসিবে। ইতি

অহং ব্রাহ্মণঃ।"

রাজপুত্র লিপি পাঠে চমৎকৃত হইলেন। একবার মনে করিলেন, কোন শত্রুর চাতুরীও হইতে পারে, যাওয়া উচিত কি? রাজপুতহৃদয়ে ব্রহ্মশাপের ভয় ভিন্ন অন্য ভয় প্রবল নহে; সুতরাং যাওয়াই স্থির হইল। অতএব নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে, যদি তিনি সৈন্যযাত্রার মধ্যে না আসিতে পারেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবে না; সৈন্য অগ্রগামী হয়, হানি নাই, পশ্চাৎ বর্দ্ধমানে কি রাজমহলে তিনি মিলিত হইতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎসিংহ একাকী শাল-বন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বকথিত ভগ্নাট্টালিকা-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ শালবৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিলেন। ইতস্ততঃ দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। পরে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, প্রাঙ্গণে পূর্ব্ববৎ এক পার্শ্বে সমাধিমন্দির, এক পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে; চিতাকাষ্ঠের উপর এক জন ব্রাহ্মণই বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ অধোমুখে বসিয়া রোদন করিতেছেন।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিলেন; রাজপুত্র জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইনি অভিরাম স্বামী।

রাজপুত্রের মনে একেবারে বিস্ময়, কৌতূহল, আহ্লাদ, এই তিনেরই আবির্ভাব হইল; প্রণাম করিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দর্শন জন্য যে কত উদ্যোগ পাইয়াছি, কি বলিব। এখানে অবস্থিতি কেন?"

অভিরাম স্বামী চক্ষুঃ মুছিয়া কহিলেন, "আপাততঃ এইখানেই বাস!"

স্বামীর উত্তর শুনিতে না শুনিতেই রাজপুত্র প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "আমাকে স্মরণ করিয়াছেন কি জন্য? রোদনই বা কেন?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "যে কারণে রোদন করিতেছি, সেই কারণেই তোমাকে ডাকিয়াছি; তিলোত্তমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু, তিল তিল করিয়া, যোদ্ধৃপতি সেইখানে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তখন আদ্যোপান্ত সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; একে একে অন্তঃকরণ মধ্যে দারুণ তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত হইতে লাগিল। দেবালয়ে প্রথম সন্দর্শন, শৈলেশ্বর-সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা, কক্ষমধ্যে প্রথম পরিচয়ে উভয়ের প্রেমোত্থিত অশ্রুজল, সেই কাল-রাত্রির ঘটনা, তিলোত্তমার মূর্চ্ছাবস্থ মুখ, যবনাগারে তিলোত্তমার পীড়ন, কারাগার মধ্যে নিজ নির্দ্দয় ব্যবহার, পরে এক্ষণকার এই বনবাসে মৃত্যু, এই সকল একে একে রাজকুমারের হৃদয়ে আসিয়া ঝটিকা-প্রঘাতবৎ লাগিতে লাগিল। পূর্ব্ব হুতাশন শতগুণ প্রচণ্ড জ্বালার সহিত জ্বলিয়া উঠিল।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যে দিন বিমলা যবন-বধ করিয়া বৈধব্যের প্রতিশোধ করিয়াছিল, সেই দিন অবধি আমি কন্যা দৌহিত্রী লইয়া যবন-ভয়ে নানা স্থানে অজ্ঞাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই দিন অবধি তিলোত্তমার রোগের সঞ্চার। যে কারণে রোগের সঞ্চার, তাহা তুমি বিশেষ অবগত আছ।"

জগৎসিংহের হৃদয়ে শেল বিঁধিল।

"সে অবধি তাহাকে নানা স্থানে রাখিয়া নানা মত চিকিৎসা করিয়াছি, নিজে যৌবনাবধি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক রোগের চিকিৎসা করিয়াছি; অন্যের অজ্ঞাত অনেক ঔষধ জানি। কিন্তু যে রোগ হৃদয়মধ্যে, চিকিৎসায় তাহার প্রতীকার নাই। এই স্থান অতি নির্জ্জন বলিয়া ইহারই মধ্যে এক নিভৃত অংশে আজ পাঁচ সাত দিন বসতি করিতেছি। দৈবযোগে এখানে তুমি আসিয়াছ দেখিয়া তোমার অশ্ববল্গায় পত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বাবধি অভিলাষ ছিল যে, তিলোত্তমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তোমার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করাইয়া অন্তিম কালে তাহার অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিব।

সেই জন্যই তোমাকে আসিতে লিখিয়াছি। তখনও তিলোত্তমার আরোগ্যের ভরসা দূর হয় নাই; কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, দুই দিন মধ্যে কিছু উপশম না হইলে চরম কাল উপস্থিত হইবে। এই জন্য দুই দিন পরে পত্র পড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। এক্ষণে যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তিলোত্তমার জীবনের কোন আশা নাই। জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে।"

এই বলিয়া অভিরাম স্বামী পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও রোদন করিতেছিলেন।

স্বামী পুনশ্চ কহিলেন, "অকস্মাৎ তোমার তিলোত্তমা সন্নিধানে যাওয়া হইবেক না; কি জানি, যদি এ অবস্থায় উল্লাসের আধিক্য সহ্য না হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, তোমাকে আসিতে সংবাদ দিয়াছি, তোমার আসার সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষণে আসার সংবাদ দিয়া আসি, পশ্চাৎ সাক্ষাৎ করিও।"

এই বলিয়া পরমহংস, যে দিকে ভগ্নাট্টালিকার অন্তঃপুর, সেই দিকে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজপুত্রকে কহিলেন, "আইস।"

রাজপুত্র পরমহংসের সঙ্গে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, একটি কক্ষ অভগ্ন আছে, তন্মধ্যে জীর্ণ ভগ্ন পালঙ্ক, তদুপরি ব্যাধিক্ষীণা, অথচ অনতিবিলুপ্তরূপ-রাশি তিলোত্তমা শয়নে রহিয়াছে; এ সময়েও পূর্ব্বলাবণ্যের মৃদুলতর-প্রভাপরিবেষ্টিত রহিয়াছে;—নির্ব্বাণোন্মুখ প্রভাততারার ন্যায় মনোমোহিনী হইয়া রহিয়াছে। নিকটে একটি বিধবা বসিয়া অঙ্গে হস্তমার্জ্জন করিতেছে; সে নিরাভরণা, মলিনা, দীনা বিমলা। রাজকুমার তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, কিসেই বা চিনিবেন, যে স্থিরযৌবনা ছিল, সে এক্ষণে প্রাচীনা হইয়াছে।

যখন রাজপুত্র আসিয়া তিলোত্তমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তখন তিলোত্তমা নয়ন মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। অভিরাম স্বামী ডাকিয়া কহিলেন, "তিলোত্তমে! রাজকুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

তিলোত্তমা নয়ন উন্মীলিত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি চাহিলেন; সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক; তিরস্করণাভিলাষের চিহ্নমাত্রে বর্জ্জিত। তিলোত্তমা চাহিবামাত্র দৃষ্টি বিনত করিলেন; দেখিতে দেখিতে লোচনে দর দর ধারা বহিতে লাগিল। রাজকুমার আর থাকিতে পারিলেন না; লজ্জা দূরে গেল; তিলোত্তমার পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে নয়নাসারে তাঁহার দেহলতা সিক্ত করিলেন।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সফলে নিষ্ফল স্বপ্ন

পিতৃহীনা অনাথিনী, রুগ্না শয্যায়;—জগৎসিংহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে। দিন যায়, রাত্রি যায়, আর বার দিন আসে; আর বার দিন যায়, রাত্রি আসে। রাজপুত-কুল-গৌরব তাহার ভগ্ন পালঙ্কের পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন; সেই দীনা, শব্দহীনা বিধবার অবিরল কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। আধিক্ষীণা দুঃখিনী তাঁহার পানে চাহে কি না— তার শিশিরনিপীড়িত পদ্মমুখে পূর্ব্বকালের সে হাসি আসে কি না, তাহাই দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

কোথায় শিবির? কোথায় সেনা?—শিবির ভঙ্গ করিয়া সেনা পাটনায় চলিয়া গিয়াছে! কোথায় অনুচর সব? দারুকেশ্বর-তীরে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথায় প্রভু? প্রবলাতপবিশোষিত সুকুমার কুসুম-কলিকায় নয়নবারি সেচনে পুনরুৎফুল্ল করিতেছেন।

কুসুম-কলিকা ক্রমে পুনরুৎফুল্ল হইতে লাগিল। এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ। ব্যাধি-প্রতীকারে প্রধান ঔষধ প্রণয়। নহিলে হৃদয়-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে?

যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলসঞ্চারে ধীরে ধীরে আবার হাসিয়া উঠে, যেমন নিদাঘশুষ্ক বল্লরী আষাঢ়ের নববারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার বিকশিত হয়; জগৎসিংহকে পাইয়া তিলোত্তমা তদ্রূপ দিনে দিনে পুনর্জ্জীবন পাইতে লাগিলেন।

ক্রমে সবলা হইয়া পালঙ্কোপরি বসিতে পারিলেন। বিমলার অবর্ত্তমানে দুজনে কাছে কাছে বসিয়া অনেক দিনের মনের কথা সকল বলিতে পারিলেন। কত কথা বলিলেন, মানসকৃত কত অপরাধ স্বীকার করিলেন, কত অন্যায় ভরসা মনোমধ্যে উদয় হইয়া মনোমধ্যেই নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বলিলেন; জাগরণে কি নিদ্রায় কত মনোমোহন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। রুগ্নশয্যায় শয়নে অচেতনে যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এক দিন তাহা বলিলেন—

যেন নববসন্তের শোভাপরিপূর্ণ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি তিনি জগৎসিংহের সহিত পুষ্পক্রীড়া করিতেছিলেন; স্তূপে স্তূপে বসন্তকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিলেন, আপনি

এক মালা কণ্ঠে পরিলেন, আর এক মালা জগৎসিংহের কণ্ঠে দিলেন; জগৎসিংহের কটিস্থ অসিস্পর্শে মালা ছিঁড়িয়া গেল। "আর তোমার কণ্ঠে মালা দিব না, চরণে নিগড় দিয়া বাঁধিব" এই বলিয়া যেন কুসুমের নিগড় রচনা করিলেন। নিগড় পরাইতে গেলেন, জগৎসিংহ অমনই সরিয়া গেলেন। তিলোত্তমা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; জগৎসিংহ বেগে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন; পথে এক ক্ষীণা নির্ঝরিণী ছিল, জগৎসিংহ লম্ফ দিয়া পার হইলেন; তিলোত্তমা স্ত্রীলোক—লম্ফে পার হইতে পারিলেন না, যেখানে নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণা হইয়াছে, সেইখানে পার হইবেন, এই আশায়, নির্ঝরিণীর ধারে ধারে ছুটিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন! নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণা হওয়া দূরে থাকুক, যত যান, তত আয়তনে বাড়ে; নির্ঝরিণী ক্রমে ক্ষুদ্র নদী হইল; ক্ষুদ্র নদী ক্রমে বড় নদী হইল; আর জগৎসিংহকে দেখা যায় না; তীর অতি উচ্চ, অতি বন্ধুর, আর পাদচালন হয় না; তাহাতে আবার তিলোত্তমার চরণতলস্থ উপকূলের মৃত্তিকা খণ্ডে খণ্ডে খসিয়া গম্ভীর নাদে জলে পড়িতে লাগিল, নীচে প্রচণ্ড ঘূর্ণিত জলাবর্ত্ত, দেখিতে সাহস হয় না। তিলোত্তমা পর্ব্বতে পুনরারোহণ করিয়া নদীগ্রাস হইতে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পথ বন্ধুর, চরণ চলে না; তিলোত্তমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন; অকস্মাৎ কালমূর্ত্তি কতলু খাঁ পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল; কণ্ঠের পুষ্পমালা অমনই গুরুভার লৌহশৃঙ্খল হইল; কুসুমনিগড় হস্তচ্যুত হইয়া আত্মচরণে পড়িল; সে নিগড় অমনি লৌহনিগড় হইয়া বেড়িল; অকস্মাৎ অঙ্গ স্তম্ভিত হইল; তখন কতলু খাঁ তাঁহার গলদেশ ধরিয়া ঘূর্ণিত করিয়া নদী-তরঙ্গ-প্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ করিল।

স্বপ্নের কথা সমাপন করিয়া তিলোত্তমা সজলচক্ষে কহিলেন, "যুবরাজ, আমার এ শুধু স্বপ্ন নহে; তোমার জন্য যে কুসুমনিগড় রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহা সত্যই আত্মচরণে লৌহনিগড় হইয়া ধরিয়াছে। যে কুসুমমালা পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছিঁড়িয়াছে।"

যুবরাজ তখন হাস্য করিয়া কটিস্থিত অসি তিলোত্তমার পদতলে রাখিলেন; কহিলেন, "তিলোত্তমা, তোমার সম্মুখে এই অসিশূন্য হইলাম, আবার মালা দিয়া দেখ, অসি তোমার সম্মুখে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিতেছি।"

তিলোত্তমাকে নিরুত্তর দেখিয়া, রাজকুমার কহিলেন, "তিলোত্তমা, আমি কেবল রহস্য করিতেছি না।"

তিলোত্তমা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

সেই দিন প্রদোষকালে অভিরাম স্বামী কক্ষান্তরে প্রদীপের আলোকে বসিয়া পুতি পড়িতেছিলেন ; রাজপুত্র তথায় গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়, আমার এক নিবেদন, তিলোত্তমা এক্ষণে স্থানান্তর গমনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন, অতএব আর এ ভগ্ন গৃহে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি ? কাল যদি মন্দ দিন না হয়, তবে গড় মান্দারণে লইয়া চলুন। আর যদি আপনার অনভিমত না হয়, তবে অম্বরের বংশে দৌহিত্রী সম্প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

অভিরাম স্বামী পুতি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুতির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।

যখন রাজপুত্র স্বামীর নিকট আইসেন, তখন ভাব বুঝিয়া বিমলা আর আশ্‌মানি শনৈঃ শনৈঃ রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন ; বাহিরে থাকিয়া সকল শুনিয়াছিলেন। রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, বিমলার অকস্মাৎ পূর্ব্বভাবপ্রাপ্তি ; অনবরত হাসিতেছেন, আর আশ্‌মানির চুল ছিঁড়িতেছেন ও কিল মারিতেছেন ; আশ্‌মানি মারপিট তৃণজ্ঞান করিয়া বিমলার নিকট নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছে। রাজকুমার এক পাশ দিয়া সরিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

ফুল ফুটিল। অভিরাম স্বামী গড় মান্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহীত্রী করিলেন।

উৎসবাদির জন্য জগৎসিংহ নিজ সহচরবর্গকে জাহানাবাদ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিতৃবন্ধুও অনেকে আহ্বানপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দকার্য্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

আয়েষার প্রার্থনামতে জগৎসিংহ তাঁহাকেও সংবাদ করিয়াছিলেন। আয়েষা নিজ কিশোরবয়স্ক সহোদরকে সঙ্গে লইয়া এবং আর আর পৌরবর্গে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

আয়েষা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশতঃ সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন যে, আয়েষা তাপিতহৃদয়ে বিবাহের উৎসবে উৎসব করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। আয়েষা নিজ সহর্ষ চিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন; প্রস্ফুট শারদ সরসীরুহের মন্দান্দোলন স্বরূপ সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্ব্বত্র শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বিবাহকার্য্য নিশীথে সমাপ্ত হইল। আয়েষা তখন সহচরগণ সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলেন; হাসিয়া বিমলার নিকট বিদায় লইলেন। বিমলা কিছুই জানেন না, হাসিয়া কহিলেন, "নবাবজাদী! আবার আপনার শুভকার্য্যে আমরা নিমন্ত্রিত হইব।"

বিমলার নিকট হইতে আসিয়া আয়েষা তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার কর ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি চলিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি, তুমি অক্ষয় সুখে কালযাপন কর।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার কত দিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাতের ভরসা কিরূপে করিব?" তিলোত্তমা বিষণ্ণ হইলেন। উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে না?"

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিলেন, "আয়েষাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।"

আয়েষা গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিলেন, "এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি আমার কথা কখন যুবরাজের নিকট তুলিও না। এ কথা অঙ্গীকার কর।"

আয়েষা বুঝিয়াছিলেন যে, জগৎসিংহের জন্য আয়েষা যে এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এ কথা জগৎসিংহের হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধ রহিয়াছে। আয়েষার প্রসঙ্গমাত্রও তাঁহার অনুতাপকর হইতে পারে।

তিলোত্তমা অঙ্গীকার করিলেন। আয়েষা কহিলেন, "অথচ বিস্মৃতও হইও না, স্মরণার্থ যে চিহ্ন দিই, তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া আয়েষা দাসীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামত দাসী গজদন্ত-নির্ম্মিত পাত্রমধ্যস্থ রত্নালঙ্কার আনিয়া দিল। আয়েষা দাসীকে বিদায় দিয়া সেই সকল অলঙ্কার স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।

তিলোত্তমা ধনাঢ্য ভূস্বামিকন্যা, তথাপি সে অলঙ্কাররাশির অদ্ভুত শিল্পরচনা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজির অসাধারণ তীব্র দীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। বস্তুতঃ আয়েষা পিতৃদত্ত নিজ অঙ্গভূষণরাশি নষ্ট করিয়া তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্লভ এই সকল রত্নভূষা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।" এই কথা বলিতে বলিতে আয়েষা কত ক্লেশে যে চক্ষুর জল সংবরণ করিলেন, তিলোত্তমা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

অলঙ্কারসন্নিবেশ সমাধা হইলে, আয়েষা তিলোত্তমার দুইটি হস্ত ধরিয়া তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয়, প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চিরসুখ সম্পাদন করেন।"

তিলোত্তমাকে কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার —তোমার সার রত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।"

"তোমার সার রত্ন" বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।

তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?" অমনি আয়েষার নয়নবারিস্রোত দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

আয়েষা আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।

আয়েষা যখন আপন আবাসগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখনও রাত্রি আছে। আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল-পবন-পথ কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগনমণ্ডল মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে; মৃদুপবনহিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষ সকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে পেচক মৃদুগম্ভীর নিনাদ করিতেছে। সম্মুখে দুর্গপ্রাকার-মূলে যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই নীচে, জলপরিপূর্ণ দুর্গপরিখা নীরবে আকাশপটপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতে-ছিলেন, "এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?"

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।"

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বিভিন্ন সংস্করণে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাঠভেদ

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস, তাঁহার সাতাশ বৎসর বয়সে মুদ্রিত এবং অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সের রচনা। সুতরাং এই পুস্তকের পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পরবর্ত্তী দুইটি উপন্যাসে—'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'তে খণ্ড ও পরিচ্ছেদ বিভাগে যেরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাহা একেবারেই করেন নাই; উপন্যাসের মূল কাঠামো বজায় রাখিয়াছেন। তবে 'কপালকুণ্ডলা' হইতে ইহাতে বর্জ্জন ও সংযোজন অধিক, শব্দ ও বাক্যগত পরিবর্ত্তন 'মৃণালিনী' হইতে কম হইলেও 'কপালকুণ্ডলা'র তুলনায় বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এই পুস্তকের ত্রয়োদশটি সংস্করণ হয়। আমরা নিম্নলিখিত সংস্করণগুলির সন্ধান পাইয়াছি। ১ম—১৮৬৫, পৃ. ৩০৭; ৩য়—১৮৬৯, পৃ. ২৯৮; ৪র্থ—১৮৭১, পৃ. ২৯৮; ৫ম—১৮৭৪, পৃ. ২২০; ৬ষ্ঠ—১৮৭৫, পৃ. ২২০; ৭ম—১৮৭৯, পৃ. ২২০; ৯ম—১৮৮৩, পৃ. ২১৭; ১০ম—১২৯২ সাল (১৮৮৪ ?) পৃ. ২৩৮+২; ১১শ—১৮৮৮, পৃ. ২৩৮; ১৩শ—১৮৯৩, পৃ. ৩১৪। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু না কিছু শব্দ ও বাক্যের পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সংস্করণের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন সম্ভব নহে। আমরা প্রথম ও ত্রয়োদশ সংস্করণের উল্লেখ-যোগ্য পাঠভেদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

পৃ. ৩, পংক্তি ৪, '৯৯৭ বঙ্গাব্দের' স্থলে '৯৯৮ বঙ্গাব্দের' ছিল।

পংক্তি ৫, 'মান্দারণের' স্থলে 'জাহানাবাদের' ছিল।

পংক্তি ২০, 'অশ্বকে ছাড়িয়া' স্থলে 'অশ্বকে যথেচ্ছা স্থানে যাইতে' ছিল।

পৃ. ৫, পংক্তি ১১, 'যিনি কথা কহিতেছিলেন' স্থলে 'পূর্ব্বালাপকারিণী' ছিল।

পংক্তি ২৫, 'হীরকমণ্ডিত চূড়' স্থলে 'হীরকমণ্ডিত মারওয়াড়ী চূড়' ছিল।

পৃ. ৬, পংক্তি ২১, 'জ্যেষ্ঠা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি ?' স্থলে ছিল

কামিনী কহিল, "মহাশয়, কোন্ কালে স্ত্রীলোকে অগ্রে পরিচয় দিয়া থাকে ?"
যুবা কহিলেন, "পরিচয়ের অগ্র পশ্চাৎ কি ?"
উত্তরদায়িনী কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি ?

পৃ. ৮, পংক্তি ২, 'মানসিংহের' স্থলে 'কিনোড় মানসিংহের' ছিল।

পৃ. ৯, পংক্তি ১০, 'শত শত' স্থলে 'সার্দ্ধেক সহস্র' ছিল।

পৃ. ১০, পংক্তি ৯, 'লম্ফ দিয়া' স্থলে 'লম্ফত্যাগে' ছিল।

পংক্তি ২১, '৯৭২ হেঃ অব্দে' স্থলে '৯৩২ শালে' ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ২, '৯৮২ হেঃ অব্দে' স্থলে '৯৮২ শালে' ছিল।

পংক্তি ১২, 'মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।' স্থলে ছিল—

তদ্ভিন্ন, সুযোগে অধিক বলপ্রকাশ করিয়া উড়িষ্যার সীমার বাহিরে মেদিনীপুর এবং বিষ্ণুপুর অধিকার করিয়া লইল।

পৃ. ১১, পংক্তি ১৬-র গোড়ায় এই অংশ বসিবে—

যখন নবধর্ম্মানুরাগে মুসলমান সেনাতরঙ্গ হিমাদ্রিশিখরমালা হইতে বলদর্পে ভারতবর্ষে অবতরণ করে, তখন পৃথ্বীরাজপ্রভৃতি রাজপুত বীরেরা অসাধারণ শৌর্য্য সহকারে সেই বেগের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধোগতি বিধাতার ইচ্ছায় ছিল, সুতরাং রাজপূত সম্রাটেরা তৎকালে পরস্পর সংমিলিত না হইয়া, একে অন্যের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। মুসলমানেরা যত্নপৌনঃপুন্যে হিন্দুরাজগণকে একে একে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভব রাজপূতগণকে একেবারে তেজোহীন করিতে পারিলেন না। অনেক রাজপূত ভূপাল স্বাধীন রহিলেন; ও অদ্যাবধি মুসলমান রাজ্য লোপ পর্য্যন্ত রাজপূতেরা পুনঃ পুনঃ যবনদিগকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, অনেকবার পরাঙ্মুখও করিয়াছিলেন। কালে অনেক রাজপূত বংশকে দিল্লীশ্বর চরণে করপ্রদ হইতে হইল। এবং বাহুবলের নির্যাতনে জাতিকুল-গৌরব ত্যাগ করিয়া দিল্লীর রাজবংশে কন্যা সম্প্রদানাদির দ্বারা জেতার পরিতোষ জঁন্মাইতে হইল। দিল্লীর অধিপতিগণও বীরবৈরিকে সখিত্ব কুটুম্বিতাদির দ্বারা বাধ্য করিতে যত্নবন্ত হইলেন। ক্রমে করপ্রদ রাজপূত রাজগণ দিল্লীর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।

পৃ. ১২, পংক্তি ৯, 'দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত' স্থলে 'দারুকেশ্বর তীরে জাহানাবাদ গ্রামে শিবির স্থাপন' ছিল্।

পৃ. ১৫, পংক্তি ৪, 'দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম।' স্থলে 'দক্ষিণে গড়মান্দারণ গ্রাম।' ছিল।

পৃ. ১৫, পংক্তি ৫, 'মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল।' এই অংশ প্রথম সংস্করণে ছিল না।

পৃ. ১৫, পংক্তি ১৮-র পর 'বাঙ্গালার পাঠান···বসতি করিতেন।' এই অংশের পরিবর্ত্তে প্রথম সংস্করণে ছিল—

এই কয়েক দুর্গ মধ্যে একবংশীয় কয়েক জন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ বসতি করিতেন। কিন্তু প্রথম কথিত দুর্গ ব্যতীত অন্য গড়ের সহিত অত্র আখ্যায়িকার সংস্রব নাই।

যৎকালে দিল্লীশ্বর বালিন সসৈন্যে বঙ্গ জয় করিতে আইসেন, তখন জয়ধরসিংহ নামে এক জন সৈনিক সম্রাটের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; যে রাত্রে বালিনের জয় লাভ হয়, সেই রাত্রে ঐ সৈনিক অসম্ভব সাহস প্রকাশ করিয়া দিল্লীনাথের কার্য্যোদ্ধার করেন; দিল্লীশ্বর পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে এই গড়মান্দারণ গ্রামে এক জায়গীর দান করেন। জায়গীরদারের বংশ ক্রমে বলবন্ত হইয়া বঙ্গেশ্বরকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, এবং স্বেচ্ছামত দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। যে দুর্গের বিস্তারিত বর্ণনা করা গিয়াছে, ৯৯৮ অব্দে তন্মধ্যে বীরেন্দ্র সিংহ নামা জয়ধর সিংহের এক জন উত্তর পুরুষ বসতি করিতেন।

পৃ. ১৬, পংক্তি ৪, 'বিবাহ করিয়া আবার বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন' স্থলে 'বিবাহ করিলেন' ছিল।

পৃ. ১৬, পংক্তি ২২, 'বিমলা গৃহমধ্যে' এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

বিমলাকে আমরা পূর্ব্বে পরিচারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে পরিচারিকা বলিতেছি; তিনি পরিচর্য্যার্থ বীরেন্দ্রের বেতনভোগিনী বলিয়া রটনা ছিল, আর

পৃ. ১৭, পংক্তি ৫, 'রসিকরাজ রসোপাধ্যায়' স্থলে 'রসিকদাস স্বামী' ছিল।

পৃ. ২১, পংক্তি ১২, 'তিলোত্তমা সুন্দরী।' কথা দুইটির পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

পাঠককে সুন্দরীর রূপানুভব করাইতে বাসনা করি, কিন্তু কিরূপে সে রূপরাশি অনুভূত করাইব?

পৃ. ২২, পংক্তি ১০, 'দৃষ্টি করিতেন না।' কথাগুলির পর ছিল—

তিলোত্তমার সুগঠন নাসিকা কখন নথের ভারবহন যন্ত্রণা ভোগ করে নাই; সে একটু পুরু চামড়ার কর্ম্ম।

পৃ. ২২, পংক্তি ১৮, 'রত্নবলয়' স্থলে 'মাড়ওয়ারী চূড়' ছিল।

পৃ. ২২, পংক্তি ২৬-এর পর প্রথম সংস্করণে এই প্যারাটি ছিল—

এত গভীর কিসের চিন্তা? এ বালিকা বয়সে এত চিন্তা কি জন্য? তিলোত্তমার মনোমধ্যে প্রথম প্রেম-সঞ্চার সুখ প্রবেশ করিয়াছে? হবে!

পৃ. ২৩, পংক্তি ১, 'পুস্তকখানি' স্থলে ছিল 'কি পুস্তক পড়িতেছেন্?'

পৃ. ২৩, পংক্তি ৫, 'পড়িতে পড়িতে' স্থলে ছিল—

"মুখর মধীরং ত্যজ মঞ্জীর; রিপুমিব কেলিষু লোলন্" এই চরণ পড়িবামাত্র

পৃ. ২৬, পংক্তি ২-এর পর নিম্নলিখিত অংশ বাদ গিয়াছে—

আখ্যায়িকা মধ্যে বঙ্গীয় ইতিবৃত্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, অতএব কুমারকৃত এই পঞ্চ-দিনের যুদ্ধকার্য্য আমূল লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল সন্তোষার্থ সংক্ষেপে তাঁহার রণপ্রণালী অত্র স্থলে বর্ণিত করিব।

পৃ. ২৭, পংক্তি ২১-এর পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

পাষাণ কি মনুষ্য চল গিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করি! যুদ্ধ গোলযোগ থাক্; বিমলাই ইহার মধ্যে সরস।

পৃ. ২৮, পংক্তি ১১, 'সুখলালসাপরিপূর্ণা' স্থলে 'মদন-রসলালসা পরিপূর্ণা' ছিল।

পৃ. ২৮, পংক্তি ১৯, 'শ্রবণ কর;' কথাগুলির পরে ছিল—

প্রবৃত্তি হয়, কাঁচলিশূন্য বক্ষঃস্থল কালজয়ী কি না দেখ।

পৃ. ২৮, পংক্তি ২৬, 'রোপিত করিলেন।' কথা দুইটির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

বিমলা বেতনভোগিনী দাসী, এত ঐশ্বর্য্য কোথা পাইলেন? পরে জানিবে।

পৃ. ৩১, পংক্তি ৮, 'তবে শুনুন,' হইতে পংক্তি ১৩-র 'প্রস্থান করিল।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

আমার উপপতি আছে।

"উপ-ছাই আছে; কোথা যাবি বল্।"

"বলি।"

এই বলিয়া বিমলা এক বাহু,—স্পর্দ্ধা শুন পাঠক! এক বাহু বীরেন্দ্রের গলদেশে দিলেন, অপর বাহু তাঁহার বক্ষোমধ্যে রোপণ করিলেন; বীরেন্দ্রের হৃদয়ে কাঁচলিমুক্তা স্পর্শ হইল। একবার দ্বারের দিকে নেত্রপাত করিয়া নিজ রসাল ওষ্ঠাধর বীরেন্দ্রের ওষ্ঠে সংলিপ্ত করিলেন।

বিমলা প্রগাঢ় মুখচুম্বন করিয়া বেগে তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

পৃ. ৩৩, পংক্তি ৩, 'কাষ্ঠের পরিমাণ।' কথা দুইটির পর ছিল—

পরিধানে একখানি চারিহাত সাড়ে চারিহাত ধুতি, উরুদেশের সবটুকুই প্রায় দেখা যাইত, তাতে আবার

পৃ. ৩৩, পংক্তি ১৫, 'রামকান্ত' স্থলে 'রামান্তঃ' ছিল।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ৮-এর পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

আজ মাধবের কপালে বড় আনন্দ; বৃষভানু-সুতা কুব্জাকুটীরে আসিতেছে।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ২০-২১, 'সমাস-পটল…ভোগ দিব।' এই অংশ ছিল না।

পংক্তি ২১, 'কচিৎ কৃপাকারিণি!' এই কথা কয়টির পর ছিল—

হে অধমতারিণি,

পৃ. ৩৫, পংক্তি ১, 'উত্তরচরিত' স্থলে 'মালতীমাধব' ছিল।

পংক্তি ১২, 'মুখচন্দ্র' স্থলে 'মুখ চন্দ্রের' ছিল।

পংক্তি ১৮, 'কারণান্তরে' স্থলে 'কুচযুগ দেখিয়া' ছিল।

পংক্তি ২০, 'এ চূড়া' স্থলে 'ইহার পয়োধর' ছিল।

পংক্তি ২২, 'বসিয়া আছেন।' কথা কয়টির পর ছিল—

নিতম্ব ধরার অপেক্ষায় বৃহৎ, তাহাতে বিস্তর গাছ পালা, গো মনুষ্যাদি থাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে উরু স্বরূপ দুইটা কদলী গাছ; কদলীগাছের আওতায় অন্য গাছ গজায় না; আর পাছে কলা গাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া বিধাতা তথায় গো মনুষ্যের সৃষ্টি করেন নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বর্ণনায় যদি কোন অরসিক পাঠক আশ্‌মানির স্বরূপ নিরূপণ করিতে না পারিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিতে পারি। বিমলার অপেক্ষা আশ্‌মানির বয়স প্রায় সাত বৎসর ন্যূন; মুখ, চোখ, নাক, কাণ সামান্য মত; বর্ণ শ্যামোজ্জ্বল; মুখখানি একটু হাসি হাসি, চক্ষুও সেই ভাব; দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, শ্রী আছে। আকার খর্ব্ব; গঠন স্থূল; বেশ বিন্যাসের বড়ই পারিপাট্য। আশ্‌মানি বড় রসিকা; ব্যঙ্গ ছলনা প্রভৃতিতে বড় ভক্তি। হিন্দুস্থানির কন্যা, ভাল বাঙ্গালা কহিতে পারিত না; তাহার অর্দ্ধেক হিন্দি, অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শুনিয়া দাস দাসী সকলেই হাসিত; আশ্‌মানি আপনিও হাসিত। আশ্‌মানি বিমলার ন্যায় বড় চতুরা বলিয়া খ্যাতা ছিল। বীরেন্দ্র জানিতেন সে বড় বিশ্বাসী। বিমলা জানিতেন সে সাধ্বী।

পৃ. ৩৬, পংক্তি ১৮-১৯, এই পংক্তি দুইটি ছিল না।

পৃ. ৩৭, পংক্তি ২০, 'সুন্দরি!' কথাটির পূর্ব্বে ছিল—

রসিকঃ কৌষিকো বাসঃ—

পৃ. ৩৮, ৪ পংক্তির পর ছিল—

"হাঁ, খাইবে বইকি—এই খাও দেখ" বলিয়া আশ্‌মানি হস্ত ধরিয়া টানিয়া বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজনপাত্রের নিকট বসাইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "ছি! ছি! ছি! রাম, রাম, রাম! করিলে কি? করিলে কি? উচ্ছিষ্ট মুখ, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে?"

"ক্ষতি কি? পিরীতে সব হয়।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন।

"খাও।"

"গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, তুমি আবার স্পর্শ করিলে, আবার খাইব?"

পৃ. ৩৮, পংক্তি ১০ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠায় পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

"খাও; শোন," আশমানি গজপতির কাণে কাণে কি কহিল।

ব্রাহ্মণ আসন হইতে অর্দ্ধ হস্ত লাফাইয়া উঠিলেন।

"তবে খাই," বলিয়া দিগ্‌গজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। নিমেষ মধ্যে ভোজন-পাত্র শূন্য করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি কই?"

"মর্ এঁটো মুখে?"

"হুম্ হুম্—আঁচাই আঁচাই" বলিয়া গজপতি আস্তে ব্যস্তে মুখে জল দিতে লাগিলেন; কতক জল লাগিল কতক জল লাগিল না; দন্তমধ্যে আধপোয়া চালের অন্ন, পাত্তা হাঁড়িতে রহিল।

"কই সুন্দরি অধরসুধা কই?"

"মর আগে হাত মুখ মোছ্।"

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোঁচায় হাত মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সাড়ে চারি হাত ধুতির কোঁচা তাঁহার মুখ পর্য্যন্ত তুলিলে কাপড় পরা বৃথা হয়,—তা কি করেন?

"এখন সুন্দরি?"

"এদিকে আইস।" দিগ্‌গজ আশ্‌মানির কাছে গিয়া বসিলেন।

"মুখের কাছে মুখ আন।" দিগ্‌গজ আশমানির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

"হাঁ কর।" যা বলে তাই, দিগ্‌গজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশ্‌মানি রুমাল হইতে একটি তাম্বূল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল; দিগ্‌গজ হাঁ করিয়াই রহিলেন।

পাণ চিবাইয়া পাণের পিক এক গাল পরিপূর্ণ হইলে আশ্‌মানি সেই সমুদায় ছেপ্‌ দিগ্‌গজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।

দিগ্‌গজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়া মহা অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন; প্রেয়সী মুখে পান দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরসিক বলে; গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা গেলেন; নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।

এই অবকাশে আশ্‌মানি একটি খড়কা লইয়া দিগ্‌গজের বিপুল নাসিকার মধ্যে প্রেরণ করিল; হাঁচি আসিল, আর মুখমধ্যস্থ সমুদয় অমৃতরাশি বেগে নির্গত হইয়া দিগ্‌গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল।

ব্রাহ্মণ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গাত্র ধৌত করিতে লাগিলেন, এই সময়ে একটি সরস কবিতা আওড়াইলেন।

"দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।"

গাত্র ধৌত হইলে পর পুনরপি আশ্‌মানির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রেয়সি, এ ত মুখসুধা পাইলাম ; মুখচুম্বন কই ? সুধা চ চুম্বনশ্চৈব নরানাং মাতৃলক্ষণঃ।"

আশমানি বলিল "আমি তোমার মুখচুম্বন করিব, না তুমি আমার মুখচুম্বন করিবে ?"

দিগ্‌গজ মনে ভাবিলেন "আশমানি বহুদর্শী, রসিকা, পাড়া গেঁয়ে মেয়ে নহে, আমি মুখচুম্বন করিলে পাছে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে ত আমাকে অরসিক বলিবে ; অতএব যা শত্রু পরে পরে ;" এই ভাবিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিকে, নায়িকার মান আগে ; তুমিই আমার মুখচুম্বন কর।"

আশমানি বলিল "মুখের নিকট গাল দাও।"

দিগ্‌গজ আশমানির মুখের নিকট গাল দিয়া হাস্‌পাতালের রোগির ন্যায় আড় হইয়া বসিলেন।

আশমানি ডাক্তরের ন্যায় আঁটু গাড়িয়া এক হস্তে তাহার জানু ; আর হস্তে চিবুক বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিল। কর্কশ, রোমশ, গণ্ড ; তাহাতেই অবলীলা ক্রমে আশমানি ছুরিকা অস্ত্রের ন্যায় কয়খানি দাঁত বসাইয়া দিল। প্রথমে কোমল অধর পল্লব-স্পর্শে দিগ্‌গজের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তার পরেই প্রাণ যায়। "উহুঃ উহুঃ, বেশ, উম্, ভাল-ও-ও-ও, আর না, আর না, যাই যাই, বেশ, মাগো, ও-ও-ওঁ"

আশমানি দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিল।

দিগ্‌গজ গালে হাত বুলাইয়া দেখেন রক্ত ; বলিলেন "একি রক্ত যে ?"

আশমানি বলিল "তুমি পাগল ? ও যে পাণের পিক্"

পৃ. ৩৯, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের গোড়া হইতে পৃ. ৪০, ১৭ পংক্তির শেষ পর্য্যন্ত অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

এ দিকে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আশ্‌মানির পুনরাগমন না দেখিয়া বিমলা ব্যস্ত হইলেন, এবং আর প্রতীক্ষা অনুচিত বিবেচনায় স্বয়ং গজপতির অনুসন্ধানে গেলেন। কুটীরমধ্যে বিমলাকে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র আশ্‌মানি কহিল, "এস এস চন্দ্রাবলি এস।"

দিগ্‌গজ কহিলেন "আজ আমার সুপ্রভাত, এক জনে রক্ষা নাই, আজ দুই জনের উদয়। শাস্ত্রে লিখেছেন, 'এক চন্দ্র স্তমোহন্তি, নচ মূর্খ শতৈরপি'।"

আশ্‌মানি আরবার কহিলেন, "আর শুনিয়াছ ? রসিকরাজের জাত গিয়াছে।"

রসিকরাজ কহিলেন, "কিসে জাত গেল ?"

আশ্‌মানি কহিল "আমার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছ।"

রসিকরাজ কহিলেন "ক্ষতি কি ? ও আমার মহা প্রসাদ—তুমি আমার মা ভগবতী।"

আশ্‌মানি কহিল, "মর !"

এদিকে বিমলা কাণে কাণে আশ্‌মানিকে কহিলেন, "যাবে না ?"

"এখনও বলি নাই।"

"তবে আমি বলিতেছি।"

এই কহিয়া বিমলা দিগ্‌গজকে

পৃ. ৪১, পংক্তি ১৬, 'তল্লাস করি।' কথা কয়টির পর ছিল—

কিন্তু তোমার উপরই আমাদের প্রাণ।

পৃ. ৪১, পংক্তি ২৩, 'একবারে চলিলাম।' কথা কয়টির পর ছিল—

দেখিতেছ না, অন্য দেশে গিয়া স্ত্রী-পুরুষের মত তিন জনে থাকিব।

পৃ. ৪১, পংক্তি ২৪, 'তৈজসপত্র রহিল যে।' কথাগুলির পর ছিল—

"দ্রব্যসামগ্রী ত বিস্তর।"

"তৈজসপত্র।"

পৃ. ৪১, পংক্তি ২৮, 'বিমলা বলিলেন' এই কথা দুইটির স্থলে ছিল—

বিমলা ভাবিলেন "এর পুথিপাঁজি ত ঢের।" ভাবিয়া বলিলেন

পৃ. ৪২, পংক্তি ৯, 'আসিতে পারিল না···তাকে কেন?' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

ধরা পড়িয়াছে, আসিতে পারিল না। কেন আমাতে কি তোমার মন উঠে না?

পৃ. ৪৩, পংক্তি ১৭, 'কলসী দিব ফেলে।' কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ২৫, 'দেখিতে পাইলেন,' কথা দুইটির পর ছিল—

বিমলা আরও ভীতা হইলেন,

পৃ. ৪৬, পংক্তি ২৬, 'মন্দিরাভিমুখে চলিলেন;' কথা কয়টির পর ছিল—

লম্ফ দিয়া মন্দিরের সোপানাবলি আরোহণ করিলেন;

পৃ. ৪৮, পংক্তি ৭, 'করিয়াছে।' কথাটির পর 'এত বীর্য্য!' কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৫০, পংক্তি ১১-১২, 'অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না।' কথাগুলির স্থলে ছিল—

অন্যা কাহারও কখন পাণিগ্রহণ করিব না।

পৃ. ৫১, পংক্তি ১৭, 'অম্বরপতির' স্থলে 'আব্‌নীর্ পতির' ছিল।

পৃ. ৫৬, ১১ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

রাজকুমার জানিতে পারিলেন, বিমলা গদ্‌গদস্বরে কথা কহিতেছেন, চক্ষে একবিন্দু বারি আসিয়াছে। সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, "সখি, আমি তোমার সাহস ও চতুরতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম;

এক্ষণে তোমার চক্ষের জলে আরও সুখী হইলাম ; তুমি রমণী-রত্ন। যদি তুমি অসন্তোষ না হও, তবে আজি হইতে তোমায় সখী সম্বোধন করিব।"

পৃ. ৫৬, পংক্তি ২২, 'উদ্ঘাটন করিলেন,' কথাগুলির পর ছিল—
সেই কক্ষ-মধ্য হইতে রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

পৃ. ৫৬, পংক্তি ২৪, 'আবার কাঁপে,' কথা দুইটির পর ছিল—
বুঝি স্পষ্ট জবাব দিলে!

পৃ. ৫৬, শেষ পংক্তির পর এই অংশ ছিল—
বিমলা ডাকিয়া কহিলেন, "রাজকুমার, তিলোত্তমার সাক্ষাৎ লাভ কর।"
রাজপুত্রের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

পৃ. ৫৭, পংক্তি ৯, 'রহিয়াছেন ;' কথাটির পর ছিল—
শরীরভঙ্গী সে সময় দেখিলে কে নবযুবতীর প্রণয়স্পৃহা করিত ?

পৃ. ৫৭, পংক্তি ১০, 'হাস্য করিলেন।' কথা কয়টির পর ছিল—
পুরুষরত্ন জগৎসিংহকে স্বয়ং সযত্নে আনিয়া তাঁহাকে তিলোত্তমার আরাধনায় প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ক্ষোভে কি বিমলা হাসিলেন ? না ; তাহাতে বিমলার ক্ষোভ কিছুমাত্র নাই ; বরং অপরিমিত সুখ।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ৮, 'সুন্দরীর মুখে·· শুনায় না।' এই অংশের পরিবর্তে ছিল—
চীৎকার করিলে তোমার ও কোমল দেহ ছাদের উপর হইতে নিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করিব না।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ২২, 'ছাদ হইতে···ফেলিয়া দেওয়াও' কথা কয়টির পরিবর্তে ছিল—
সৈনিকের যে কথা সেই কাজ, করাও

পৃ. ৬০, ৩ পংক্তির পর ছিল—
বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "অঙ্গস্পর্শ দূরে থাক্‌, এইমাত্র নীচে নিক্ষেপ করিয়া আমার অঙ্গ চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন।"

সেনাপতি কহিলেন, "প্রয়োজন পড়িলে সকলই করিতে হয় ; প্রয়োজন হইলে এখনও করিতে হইবেক।"

পৃ. ৬০, পংক্তি ১৫, 'বস্ত্র ধরিলেন।' কথাগুলির পর ছিল—
বিমলা ওসমানের সতর্কতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

পৃ. ৬০, পংক্তি ১৮-১৯, 'বিমলাকে এক শত···এই বলিয়া' অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৬০, পংক্তি ২১, 'প্রেমের ফাঁস' কথা দুইটির পরিবর্ত্তে 'যুদ্ধের প্রয়োজন' ছিল।
পংক্তি ২৩-২৪, 'বিমলা চীৎকার···পাইল না।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

কিয়দ্দূর গমন, পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের জিহ্বাকে বিশ্বাস নাই।" এই বলিয়া বিমলার মুখও বন্ধন করিয়া রাখিয়া গেলেন।

পৃ. ৬১, পংক্তি ৯, 'প্রহরী থাক ;' কথাগুলির পর 'মুখের বন্ধন খুলিয়া দাও ;' ছিল।

পৃ. ৬২, পংক্তি ২৫, 'সঙ্গে সঙ্গে নিজ' কথা কয়টির পর 'কামাগ্নি-বৃষ্টি-কারক' ছিল।
২৮ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ হইল ; প্রহরীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ৮, 'কি বলিবে ?' কথাগুলির পর ছিল—
বিমলা প্রহরীর বাহুমধ্যে বাহু দিলেন—বাহুতে স্থূল বাহুর স্পর্শে আবার প্রহরী রোমাঞ্চিত হইল।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ১২, 'আবার সেই' কথা দুইটির পর 'কামাগ্নি পূর্ণ' ছিল।
১৪ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—

দিগ্‌গজ! দেখ আসিয়া, তোমার মত পণ্ডিত আরও আছে!

পৃ. ৬৫, পংক্তি ৮, 'মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ' কথাগুলির স্থলে 'দৃঢ়তর কঙ্কালবদ্ধ' ছিল।

পৃ. ৬৬, পংক্তি ২৪-২৫, 'ও রে,···মিলেছে রে !' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—
একটা স্ত্রীলোক রে! স্ত্রীলোক রে। স্ত্রীলোক!

পৃ. ৬৭, পংক্তি ১৪-১৫, 'নীরবে···নিরীক্ষণ করিতেছেন' কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—
স্বকরে সুন্দরীর করপল্লব গ্রহণ করিয়াছেন

পৃ. ৬৭, পংক্তি ১৭, 'বিদায়ের রোদন।' কথা দুইটির পর ছিল—

যাহা হউক, ইহারা এ বিষম বিপত্তি কিছুই জানিতে পারে নাই। এ সংসারে প্রেমই ক্ষমতাবান্! এ বিষম কোলাহলেও কর্ণ থাকিতে দুই জনকে বধির করিয়াছে।

পৃ. ৬৭, ২০-২২ পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

যখন বিমলা আসিয়া আগতপ্রায় মহা বিপদের সম্বাদ দিলেন, জগৎসিংহ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই নিকটে কোলাহল ধ্বনি প্রবল হইয়া উঠিল ; আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। বিমলা কহিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ; শত্রু আর তিলার্দ্ধ মধ্যে আসিবে।"

পৃ. ৬৮, পংক্তি ৮–৯, 'একা কি করিতে পারি? তবে' এই অংশের পরিবর্তে ছিল—

"হা বিধাতঃ! এই কি তোমার ইচ্ছা? এমন সময়ে কি আমায় অন্তঃপুরে স্ত্রী লোকের অঞ্চল ধরিয়া থাকিতে হইল?"

গর্ব্বিতা বিমলারও অভিমানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; রাজপুত্রকে কহিলেন, "কি প্রয়োজন যুবরাজ? আমি কিছু না পারি তিলোত্তমার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিব।" বিমলার নয়ন-পল্লব জল-ভারাবকীর্ণ হইল।

রাজপুত্রও মনঃপীড়িত হইয়া কহিলেন, "আমি তিলোত্তমাকে এ দশায় রাখিয়া কোথায় যাইব? আমিও

পৃ. ৬৮, পংক্তি ২৬, 'কটিস্থিত' স্থলে 'কঙ্কালের' ছিল।

পৃ. ৬৯, পংক্তি ১২, 'কটি' স্থলে 'কঙ্কাল' ছিল।

পংক্তি ১৫, 'কটিদেশে' স্থলে 'কঙ্কালে' ছিল।

পৃ. ৭৩, পংক্তি ২৭, 'কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়' কথাগুলির স্থলে ছিল—

কিন্তু গায়ে ঠেকিও না, ফোস্‌কা পড়িবে

পৃ. ৭৪, পংক্তি ২, 'অথচ' কথাটি ঐখানে ছিল না, কিন্তু এই পংক্তির শেষে ছিল—

অথচ আলোর আকরের দিকে চাহিবার শক্তি কাহার? সে অগ্নিময়।

পৃ. ৭৪, পংক্তি ১৩, 'কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম;' কথাগুলির স্থলে ছিল—

চুল আঁচড়াইয়া দিতে পারিতাম; একগাছি বাঁকা নহে, একগাছি আর একগাছির সঙ্গে জড়ান নয়;

পৃ. ৭৪, পংক্তি ২৭, 'ধীর মধুর কটাক্ষ!' কথা কয়টির স্থলে ছিল—

চঞ্চল কটাক্ষ! যোগবল না থাকিলে

পৃ. ৭৫, পংক্তি ৮, 'দেখিতে লাগিল।' কথা দুইটির পর ছিল—

পাঠানেরই বা উহাতে দোষ কি?

পৃ. ৭৭, পংক্তি ১৭-১৮, 'ওস্‌মান!...বাহির হইব না।' এই অংশের স্থলে ছিল—

"একথা আমার পিতার নিকট উত্থাপন করিও, তোমাকে অদেয় তাঁহার কিছুই নাই।"

"একথা আমি তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত করিতে ত্রুটি করি নাই।"

"কি উত্তর পাইয়াছিলে ?"

"তিনি বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তোমার মনোমত পাত্রে তোমাকে সমর্পণ করিবেন; তোমার মন আজও জানিতে পারিলাম না।"

আবার সেই সৌন্দর্য্যমহিম মুখে মনোমোহন হাস্য প্রকটিত হইল। আয়েষা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের মন পুরুষে কবে জানিতে পারিয়াছে।"

"ইহাতে কি বুঝিব ?"

"যে আমি তোমাকে ভাল বাসি।"

ওসমানের শ্রীমতী মুখকান্তি হর্ষোৎফুল্ল হইল।

"ভবিষ্যৎ স্বামী ভাবিয়া স্নেহ কর ?"

"আমার প্রিয়তম ভ্রাতা জানিয়া স্নেহ করি।"

পৃ. ৭৮, পংক্তি ১৪, 'গতিক মন্দ।' কথাগুলির পর 'নাড়ী অত্যন্ত এলোমেলো।' কথা কয়টি ছিল।

পৃ. ৮১, পংক্তি ১৬, 'জীবনে প্রয়োজন ?' কথা কয়টির পর ছিল—

তুমি যদি কেবল আমার প্রাণ বধ করিয়া ক্ষান্ত হইতে,—আমি

পৃ. ৮২, ৫-৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত অংশটুকু ছিল—

কহিলেন, "কি ? এ দগ্ধ হৃদয় চরণে দলিত না করিলে তোমার পরিতোষ জন্মায় না ?" পরে অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া কহিলেন, "তাহাই কর। আমি এ জন্মে আর তোমার কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট ইহার উত্তর দিও।"

কতলু খাঁর হৃদয়ে আঘাত লাগিল; পবিত্র নামে কোন্ পাপাত্মার শঙ্কা না হয় ? সে কহিল, "আর না। জল্লাদ! বধ কর্।"

পৃ. ৮৩, পংক্তি ২৬, 'যাইব।' কথাটির পরিবর্ত্তে ছিল—

না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে।

পৃ. ৮৭, পংক্তি ১০-১১, 'কতলু খাঁর অজ্ঞাতসারে···বলিয়া রাখিয়াছি।' অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৮৮, পংক্তি ১৩-১৫, 'এক দিনের তরেও···কর্ম্ম করুন।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

আপনি এ অপবিত্রাকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, আপনি সখার কার্য্য করুন।

পৃ. ৮৯, পংক্তি ১০, 'কলঙ্কিত হইয়া' স্থলে 'পিতৃতিরস্কারে অপমানিত হইয়া' ছিল।
পংক্তি ১৫, ১৮, 'শূদ্রী' স্থলে 'ছেত্রি' ছিল।

পৃ. ৯০, পংক্তি ৮, 'প্রবল হইয়াছিল।' কথা দুইটির পর ছিল—

কেহ কেহ বলিত যে, এক জন যোগী কোন যোগসাধন জন্য বিনাশার্থ বালকসংগ্রহ করিত।

পৃ. ৯২, পংক্তি ২০-২২, 'কিন্তু কি বলিয়াই…পারিবেন না বুঝিলেন।' এই অংশের স্থলে ছিল—

তিনি নিত্য নিত্য পিতার নিকট যাতায়াত করিতেন, এবং অনেক ক্ষণ থাকিতেন, অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেন, গল্প করিতেন, আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মধুর বাক্য-স্রোতঃ শ্রবণদ্বারে পান করিতাম। কায়মনে তাঁহার দাসী হইলাম; তিনিও আমাকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন না। সঙ্ক্ষেপে বলি, উভয়ে উভয়ের মন জানিতে পারিলাম। তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। যে কথা আমার কাণে কাণে কহিয়াছিলেন, আজও মধুর বীণার ন্যায় কর্ণরন্ধ্রে বাজিতেছে।

প্রাণনাথের নিকটে বিনা মূল্যে চিত্ত বিক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মাতার দুর্দ্দশা আমার চিত্তে জাগরিত হইত; ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলাম। তথাচ তাঁহার অনুরাগের লাঘব হইল না।

পৃ. ৯৩, পংক্তি ১৩, 'করিতে লাগিলেন।' কথাগুলির পর ছিল—

বিচ্ছেদ কালে প্রণয়ী কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম।

পৃ. ৯৩, পংক্তি ১৮, 'সঙ্গে যাইব।' কথা দুইটির পর ছিল—

আবার প্রাণেশ্বরকে মনে পড়িল; কহিলাম,

পৃ. ৯৪, পংক্তি ২, 'অম্বরের' স্থলে 'আবনীরের' ছিল।

পৃ. ৯৫, পংক্তি ৮-৯, 'শীঘ্র মরিব,…বলিতে পারিতেছি।' এই অংশ ছিল না।

পৃ. ৯৮, পংক্তি ৫, 'ঘনগর্জ্জন হইতেছে?' কথা কয়টির পর 'ঝড় বহিতেছে?' ছিল।
পংক্তি ১০, 'রোদন কর?' কথাগুলির পর ছিল—

কাহার সুখের জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন আস্ফালন কর?

পৃ. ১০০, পংক্তি ৯, 'একবার আসিতেন।' কথা দুইটির পর ছিল—

তাহাও যখন আসিতেন, প্রায় ওসমানের সমভিব্যাহারে আসিতেন।

পৃ. ১০৩, পংক্তি ১২, 'পড়িত লাগিল।' কথাগুলির পর ছিল—

চক্ষের জল এখনও শুকায় নাই; অর্দ্ধেক রোদন অর্দ্ধেক স্বর।

পৃ. ১০৩, ২২ পংক্তির পর ছিল—

দিগ্‌গজ কহিলেন, "তাহার পর আবার আমাকে কন্মী পড়াইলেন।"

"কন্মা পড়াইলেন, তার পর ?"

পৃ. ১০৫, পংক্তি ১, 'শক্তি নাই।' কথা কয়টির পর ছিল—

রাজপুত্র ওসমানের কথা গ্রাহ্য না করিয়া

পৃ. ১১২, পংক্তি ৭, 'দিল্লীশ্বরের কি ?' কথা দুইটির পরে ছিল—

রাজপুত কুলের কি ? দিল্লীশ্বরের অনেক সেনাপতি আছে ;

পৃ. ১১৫, পংক্তি ২৩, 'বাস মধ্যে লুক্কায়িত' কথাগুলির পর 'কঙ্কালস্থ' কথাটি ছিল।

পৃ. ১১৭, পংক্তি ১৩, 'বিমলা' কথাটির পর ছিল—

তিলোত্তমার মুখচুম্বন করিয়া

পৃ. ১১৯, পংক্তি ৪, 'আনন্দে উন্মত্ত।' কথা দুইটির পরিবর্ত্তে ছিল—

পানাসক্ত হইয়া নিজ নিজ আনন্দ ব্যক্তি করিতেছিল।

পৃ. ১২৩, পংক্তি ২৫, 'সে যতদূর জানে,' স্থলে 'প্রহরীর জানিত কথা' ছিল।

পৃ. ১২৫, পংক্তি ১১, 'সঙ্কোচ করিবেন না।' কথা কয়টির পর ছিল—

ভগিনী যেমন সহোদরের প্রতি কোন আদেশ করিতে সঙ্কোচ ত্যাগ করে আপনিও সেইরূপ করিবেন।

পৃ. ১২৫, পংক্তি ১৭-১৮, 'আমার মনের…পারি না।' এই অংশ ছিল না।

পংক্তি ২১-২২, 'আবার তখনই…ত্যাগ করিয়া,' এই অংশটুকু ছিল না।

পংক্তি ২২, 'কুমার!' কথাটির স্থলে ছিল—

"জগৎ"

আয়েষা বলিতে বলিতে ক্ষণকাল নীরব হইলেন, তিনি রাজকুমারকে "জগৎ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পরে কহিতে লাগিলেন, "জগৎ,

পৃ. ১২৫, শেষ পংক্তির 'রহিলেন;' কথাটির পর ছিল—

করে কর বদ্ধ তেমনই রহিল;

পৃ. ১২৬, পংক্তি ৫-৬, 'গোলাব ফুলটি…শত খণ্ড হইলে' এই অংশের স্থলে ছিল—

জগৎসিংহের করাকর্ষণ করিয়া নিজ পার্শ্বে চৌপাঈর উপর বসাইলেন। রাজপুত্র বসিলে পূর্ব্ববৎ তাঁহার হস্তের উপর হস্ত রাখিয়া

পৃ. ১৩০, পংক্তি ২১, 'খচিত, দেখ!' কথা দুইটির পর ছিল—

কি বিশালায়ত লোচন! কেমন মেঘবৎ নীল, কি বিদ্যুৎবৎ কটাক্ষ।

পৃ. ১৩১, পংক্তি ২, 'তাহাই কি দেখাইতেছ' কথাগুলির পর ছিল—

আর এই যে গুরু নিতম্বিনী, নিদ্রাবশে সঙ্গিনীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে, উহাকে উঠিয়া বসিতে বল, বসিবার ভঙ্গীতে পীনোন্নত পয়োধর আরও পীনোন্নত দেখাইতেছে; কতলু খাঁ থর থর চাহিতেছে ; উঠিয়া বসিতে বল।

পৃ. ১৩১, পংক্তি ৭, 'হাসিতেছ কিরূপে?' কথা কয়টির পর ছিল—

ও ত সহজ হাসি নহে ; এ হাসিতে মুনীন্দ্র মুগ্ধ করিতে পারে।

পৃ. ১৩১, পংক্তি ১৩, 'গায়িকাদিগের' স্থলে 'গায়কীদিগের' ছিল।

পংক্তি ১৭, 'মস্তক-দোলন' স্থলে 'মাথা লাড়া' ছিল।

পংক্তি ১৯, 'নাচিতেছে।' কথাটির পর ছিল—

আহা আহা! আহা হা! চলুক! চলুক

পৃ. ১৩১, পংক্তি ২০-২৩, 'উঃ! কতলুর শরীরে···তুমি কোথা, প্রিয়তমে!"' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

কালানল জ্বলিতেছে! উঃ কতলুর শরীরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পিয়ালা! আহা হা! দে পিয়ালা! আ, হা! আহা! আহা হা! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব দে সরাব! ওকি—কাঁচলি?

ওকি জাঁহাপনা? ওকি ওকি?—

হাসিতে হাসিতে রমণী মণ্ডলী উঠিয়া গেল।

বিমলা চকিতের ন্যায় কতলু খাঁর ভুজগ্রন্থি-মধ্য হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন।

কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া বিমলা কহিলেন "জাঁহাপনা, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। প্রদীপ জ্বলিতেছে।"

উন্মত্ত কতলু ফুৎকার দিয়া প্রদীপ সকল নিভাইতে লাগিল। বিমলা সকল কার্য্যে পটু, ক্ষণ কালমধ্যে সকল প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিলেন।

গৃহ অন্ধকার হইলে কতলু খাঁ কাতর-স্বরে কহিল, "কোথা গুলবদন?"

পৃ. ১৩১, পংক্তি ২৬, 'তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর' কথা দুইটির পূর্ব্বে ছিল—

কতলু খাঁ বিমলাকে বক্ষে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল।—

পৃ. ১৩২, পংক্তি ১, 'চীৎকার করিল।' কথা কয়টির পর ছিল—
চীৎকার করাতে মুখ দিয়া ঘড়ঘড়ী উঠিল।

পৃ. ১৩২, পংক্তি ৫, 'বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিল।' এই অংশ ছিল না।

পৃ. ১৩৪, পংক্তি ৩, 'নিস্পন্দ।' স্থলে ছিল—
"নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।" '

পৃ. ১৩৪, ১০ পংক্তির পর নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

কতলু খাঁ কহিলেন, "হস্ত।"

অভিপ্রায় বুঝিয়া ওসমান জগৎসিংহ-হস্ত গ্রহণ করিয়া তদুপরি কতলু খাঁর হস্ত স্থাপন করিলেন। জগৎসিংহের শরীরে অগ্নিবৃষ্টি হইল, কিন্তু নিবারণ করিলেন না।

পৃ. ১৩৯, পংক্তি ২৩, 'আয়েষা অধীরা।' কথাগুলির পর ছিল—
তাহা হইলে আমার হৃদয়ে ক্লেশ হইবে।

পৃ. ১৪০, পংক্তি ১৪, 'তাহাতে' স্থলে 'লোকে দোষিলে' ছিল।
পংক্তি ২৬, 'গ্রহণ করিও।' কথা দুইটির পর ছিল—
পিতার স্নেহের গুণে কন্যা হইয়াও যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছি তাহা ধনহীন দেশে রাজ্য বলিয়া গণিত; যদি তা আবনীর বংশে অগ্রাহ্য না হয়, তবে আসিয়া অধিকার করিও।

দানপত্র ঐ সিন্দুকে পাইবে।

পৃ. ১৪১, পংক্তি ৬-৭, 'এ পত্রের···ইহার উত্তর দিব।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—
এই মাত্র জানিও যে তোমাকে চিরকাল প্রাণাধিক সহোদরা ভগ্নী জ্ঞানে হৃদয় মধ্যে যত্ন করিব।

পৃ. ১৪২, পংক্তি ১৪, 'যাওয়া উচিত কি?' কথা কয়টির পর ছিল—
পরে দেখিলেন, যে লেখা পরিশুদ্ধ দেবনাগরাক্ষরে, সুতরাং ব্রাহ্মণের লিপি হওয়াই সম্ভব।

পৃ. ১৪৬, পংক্তি ৪, 'অমনই সরিয়া গেলেন।' কথাগুলির পর ছিল—
তিলোত্তমা ধরিতে গেলেন, জগৎসিংহ আরও সরিয়া গেলেন;

মদগ্রজ

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

উপহার

প্রদান করিলাম।

কপালকুণ্ডলা

[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত অষ্টম সংস্করণ হইতে]

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা চার আনা

আষাঢ় ১৩৪৫

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, রবিবার, (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭এ জুন) রাত্রি ৯টায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানা উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলা দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় রচনার একটি প্রামাণিক 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল ও Scholarly সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম—১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে—করা হইতেছে; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে আমি গৌরব বোধ করিতেছি।

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। তাঁহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্কিমের রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও উল্লেখযোগ্য।

শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে তাঁহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাঁহারা বহু

অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ও জীবনীর উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই সুযোগে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে মল্লিখিত সাধারণ ভূমিকা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার লিখিত বঙ্কিমের সাহিত্যপ্রতিভা বিষয়ক ভূমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বঙ্কিমের গ্রন্থপঞ্জী ও রাজকার্যের ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সঙ্কলিত বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বঙ্কিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা থাকিবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এই খণ্ডে বিভিন্ন ভাষায় বঙ্কিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে বিবৃতি দিবেন।

বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্বল থাকুক।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫

কলিকাতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভূমিকা

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁহার বয়স তখন মাত্র সাতাইশ বৎসর। এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক্‌ হইতে অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইতে থাকে। সকল সমালোচনার মধ্যে এই কথাটা সুস্পষ্ট হয় যে, বাংলা সাহিত্যে অভাবনীয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ঐ উপন্যাস এবং তাহার লেখককে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস পাঠে যে তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত, মনে প্রাণে ইংরেজীভাবাপন্ন সম্প্রদায়ও অভিভূত হইতে পারেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের ফলে এই সত্যটাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত ও ইয়ং বেঙ্গল কর্ত্তৃক ঘৃণিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া গদ্যসাহিত্যের—ঐ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি যুগসন্ধিক্ষণ। উপকরণ সবই ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র বাণীমন্দিরে মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত বিমুখ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতুক ও কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিতে হইল। এক মুহূর্ত্তে বিপুল সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিল। তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের পুরোধা 'রহস্য-সন্দর্ভ'-সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিলেন—

> বাঙ্গালীতে যত গদ্যকাব্য হইয়াছে, তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়াস্বরূপ বোধ হয়; এবং সেই বিদ্যাসুন্দরও সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশতের অনুকরণ মাত্র। ফলে এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা আমাদিগের এক প্রাচীনা কুটুম্বিনীর সদৃশ বোধ হন। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট আমরা বাল্যকালে "রূপকথা" শুনিতাম, এবং তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে কহিতেন "এক রাজার দুই রাণী, সো আর দো, সোকে রাজা বড় ভাল বাসিতেন, দোকে দেখিতে পারিতেন না।" তিনি এক দিবসের নিমিত্তেও এই উপষ্টম্ভের অন্যথা করিতেন না, নবা গ্রন্থকারেরাও সেই রূপ আদর্শের অন্যথা করিতে বিমুখ। রত্নাবলীতে শ্রীহর্ষ নায়কের আদর্শ স্বরূপে বৎসরাজকে পৌরুষ-বিহীন অল্প-বুদ্ধি রোদনশীল কামাতুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদবধি সেই ভাব নায়ক-মাত্রেতেই দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি অন্যথা দেখা যায় না। এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্যকাব্য-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগবিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে।...ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা, সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিতচর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। (২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৯-৪০)

ঐ কাম-কণ্টকিত নিষ্ফল গতানুগতিকতার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' যে আলোড়নের সৃষ্টি করিল, আজিকার দিনে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখনও আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হন নাই। 'কপালকুণ্ডলা' লিখিতে বসিয়া সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হন; ফলে মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে তিনি যে গদ্যকাব্য রচনা করেন, সম্পূর্ণ পরিণত বয়সেও তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর বৎসরেক কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে তিনি 'কপালকুণ্ডলা' মুদ্রিত করেন এবং এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। 'কপালকুণ্ডলা' তৎকালীন সমালোচকদের এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমের বহু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই 'কপালকুণ্ডলা'কেই বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম সংস্করণের মুদ্রণের তারিখ সংবৎ ১৯২৩ অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা কলিকাতার নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ইহা চারি খণ্ডে বত্রিশটি পরিচ্ছেদে ও ১২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র একটি পরিচ্ছেদ (৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, "গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে") পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা একত্রিশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সমালোচক গিঁরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> গ্রন্থখানি দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিতা অবস্থায় যন্ত্রস্থ হয় নাই; প্রায় এক বৎসর যাবৎ ইহা গ্রন্থকারের নিকটে থাকিয়া সম্যক্ সংশোধিত হইতে পারিয়াছিল।... শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়া মাত্র বঙ্কিম বাবুর যশোরাশি চতুর্দ্দিক বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতি পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরের নেগুয়াঁ মহকুমায় বদলি হন; বর্ত্তমানে এই মহকুমা নাই, কাঁথি মহকুমা হইয়াছে। নেগুয়াঁ কাঁথির সন্নিকট এবং দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের অনতিদূরে, সমুদ্রও ১৫।১৬ মাইলের বেশী দূরে নয়। বঙ্কিম-চন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, এই সময় এক জন সন্ন্যাসী কাপালিক মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৭৩-৭৪)।

এই কাপালিক তাঁহাকে পরবর্ত্তী কালে 'কপালকুণ্ডলা'-রচনায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবে; সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি, তৎসন্নিহিত অরণ্যপ্রকৃতির শোভা, রসুলপুর নদীর বিশালতা প্রভৃতির স্মৃতিও 'কপালকুণ্ডলা' পরিকল্পনার উপাদান জোগাইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁ হইতে খুলনায় বদলি হইবার কিছু দিন পরে দীনবন্ধু একবার তিন চার দিনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন, এই সময় বঙ্কিম তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যদি শিশুকাল হইতে কোনও স্ত্রীলোক ষোল বৎসর পর্য্যন্ত সমাজের বাহিরে সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কোনও কাপালিক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হইলে সমাজ-সংসর্গে আসে, তাহা হইলে তাহার বন্যপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না এবং পরবর্ত্তী কালেও কাপালিকের প্রভাব তাহার উপর থাকিবে কি না। দীনবন্ধু কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রহস্য করিয়া বলেন, যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, মেয়েটা চোর হইবে। পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলেন, কিছু কাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামিপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে। এই উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়।*

'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবি-চরিত্রও নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের খুল্ল-পিতামহের মুখে শ্রুত কোনও গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়।† কাঁঠালপাড়া হইতে নৌকাযোগে হুগলী কলেজে যাইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র এক দিবস কি ভাবে নিবিড় কুয়াশার মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কি ভাবে মাঝিদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, "বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা"-শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র তাহারও উল্লেখ করিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র গল্পারম্ভে কুজ্‌ঝটিকার সহিত ইহার সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন।‡

'কপালকুণ্ডলা'-রচনার প্রেরণা ও ইতিহাস সম্পর্কে ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই।

'কপালকুণ্ডলা'-সম্পর্কে বহু রসিক ও সমালোচক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বক্তৃতা ও ইতিহাসে 'কপালকুণ্ডলা' নানা ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' (ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত) ও 'কপালকুণ্ডলা চরিত্র সমালোচন' (ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত) প্রকাশিত

---

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃ. ৭৩-৭৫। † বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৫০-৫১। ‡ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৮-৪৯।

হইয়াছে। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ('বঙ্কিমচন্দ্র'), পূর্ণচন্দ্র বসু ('কাব্যসুন্দরী' ও 'সাহিত্য-চিন্তা'), হারাণচন্দ্র রক্ষিত ('বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম'), শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ('বঙ্কিমচন্দ্র'), শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ('A Critical study of the Life and Novels of Bankim Candra'), শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ('বঙ্কিমচিত্র') প্রভৃতি 'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যান ও চরিত্র লইয়া বহু তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইংরেজী বাংলা বহু সাময়িক পত্রের প্রবন্ধেও 'কপালকুণ্ডলা' আলোচিত হইয়াছে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর মুখোপাধ্যায় 'মৃণ্ময়ী' নাম দিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র পরিশিষ্ট-স্বরূপ একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন।

'কপালকুণ্ডলা' বিভিন্ন ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। ১৮৭৬-৭৭ সালে 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. এ. ডি. ফিলিপ্‌স্ লণ্ডন হইতে 'কপালকুণ্ডলা'র একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা (প্রফেসর ক্লেম কর্তৃক) জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডি. এন. ঘোষ কর্তৃক কলিকাতা হইতে 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন ইহার সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত ইহা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দী, গুজরাটী, তামিল ও তেলুগু ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে।

'Literary History of India' (1898, London) গ্রন্থে আর. ডব্লু. ফ্রেজার 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি—

The novel throughout moves steadily to its purpose. There is no over-elaboratio ., no undue working after effect ; everywhere there are signs of the work of an artist whose hand falters not as he chisels out his lines with classic grace. The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the 'Mariage de Loti' there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history of Western fiction......

(3rd. Imp., 1915, p. 423.)

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

সাগরসঙ্গমে

"Floating straight obedient to the stream."

Comedy of Errors.

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক জন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পার্‌বি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

এক জন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটী স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন ?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্ ; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটী স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্ত্তিত করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি ! কি ! মাঝি, কি হইয়াছে ?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, 'রোদ উঠেছে ! রোদ উঠেছে ! ঐ দেখ ডাঙ্গা !" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন ; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল

নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তট-মধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—✱—

উপকূলে

"Ingratitude! Thou marbel-hearted fiend!—"

King Lear.

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরি তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া এক জন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। এক জন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল

যে?" এক জন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধ মাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পর দিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবেক। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

বিজনে

"—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes."

Don Juan.

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অমুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগ-মণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটী, বনঝাউ, এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন;

কিন্তু নৌকা আইল না। নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্য্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; এখন প্রতিকূল স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল স্রোতের বেগাধিক্যবশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল—ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল; সূর্য্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত, তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক; অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার এক স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতিপদে হিংস্র পশু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। এক স্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের

সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখনও কখনও নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয় যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তূপশিখরে

"———সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি।"

মেঘনাদবধ

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে, বহুদূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না, কেন না, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। যথায় আলোক, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক?—হইতেও পারে; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষ লতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায়

শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া, অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল—তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা-পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থানত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য সময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত

আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন্।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি; মামনুসর; পরিতোষং তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন—পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল—কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল; এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটীর সর্ব্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফলমূল যাহা আছে আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া, কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

সমুদ্রতটে

"————যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥"

রঘুবংশ

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ

এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে, জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ, যত দূর দেখা গিয়াছে, তত দূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই— কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এ দিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধনে সক্ষম—এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্পপরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল - এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু। তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষুঃ যায়, তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড

বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবেক। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাললোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটী মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দৈবী মূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল;—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটী শব্দে, একটী রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে, বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

কাপালিকসঙ্গে

"কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ——"

রত্নাবলী

নবকুমার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন। শীঘ্র আর মস্তকোত্তোলন করিলেন না।

"এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র!" নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, নবকুমার আর একটী ব্যাপার দেখিতে পান নাই। সেই কুটীরমধ্যে তাঁহার আগমনপূর্ব্বাবধি একখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে—তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে, তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না—মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম্ম—এ স্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

নবকুমার সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুলগুলি কুটীরমধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বদিনের যাতায়াতের গুণে অদ্য অল্প কষ্টে পথ অনুভূত করিতে পারিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কত দূর প্রবল হইয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও তথায় কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সে স্থানের চারি দিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃথা অন্বেষণ মাত্র। মনুষ্যসমাগমের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটীরমধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিল না।

নবকুমার কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম?" কাপালিক কহিল, "নিজ ব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"

নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি—পাথেয় নাই; যদ্বিহিতবিধান প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেই হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।"

কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, "আমার সঙ্গে আগমন কর।" এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইতে পারিবে প্রত্যাশায় নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্পন্দহীন হইলেন। সেই আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বন্যদেবীমূর্ত্তি! পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ নিস্পন্দ। কোথা হইতে এ মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিল! নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে, নিষেধের বড় প্রয়োজন ছিল না। নবকুমার কি কথা কহিবেন? তিনি তথায় চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা উদাসীনের শ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কি কথা কহিল। নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল,

"কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।"

এই কথা সমাপ্ত করিয়াই উক্তিকারিণী সরিয়া গেলেন, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য তিষ্ঠিলেন না। নবকুমার কিয়ৎকাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইলেন; পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু রমণী কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই স্থিরতা পাইলেন না। মনে করিতে লাগিলেন—"এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে। যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? পলাইব বা কেন? সেদিন যদি বাঁচিয়াছি, আজিও বাঁচিব। কাপালিকও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।"

নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। কাপালিক কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন?"

কাপালিক পুনরাহ্বান করাতে বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে কুটীরও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র গৃহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন; এমত সময় তীরের তুল্য বেগে

পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল; গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

নবকুমারের কপালে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল, "কপালকুণ্ডলে!"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মানুষঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রধাবিত হইল—লুপ্ত সাহস পুনর্ব্বার আসিল। কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

অতিতীব্রবেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য লোকে তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিলে হস্তরক্ষা করা দূরে থাকুক—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গমাত্রও হেলিল না;—নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। নবকুমার দেখিলেন, বলে হইবে না। কৌশলের প্রয়োজন। "ভাল দেখা যাউক,"—এইরূপ স্থির করিয়া নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকপূজার আয়োজন রহিয়াছে, তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে—কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকে শব হইতে হইবে।

কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম তথায় পূর্ব্ব হইতেই আহরিত ছিল। কাপালিক তদ্দ্বারা নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার সাধ্যমত বল প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বল প্রকাশ কিছুমাত্র ফলদায়ক হইল না। তাঁহার প্রতীতি হইল যে, এ বয়সেও কাপালিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে। নবকুমারের বলপ্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল,

"মূর্খ! কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

কাপালিক নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সৈকতোপরি ফেলিয়া রাখিলেন। এবং বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। ততক্ষণ নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন—বন্ধন অতিদৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমি মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল, একবার বহুদিন অন্তর্হিত জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সৈকত-বালুকায় শুষিয়া গেল। কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমাপনান্তে বধার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কিন্তু যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না। আশ্চর্য্য! কাপালিক কিছু বিস্মিত হইল। তাহার নিশ্চিত মনে হইতেছিল যে, অপরাহ্ণে খড়্গ আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছিল এবং স্থানান্তরও করে নাই, তবে খড়্গ কোথায় গেল? কাপালিক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল। কোথাও পাইল না। তখন পূর্ব্বকথিত কুটীরাভিমুখ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ডাকাতেও কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না। তখন কাপালিকের চক্ষু লোহিত, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল। দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল; এই অবকাশে বন্ধনলতা ছিন্ন করিতে নবকুমার আর একবার যত্ন পাইলেন—কিন্তু সে যত্নও নিষ্ফল হইল।

এমত সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমিষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নবকুমার লাফ দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ✓

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—•—

অন্বেষণে

"And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak."

Lays of Ancient Rome.

এদিকে কাপালিক গৃহমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, না খড়্গ না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সৈকতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় আসিয়া দেখিল যে, নবকুমার তথায় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিয়া কাপালিক নবকুমারের অন্বেষণে ধাবিত হইল। কিন্তু বিজনমধ্যে পলাতকেরা কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। অন্ধকারবশতঃ কাহাকেও দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিতে পারিল না। এজন্য বাক্যশব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সময়ে কণ্ঠধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল না। অতএব বিশেষ করিয়া চারি দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রা়ে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল; তাহার অন্যতর পার্শ্বে বর্ষার জলপ্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না। শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোররবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্ব্বত-শিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আশ্রয়ে

"And that very night——
Shall Romeo bear thee to Mantua."

Romeo and Juliet.

সেই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুই জনে উর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্য পথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বর্ত্ম সম্বর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!" নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা পাদক্ষেপ মন্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়—কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।

কপালকুণ্ডলা পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া, নিভৃত কাননাভ্যন্তরে উপনীত হইলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সম্মুখে অন্ধকারে বনমধ্যে এক অত্যুচ্চ দেবালয়চূড়া লক্ষিত হইল; তন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটী গৃহও দেখা গেল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীরদ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ করাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "কে ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি?" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দ্বার খোল।"

উত্তরকারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল, সে ঐ দেবালয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী; বয়সে পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার বিরলকেশ মস্তক কর দ্বারা আকর্ষিত করিয়া আপন অধরের নিকট তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আনিলেন এবং দুই চারি কথায় নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকারী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত করতলন্যস্তশীর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে কহিলেন, "এ বড় বিষম ব্যাপার। মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন। যাহা হউক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে না। সে ব্যক্তি কোথায়?"

কপালকুণ্ডলা, "আইস" বলিয়া নবকুমারকে আহ্বান করিলেন। নবকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন, আহূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধিকারী তাঁহাকে কহিলেন, "আজি এইখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যুষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

ক্রমে কথায় কথায় অধিকারী জানিতে পারিলেন যে, এ পর্য্যন্ত নবকুমারের আহারাদি হয় নাই। ইহাতে অধিকারী তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশ্রামস্থানের প্রার্থনা জানাইলেন। অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,

"যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, "মা, কি ভাবিতেছ?"

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস, মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।

এই বলিয়া অধিকারী দীপহস্তে দেবালয়ের দ্বারে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মন্দিরমধ্যে মানবাকারপরিমিতা করাল-কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটী অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

"মা, দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন; বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর; কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতি চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকে লোকে ঘৃণা করিবে। তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান; গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"

অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন,

"তাহাই হউক। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন।"

অধি। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।

এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, "তবে বিবাহই হউক।"

এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া, অধিকারী নবকুমারের শয্যাসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! নিদ্রিত কি?"

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে; নিজদশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞা না।"

অধিকারী কহিলেন, "মহাশয়! পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ?"

নব। আজ্ঞা হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকলব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য্য, তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্ম্মা।

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছু দিন পিত্রালয়ে রহিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঠানেরা আকবরশাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবরশাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠান-সেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য; তাহারা নিরপরাধী

পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব; পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ লইয়া বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলিয়া আত্মীয় জনসমাজে এককালীন পরিত্যক্ত হইলেন। এ সময় নবকুমারের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না।

স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অধিক দিন স্বদেশে বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণেও বটে, এবং রাজপ্রসাদে উচ্চপদস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায়ও বটে, তিনি সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজমহলে যাওয়ার পরে শ্বশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোন উপায় রহিল না এবং এ পর্য্যন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। এই জন্য বলিতেছি, নবকুমারের "এক সংসারও" নহে।

অধিকারী এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, "কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। এই যে কন্যা আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—এ পরহিতার্থ আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ইহার বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্করস্বভাব। তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আপনার যে দশা ঘটিতেছিল, ইহার সেই দশা ঘটিবে। ইহার কোন উপায় বিবেচনা করিতে পারেন কি না?"

নবকুমার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমিও সেই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আপনি সকল অবগত আছেন—ইহার উপায় করুন। আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়,—তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" অধিকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাতুল। ইহাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণসংহার হইবে—অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না। ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

নব। সে কি উপায়?

অধি। আপনার সহিত ইহার পলায়ন। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট। আমার এখানে থাকিলে দুই এক দিনের মধ্যে ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্ব্বদা যাতায়াত। সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখিতেছি।

নবকুমার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন?"

অধি। এ কাহার কন্যা,—কোন্ কুলে জন্ম, তাহা আপনি কিছুই জানেন না। কাহার পত্নী,—কি চরিত্রা, তাহা কিছুই জানেন না। আপনি ইহাকে কি সঙ্গিনী করিবেন? সঙ্গিনী করিয়া লইয়া গেলেও কি আপনি ইহাকে নিজগৃহে স্থান দিবেন? আর যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কোথায় যাইবে?

নবকুমার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থা হইয়া থাকিবেন।"

অধি। ভাল। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয় স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন?

নবকুমার পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।"

অধি। ভাল। কিন্তু এই পক্ষান্তরের পথ যুবক যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে? আত্মীয় স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইহাকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই?

ঘটকরাজ ঘটকালিতে মন্দ নহেন।

নবকুমার কহিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।"

অধি। আমি সঙ্গে যাইব? ভবানীর পূজা কে করিবে?

নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে কি কোন উপায় করিতে পারেন না?"

অধি। একমাত্র উপায় হইতে পারে,—সে আপনার ঔদার্য্য গুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি? আমি কিসে অস্বীকৃত? কি উপায় বলুন?

অধি। শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি

সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি-মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া; ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন,

"আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যূষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

এই বলিয়া অধিকারী বিদায় হইলেন। গমনকালে মনে মনে করিলেন, "রাঢ়দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?"

নবম পরিচ্ছেদ

দেবনিকেতনে

"কণ্ব। অলং রুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।"

শকুন্তলা

প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য?"

নবকুমার কহিলেন, "আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে?"

ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত দিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি সম্প্রদান করিব।" অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটী খুঙ্গীর মধ্যে কয়েক খণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল। তাহাতে তাঁহার তিথি নক্ষত্রাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

তৎসমুদায় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজি যদিও বৈবাহিক দিন নহে—তথাচ বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধুলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। এক দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।"

নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় যত দূর সম্ভবে, তত দূর যথাশাস্ত্র কার্য্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিন জনে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালীপ্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটী অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটী পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন;—এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন,

"এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্, সে বিদায় হইতেছে।

অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছাইয়া কপালকুণ্ডলার কানে কানে কহিলেন, "মা! তুই জানিস্, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্।—সন্তান বলিয়া মনে করিস্।"

অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

রাজপথে

"——There—now lean on me :
Place your foot here———"

Manfred.

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য এক জন দাসী, এক জন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মনে স্থির জ্ঞান ছিল যে, প্রথম সরাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, কিন্তু সরাইও আপাততঃ দেখা যায় না। প্রায় রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইল। নবকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলেন। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণস্পর্শ হইল। পদভরে সে বস্তু খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার দাঁড়াইলেন; পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন; পুনর্ব্বার ঐরূপ হইল। পদস্পৃষ্ট বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ বস্তু তক্তাভাঙ্গার মত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমত অন্ধকার হয় না যে, অনাবৃত স্থানে স্থূল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটা বৃহৎ বস্তু পড়িয়া ছিল; নবকুমার অনুভব

করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা, অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ্ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্ন প্রকার পদার্থে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীরস্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল; তৎসঙ্গে দ্রবপদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, স্পন্দ নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। নিশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয়ত কোন জীবিত ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে?"

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, "আছি।"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা না কি?"

স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না—আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার এক জন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে; আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

নবকুমার অন্ধকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, যথার্থ ই একটী স্ত্রীলোক শিবিকাতে বস্ত্রদ্বারা দৃঢ় বন্ধনযুক্ত আছে। নবকুমার শীঘ্রহস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি?" স্ত্রীলোক কহিল, "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল; এজন্য পায়ে বেদনা আছে; কিন্তু বোধ হয়, অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।"

নবকুমার হাত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তৎসাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলিতে পারিবে কি?"

স্ত্রীলোক উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পশ্চাতে কেহ পথিক আসিতেছে দেখিয়াছেন?"

নবকুমার কহিলেন, "না।"

স্ত্রীলোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটি কত দূর ?"

নবকুমার কহিলেন, "কত দূর বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় নিকট।"

স্ত্রীলোক কহিল, "অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনার সঙ্গে চটি পর্য্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয়, কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে, চলিতে পারিব।"

নবকুমার কহিলেন, "বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।"

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।

যথার্থই চটি নিকটে ছিল। এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না। অনধিক বিলম্বে নবকুমার সমভিব্যাহারিণীকে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত গৃহস্বামীর বনিতা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশি-তরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

পান্থনিবাসে

"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা"

উদ্ধবদূত

যদি এই রমণী নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, "পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ

ছায়ার ন্যায় রূপবতী।” তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দ্দোষসুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরৌষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইঁহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা উষার ন্যায়। ইঁহার বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত, সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। “শ্যামা মা” বা “শ্যামসুন্দর” যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকর-লেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়-দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য, সেই উজ্জ্বলশ্যামললাট-বিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতিললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্কচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটী অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশমাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলমলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটী অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম

সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদীজলের ন্যায়, ইহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্যচক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।

সুন্দরী, নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ?"

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

"আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

সহজে এ কথা কহিলে, তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন,

"আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটীও না?"

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "একটীও না, এমত বলিতে পারি না।"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটী কি আপনার গৃহিণী?"

নব। কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমপ্রাদেশীয়া মুসলমানী।" নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ

পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে। কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন,

"মহাশয়, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন ;—আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায় ?"

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না ?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

সুন্দরীসন্দর্শনে

"————ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ!"

মেঘনাদবধ

নবকুমার গৃহস্বামীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন। অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্ব্বে একটী দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রদীপ আনিবার ক্ষণেক পরে ভৃত্যবেশী এক জন মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,

"সে কি, তোমাদিগের এত বিলম্ব হইল কেন ? আর সকলে কোথায় ?"

ভৃত্য কহিল, "বাহকেরা সকল মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহাদের গুছাইয়া আনিতে আমরা পাল্কীর পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। পরে ভগ্নশিবিকা দেখিয়া এবং আপনাকে না দেখিয়া আমরা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেহ কেহ সেই স্থানে আছে; কেহ কেহ অন্যান্য দিকে আপনার সন্ধানে গিয়াছে। আমি এদিকে সন্ধানে আসিয়াছি।"

মতি কহিলেন, "তাহাদিগকে লইয়া আইস।"

নফর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নবকুমার বিদায় চাহিলেন। তখন মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন?"

নব। ইহারই পরের ঘরে।

মতি। আপনার সে ঘরের কাছে একখানি পাল্কী দেখিলাম, আপনার কি কেহ সঙ্গী আছেন?

"আমার স্ত্রী সঙ্গে।"

মতিবিবি আবার ব্যঙ্গের অবকাশ পাইলেন। কহিলেন, "তিনিই কি অদ্বিতীয়া রূপসী?"

নব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

মতি। দেখা কি পাওয়া যায়?

নব। (চিন্তা করিয়া) ক্ষতি কি?

মতি। তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। আগরা গিয়া বলিতে চাহি, কিন্তু এখনই নহে—আপনি এখন যান। ক্ষণেক পরে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।

নবকুমার চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে অনেক লোক জন, দাস দাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল; তাহাতে এক জন দাসী। পরে নবকুমারের নিকট সংবাদ আসিল, "বিবি স্মরণ করিয়াছেন।"

নবকুমার মতিবিবির নিকট পুনরাগমন করিলেন। দেখিলেন, এবার আবার রূপান্তর। মতিবিবি, পূর্ব্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণমুক্তাদিশোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন; নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন। যেখানে যাহা ধরে—কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্ব্বত্র সুবর্ণমধ্য

হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূতনক্ষত্রমালা-ভূষিত আকাশের ন্যায়—মধুরায়ত শরীর সহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, এবং তাহাতে আরও সৌন্দর্য্যপ্রভা বর্দ্ধিত হইল। মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন,

"মহাশয়, চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার বলিলেন, "সে জন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।"

মতিবিবি। গহনাগুলি না হয়, দেখাইবার জন্য পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইলে বাঁচে না। এখন, চলুন।

নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যে দাসী শিবিকারোহণে আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল। ইহার নাম পেষমন্।

কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়া ছিলেন। একটী ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটী তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল; মতির মুখ গম্ভীর হইল;—অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না;—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, "ও কি হইতেছে?" মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

অলঙ্কারসমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

নবকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি! এ যে বহুমূল্য অলঙ্কার। আমি এ সব লইব কেন?"

মতি কহিলেন, "ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার আর আছে। আমি নিরাভরণা হইব না। ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন ব্যাঘাত করেন?"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীসঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে পেষমন্ মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল,

"বিবিজান্! এ ব্যক্তি কে?"

যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা শৌহর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—*—

শিবিকারোহণে

"————খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর কাঞ্চি।"

মেঘনাদবধ

গহনার দশা কি হইল, বলি শুন। মতিবিবি গহনা রাখিবার জন্য একটী রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুরা তাঁহার অল্প সামগ্রীই লইয়াছিল—নিকটে যাহা ছিল, তদ্ব্যতীত কিছুই পায় নাই।

নবকুমার দুই একখানি গহনা কপালকুণ্ডলার অঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্দ্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শিবিকাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে গহনার কৌটা দিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পশ্চাৎ করিয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকাদ্বার খুলিয়া চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। এক জন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, ভিক্ষা চাইতে চাইতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছু নাই, তোমাকে কি দিব?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছুই নাই?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, 'হই বই কি ?"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন।

ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাসদাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তখনই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া গহনা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

স্বদেশে

"শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ॥"

মেঘদূত

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা ; তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা ; কেন না, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।

অবস্থান্তরে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীলা তপস্বিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন কত দূর সন্তুষ্টিপ্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমনপক্ষে নিরাশ্বাস হইয়াছিল। সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন যে, এই সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতি মতই কহিয়াছিলেন ;—কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের

কল্পনাশক্তির অবমাননা করা হয়। প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন।—কখনও কখনও ব্যাঘ্রটার পরিমাণ লইয়া তর্ক বিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন, "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবেক—" কেহ কহিলেন, "না, প্রায় চৌদ্দ হাত।" পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকে অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে; পলাইতে পারিল না।"

যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন পুরমধ্যে এমত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল যে, কয় দিন তাহার ক্ষান্তি হইল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমত সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন।

যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই;—অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্য্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেরূপ দুর্দ্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত। তাঁহার

প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে!

আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব! চল পাঠক, তাহাকে দর্শন করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

অবরোধে

"কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥"

কুমারসম্ভব

সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়।

সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্ত্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু নগরের অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটী ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটী ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতালা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে; এখন একতালায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।

এই গৃহের ছাদের উপরে দুইটী নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে, এক দিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তপবনস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্য দিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে এক জন চন্দ্ররশ্মিবর্ণাভা; অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা। অপরা কৃষ্ণাঙ্গী; তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাহার উপরার্দ্ধে চারি দিক্ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল-শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্ররশ্মিবর্ণশোভিনী কপালকুণ্ডলা; তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী, তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখনও "বউ", কখনও আদর করিয়া "বন", কখনও "মৃণো" সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটী বিকট বলিয়া, গৃহস্থেরা তাঁহার

নাম মৃণ্ময়ী রাখিয়াছিলেন ; এই জন্যই "মৃণো" সম্বোধন। আমরাও এখন কখন কখন ইহাকে মৃণ্ময়ী বলিব।

শ্যামাসুন্দরী একটী শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

"বলে—পদ্মরাণি, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে, সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥"

"তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি?"

মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, "কেন, কি তপস্যা করিতেছি?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?"

মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল, আমার সাধটী পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না?

শ্যা। কেন? দেখিবি? যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "না।"

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥"

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "ভাল, বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোঁপায় ফুল দিলাম; কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম; কানে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?"

শ্যা। বল দেখি ফুলটী ফুটিলে কি সুখ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, "ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা—তাই যদি না হইল;—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?"

মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃণ্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন, কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, “যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।”

শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, “যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?”

মৃণ্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।”

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?

মৃণ্ময়ী কহিলেন, “শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।”

মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

ভূতপূর্ব্বে

"কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।"

রত্নাবলী

যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন, তখন মতিবিবি পথান্তরে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলি। মতির চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত। এরূপ চরিত্রের বিস্তারিত বৃত্তান্তে পাঠক মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

যখন ইঁহার পিতা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন, তখন ইঁহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা নাম হইল। মতিবিবি কোন কালেও ইঁহার নাম নহে। তবে কখনও কখনও ছদ্মবেশে দেশবিদেশ ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। ইঁহার পিতা ঢাকায় আসিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় অনেক নিজদেশীয় লোকের সমাগম। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হইয়া সকলের থাকিতে ভাল লাগে না। অতএব তিনি কিছু দিনে সুবাদারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার সুহৃদ্ অনেকানেক ওমরাহের নিকট পত্রসংগ্রহপূর্ব্বক সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন। আকবরশাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না; শীঘ্রই তিনি ইঁহার গুণগ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহ মধ্যে গণ্য হইলেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য

রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন; যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসাসম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান,—ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কাণাকাণি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেন, তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম এক জন। এক জন ওমরাহের কুলকলঙ্ক জন্মাইলে, পাছে আপন অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, সেই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্য্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন। রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী, যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্প দিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার করিবেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগিশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থিরপ্রতিজ্ঞা হইল, এমত নহে; রাজপুরবাসী সকলেরই উহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন বাহিত করিতেছিলেন, এমত সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবরশাহের কোষাধ্যক্ষ (আকৃতিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। এক দিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই দিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেই দিন

সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক এক জন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল ;—তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই, আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাহার প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন। লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদীয় সম্রাট্-কুলগৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য্য অস্তগামী হইল। এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। খস্রু তাঁহার পুত্র। এক দিন তাঁহার সহিত আকবরশাহের পীড়িত শরীর সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন হইতেছিল; রাজপুতকন্যা এক্ষণে বাদশাহপত্নী হইবেন, এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন, প্রত্যুত্তরে খস্রুর জননী কহিলেন, "বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্যজন্ম সার্থক বটে, কিন্তু যে বাদশাহ-জননী, সেই সর্ব্বোপরি।" উত্তর শুনিবামাত্র এক অপূর্ব্বচিন্তিত অভিসন্ধি লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে উদয় হইল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাই হউক না কেন? সেও ত আপনার ইচ্ছাধীন।" বেগম কহিলেন, "সে কি?" চতুরা উত্তর করিলেন, "যুবরাজপুত্র খস্রুকে সিংহাসন দান করুন।"

বেগম কোন উত্তর করিলেন না। সে দিন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইল না, কিন্তু কেহই এ কথা ভুলিলেন না। স্বামীর পরিবর্ত্তে পুত্র যে সিংহাসনারোহণ করেন, ইহা বেগমের অনভিমত নহে; মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। মানসিংহের ভগিনী আধুনিক তুর্কমান কন্যার যে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? লুৎফ-উন্নিসারও এ সঙ্কল্পে উদ্যোগিনী হইবার গাঢ় তাৎপর্য্য ছিল। অন্য দিন পুনর্ব্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। উভয়ের মত স্থির হইল।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা লুৎফ-উন্নিসা, বেগমের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। তিনি কহিলেন, "মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে; সেই রাজপুত জাতির চূড়া রাজা মানসিংহ, তিনি খস্রুর মাতুল; আর মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর; ইঁহারা দুই জনে উদ্যোগী হইলে, কে ইঁহাদিগের অনুবর্ত্তী না হইবে? আর কাহার বলেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবেন? রাজা মানসিংহকে এ কার্য্যে ব্রতী করা, আপনার ভার। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করা আমার ভার। আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চ হাজারি মন্সবদার হইবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।

শুধু এই লোভে লুৎফ-উন্নিসা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম প্রভৃতি আগ্রা দিল্লীর ওমরাহেরা লুৎফ-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। খাঁ আজিম যে জামাতার ইষ্টসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তিনি এবং আর আর ওমরাহগণ সম্মত হইলেন। খাঁ আজিম লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "মনে কর, যদি কোন অসুযোগে আমরা কৃতকার্য্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। অতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপনার কি পরামর্শ?" খাঁ আজিম কহিলেন, "উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেই স্থানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে। উড়িষ্যায় সৈন্য আমাদিগের হস্তগত থাকা আবশ্যক। তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যায় মন্সবদার আছেন;

আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্যই উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্ত্তব্য, তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।”

লুৎফ-উন্নিসা এ পরামর্শে সম্মত হইলেন। তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

পথান্তরে

“যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধ’রে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল॥”

নবীন তপস্বিনী

যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সে দিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষমনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমত কালে মতি সহসা পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“পেষমন্! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?”

পেষমন্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, “কেমন আর দেখিব?” মতি কহিলেন, “সুন্দর পুরুষ বটে কি না?”

নবকুমারের প্রতি পেষমনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল। যে অলঙ্কারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পেষমনের বিশেষ লোভ ছিল; মনে মনে ভরসা ছিল, এক দিন চাহিয়া লইবেন। সেই আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল, সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী, উভয়ের প্রতি তাঁহার দারুণ বিরক্তি। অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন,

"দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি ?"

সহচরীর মনের ভাব বুঝিয়া মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কি না ?"

পে। সে আবার কি ?

মতি। কেন, তুমি জান না যে, বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে, খস্রু বাদশাহ হইলে আমার স্বামী ওমরাহ হইবে ?

পে। তা ত জানি। কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্বামী ওমরাহ হইবেন কেন ?

মতি। তবে আমার আর কোন্ স্বামী আছে ?

পে। যিনি নূতন হইবেন।

মতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী, বড় অন্যায় কথা· ও কে যাইতেছে ?"

যাহাকে দেখিয়া মতি কহিলেন, "ও কে যাইতেছে ?" পেষমন্ তাহাকে চিনিল ; সে আগ্রানিবাসী, খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি। উভয়ে ব্যস্ত হইলেন। পেষমন্ তাহাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি আসিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একখানি পত্র দান করিল ; কহিল,

"পত্র লইয়া উড়িষ্যা যাইতেছিলাম। পত্র জরুরি।"

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশা ভরসা সকল অন্তর্হিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই,

"আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে। মৃত্যুকালেও আকবরশাহ আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে, কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন। তুমি খস্রুর জন্য ব্যস্ত হইবে না। এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমত চেষ্টার জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে।"

আকবরশাহ যে প্রকারে এ ষড়্‌যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে ; এ স্থলে সে বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

পুরস্কারপূর্ব্বক দূতকে বিদায় করিয়া, মতি পেষমন্‌কে পত্র শুনাইলেন। পেষমন্ কহিল,

"এক্ষণে উপায় ?"

মতি। এখন আর উপায় নাই।

পে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, ক্ষতিই কি? যেমন ছিলে, তেমনই থাকিবে, মোগল বাদশাহের পুরস্ত্রীমাত্রই অন্য রাজ্যের পাটরাণী অপেক্ষাও বড়।

মতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তাহা আর হয় না। আর সে রাজপুরে থাকিতে পারিব না। শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার সহিত জাহাঁগীরের বিবাহ হইবে। মেহের-উন্নিসাকে আমি কিশোর বয়োবধি ভাল জানি; একবার সে পুরবাসিনী হইলে সেই বাদশাহ হইবে; জাহাঁগীর বাদশাহ নামমাত্র থাকিবে। আমি যে তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ইহা তাহার অবিদিত থাকিবে না। তখন আমার দশা কি হইবে?

পেষমন্ প্রায় রোদনোম্মুখী হইয়া কহিল, "তবে কি হইবে?"

মতি কহিলেন, "এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্র[illegible] কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি [illegible] স্বামীর প্রতি যথার্থ [illegible] অনুরাগিণী না হইয়া [illegible] স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।"

পে। মেহের-উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী,—কালি বর্দ্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিণী হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।"

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষমন্ জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিতেছ কেন?"

মতি কহিলেন, "কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে।"

পে। কি নূতন ভাব?

মতি তাহা পেষমন্‌কে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—•—

প্রতিযোগিনী-গৃহে

"শ্যামাদন্যো নহি নহি নহি প্রাণনাথো মমা ।"

উদ্ধবদূত

এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মতিবিবি বর্দ্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন। শের আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন। যখন শের আফগান এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় অবস্থিতি করিতেন, তখন মতি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে একত্র হওয়ায় মেহের-উন্নিসা মনে ভাবিতেছেন, "ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন? বিধাতাই জানেন, আর সেলিম জানেন, আর কেহ যদি জানে ত সে এই লুৎফ-উন্নিসা; দেখি, লুৎফ-উন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?" মতিবিবিরও মেহের-উন্নিসার মন জানিবার চেষ্টা।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাসকীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তাৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্য গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা-রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা, তাঁহার সৌন্দর্য্য

অপেক্ষাও মোহময়ী ছিল। মতিও এ সকল গুণে হীনা ছিলেন না। অন্ত এই দুই চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন।

মেহের-উন্নিসা খাস কামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহের-উন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন, এবং তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্র কেমন হইতেছে ?" মতিবিবি উত্তর করিলেন, "তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।"

মেহে। তাই যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন ?

ম। অন্যের তোমার মত চিত্র-নৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।

মেহে। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

মেহের-উন্নিসা এই কথা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন।

ম। ভগিনি ! আজ মনের স্ফূর্ত্তির এত অল্পতা কেন ?

মেহে। স্ফূর্ত্তির অল্পতা কই ? তবে যে তুমি আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব ? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে ?

ম। সুখে কার অসাধ ? সাধ্য হইলে আমি কেন যাইব ? কিন্তু আমি পরের অধীন ; কি প্রকারে থাকিব ?

মেহে। আমার প্রতি তোমার ত ভালবাসা আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে। আসিয়াছ ত রহিতে পার না কেন ?

ম। আমি ত সকল কথাই বলিয়াছি। আমার সহোদর মোগলসৈন্যে মন্সবদার—তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বিপৎসংবাদ পাইয়া বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব করিয়াছি, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই, এই জন্য দুই দিন রহিয়া গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌঁছিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছ ?

মতি বুঝিলেন, মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করিতেছেন। মার্জ্জিত অথচ মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যেরূপ নিপুণ, মতি সেরূপ নহেন। কিন্তু অপ্রতিভ হইবার লোকও

নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "দিন নিশ্চিত করিয়া তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভবে? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিয়াছি; আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে।"

মেহের-উন্নিসা নিজ ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ? যুবরাজের, না তাঁহার মহিষীর?"

মতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়েরই অসন্তোষ হইতে পারে।"

মে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন; তাহার কত দূর?

ম। আমি ত সহজেই পরাধীনা। যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহা কেন নষ্ট করিব? বেগমের সহচারিণী বলিয়া অনায়াসে উড়িষ্যায় আসিতে পারিলাম, সেলিমের বেগম হইলে কি উড়িষ্যায় আসিতে পারিতাম?

মে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে, তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন?

ম। সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখনও করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।

মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে শের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না; বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থাকিও।"

মে। এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা?

মতি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা।"

এই কথা বলিয়া মতি মেহের-উন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না। মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন,

"বৈধব্যের আশঙ্কা! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না।"

ম। সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবরশাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?

মেহের-উন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন?"

মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?"

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই?"

মেহের-উন্নিসা গদ্গদস্বরে কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন, ভগিনি! অকস্মাৎ মনের কবাট খুলিল; তুমি এ কথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

মতি কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে, আমি বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল? তখন আমি কি উত্তর করিব?"

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "এই কহিও যে, মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।"

ইহা কহিয়া মেহের-উন্নিসা সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মতিবিবি চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মতিবিবিরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার চিত্তের ভাব মতিবিবি

জানিলেন ; মতিবিবির আশা ভরসা মেহের-উন্নিসা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যিনি পরে আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ, মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী ; মতিবিবি এ স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।

মনুষ্যহৃদয়ের বিচিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন। মেহের-উন্নিসার কথা আলোচনা করিয়া তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, কালে তাহাই যথার্থীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী ; অতএব নারীদর্পে এখন যাহাই বলুন, পথ মুক্ত হইলে মনের গতি রোধ করিতে পারিবেন না। বাদশাহের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

এ সিদ্ধান্তে মতির আশা ভরসা সকলই নির্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন ? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—*—

রাজনিকেতনে

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"

বীরাঙ্গনা কাব্য

মতি আগ্রায় উপনীতা হইলেন। আর তাঁহাকে মতি বলিবার আবশ্যক করে না। কয় দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসকল একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জাহাঁগীর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করিয়া, তাঁহার সহোদরের সংবাদ ও পথের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা মেহের-উন্নিসাকে বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্দ্ধমানের কথা শুনিয়া, জাহাঁগীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মেহের-উন্নিসার নিকট দুই দিন ছিলে বলিতেছ, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল ?" লুৎফ-উন্নিসা অকপটহৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের পরিচয় দিলেন। বাদশাহ শুনিয়া নীরবে রহিলেন ; তাঁহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাহাঁপনা ! দাসী শুভ সংবাদ দিয়াছে। দাসীর এখনও কোন পুরস্কারের আদেশ হয় নাই।"

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, "বিবি ! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।"

লু। জাহাঁপনা ! দাসীর কি দোষ ?

বাদ। দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি ; আরও পুরস্কার চাহিতেছ ?

লুৎফ-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।"

বাদ। আবার কি সাধ হইয়াছে ?

লু। আগে রাজাজ্ঞা হউক যে, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

বাদ। যদি রাজকার্য্যের বিঘ্ন না হয়।

লু। (হাসিয়া) একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্য্যের বিঘ্ন হয় না।

বাদ। তবে স্বীকৃত হইলাম ;—সাধটী কি শুনি।

লু। সাধ হইয়াছে একটী বিবাহ করিব।

জাহাঁগীর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ নূতনতর সাধ বটে। কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হইয়াছে ?"

লু। তা হইয়াছে। কেবল রাজাজ্ঞার অপেক্ষা। রাজার সম্মতি প্রকাশ না হইলে কোন সম্বন্ধ স্থির নহে।

বাদ। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি ? কাহাকে এ সুখের সাগরে ভাসাইবে অভিপ্রায় করিয়াছ ?

লু। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করিয়াছে বলিয়া দ্বিচারিণী নহে। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে।

বাদ। বটে ! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে ?

লু। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়া যাইব।

বাদ। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে ?

লু। যিনি হইবেন।

জাহাঁগীর মনে ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হইবেন, তাহা লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়াছেন। তৎকারণে নিজ মনোভিলাষ বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর হইতে চাহিতেছেন।

এইরূপ বুঝিয়া জাহাঁগীর দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "মহারাজের কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই ?"

বাদ। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি?

লু। কপালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিরাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটী ফুল ফুটে না!"

লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুইটী কমল ফুটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"

লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এইরূপ মনোবাঞ্ছা যে কেন জন্মিল, তাহা তিনি জাহাঁগীরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অনুভবে যেরূপ বুঝা যাইতে পারে, জাহাঁগীর সেইরূপ বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিলেন না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তাঁহার মনঃ মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—❋—

আত্মমন্দিরে

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥"

বিদ্যাপতি

লুৎফ-উন্নিসা আলয়ে আসিয়া প্রফুল্লবদনে পেষমন্‌কে ডাকিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণ-মুক্তাদি-খচিত বসন পরিত্যাগ করিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন যে, "এই পোষাকটী তুমি লও।"

শুনিয়া পেষমন্ কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পোষাকটী বহুমূল্যে সম্প্রতিমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কহিলেন, "পোষাক আমায় কেন? আজিকার কি সংবাদ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "শুভ সংবাদ বটে।"

পে। তা ত বুঝিতে পারিতেছি। মেহের-উন্নিসার ভয় কি ঘুচিয়াছে?

লু। ঘুচিয়াছে। এক্ষণে সে বিষয়ের কোন চিন্তা নাই।

পেষমন্ অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম।"

লু। যদি তুমি বেগমের দাসী হইতে চাও, তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলিয়া দিব।

পে। সে কি? আপনি কহিতেছেন যে, মেহের-উন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লু। আমি এমত কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।

পে। চিন্তা নাই কেন? আপনি আগ্রায় একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে সকলই বৃথা হইল।

লু। আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না।

পে। সে কি? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার শুভ সংবাদটা তবে কি, বুঝাইয়াই বলুন।

লু। শুভ সংবাদ এই যে, আমি এ জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

পে। কোথায় যাইবেন?

লু। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পারি যদি, কোন ভদ্র লোকের গৃহিণী হইব।

পে। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে, কিন্তু শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

লু। ব্যঙ্গ করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

পে। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার জন্মিল?

লু। কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশে এত দূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, সকলই ত প্রচুরপরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তজন্যও কখনও সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ্, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়,—প্রথমে নির্ম্মল, ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকত চর—মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন ?

লু। কেন হয় না, তা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি।

পে। কি বুঝিয়াছ ?

লু। আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত ; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি ?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নই ত কি ?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন ?

লু। মানস ত বটে। সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি ? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে ? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভালবাস না ? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে ?

লু। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন ?

পে। কেন ?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

চরণতলে

"কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে॥"

বীরাঙ্গনা কাব্য

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুন না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তক উন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটী অঙ্গুলিপরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটী অৰ্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্তপরিমিত হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম এক দিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূৰ্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম্মই এই যে, যে মানসিক কৰ্ম্ম যত অধিক বার করা যায়, সে কৰ্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কৰ্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। লুৎফ-উন্নিসা সেই মূৰ্ত্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহাপ্রবাহও অনিবাৰ্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসনলালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন

যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন, সকল বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়জন-সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।

এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ্‌রক্ষায় কোন যত্ন পাইলেন না; এই জন্যই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন। রাজপথের পথিকেরা দেখিলেন, অকস্মাৎ এই অট্টালিকা সুবর্ণখচিতবসনভূষিত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে হর্ম্ম্যসজ্জা অতি মনোহর। গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাম সর্ব্বত্র আমোদ করিতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তাদিখচিত গৃহশোভার্থ নানা দ্রব্য সকল স্থানেই আলো করিতেছে। এইরূপ সজ্জীভূত এক কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন; পৃথগাসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার আর দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার মনোরথ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার কথায় প্রকাশ হইবে।

নবকুমার কিছু ক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।"

নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিবে?" লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি, বল না?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ্, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী!"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ্ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

যবনীজার। নবকুমার এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী। ফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত রলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

"ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তিসকল অতল জলে াইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক বার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃপরিতৃপ্তি করিব।"

নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার হতে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ক্ষণেক নীরব। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ স্পন্দ রহিলেন। নবকুমারের বস্ত্রাগ্রভাগ ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "যাও।"

নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিসা তান্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুলতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া তরস্বরে কহিলেন,

"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি মায় ত্যাগ করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

"এ জন্মে নহে।" লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে মার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, কুমারের মুখপ্রতি অনিমিষ আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল; যে জয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য-শাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার য়দুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা া দিল; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র পিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি য়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক দয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।"

সেই কুপিতফণিনীমূর্ত্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। ক-উন্নিসার অনির্ব্বচনীয় দেহমহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর

কখনও দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী; দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল। এক দিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল; এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে, ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কে?"

যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, "আমি পদ্মাবতী।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া, আপন আলয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—*—

উপনগরপ্রান্তে

"—————I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat."

Macbeth.

কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফ-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না। এই দুই দিনে তিনি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সূর্য্য অস্তাচলগামী। তখন লুৎফ-উন্নিসা পেষমনের সাহায্যে বেশভূষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য বেশভূষা! রমণীবেশের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যে বেশভূষা করিলেন, তাহা মুকুরে দেখিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন, "কেমন, পেষমন্, আর আমাকে চেনা যায়?"

পেষমন্ কহিল, "কার সাধ্য?"

লু। তবে আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যেন কোন দাস দাসী না যায়।

পেষমন্ কিছু সঙ্কুচিতচিত্তে কহিল, "যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে একটী। জিজ্ঞাসা করি।" লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "কি?" পেষমন্ কহিল, "আপনার দশ্য কি?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। র তিনি আমার হইবেন।"

পে। বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন; সে নিবিড় বন, রাত্রি আগত; পনি একাকিনী।

লুৎফ-উন্নিসা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। গ্রামের যে জনহীন বনময় উপনগরপ্রান্তে নবকুমারের বসতি, সেই দিকে চলিলেন। প্রদেশে উপনীত হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক বড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহারই প্রান্তভাগে উপনীত য়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছু কাল বসিয়া যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত য়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার অনমুভূতপূর্ব্ব সহায় স্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে এক অনবরত সমানোচ্চারিত ষ্যকণ্ঠনির্গত শব্দ শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক্ চাহিয়া দেখিলেন যে, মধ্যে একটী আলো দেখা যাইতেছে। লুৎফ-উন্নিসা সাহসে পুরুষের অধিক; যথায় লো জ্বলিতেছে, সেই স্থানে গেলেন। প্রথমে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ব্যাপার ? দেখিলেন যে, যে আলো জ্বলিতেছিল, সে হোমের আলো; যে শব্দ শুনিতে ইয়াছিলেন, সে মন্ত্রপাঠের শব্দ। মন্ত্রমধ্যে একটী শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটী ম। নাম শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকট গিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন; পাঠক মহাশয় বহু কাল কপালকুণ্ডলার কোন বাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

শয়নাগারে

"রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।"

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী। যে দিন প্রদোষকালে লুৎফ-উন্নিসা কাননে, সে দিন কপালকুণ্ডলা অন্যমনে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয় সমুদ্রতীরে আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা যে কপালকুণ্ডলা দেখিয়াছেন, এ সে কপালকুণ্ডলা নহে। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে, এই ক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল ভুজঙ্গের ব্যূহতুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনায়ও শিল্পপারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কুসুমদামও পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুষ্পার্শে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণীমধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে মাথার উপরে সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-তরঙ্গরেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকাগুচ্ছ তদুপরি স্বেদবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্দ্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট

সকল ম্লান হয় নাই, অৰ্দ্ধচন্দ্ৰকৌমুদীবসনা ধরণীর অঙ্কে নৈশ কুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। ার পরিধানে শুক্লাম্বর; সে শুক্লাম্বর অৰ্দ্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্ল মেঘের । শোভা পাইতেছে।

বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন াশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন সখী শ্যামাসুন্দরী নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরের কথোপকথন তেছিল। তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কত দিন এখানে থাকিবেন?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি ঔষধটী য়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে ির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক্ দুই প্রহর রাত্রে এলো চুলে তুলিতে হয়। ভাই, মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও থ এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া নেব।

শ্যা। এক দিন যা হইয়াছে তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সে জন্য তুমি কেন চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা ত অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না। কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ- ভাল। দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা হবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির লই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বল্‌বে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না। আত্মকর্ম্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ওষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃণ্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমল স্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই; আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ও ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ওষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলো চুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি ালেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে িয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসসহকারে কপালকুণ্ডলার ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে শ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—✱—

কাননতলে

"—Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays ;
But here there is no light."

Keats.

সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। ার কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ওষধির ন চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র-সকল সে ণর প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া াছে। পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন- কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের গতিজনিত শব্দ; ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু

বহিতেছিল না; মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ু মাত্র; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমি-প্রণত শ্যামা লতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।

অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল; বন নিবিড়তর হইল, মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না। পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসাও পূর্ব্বে এই আলো দেখিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন, যথায় আলো জ্বলিতেছে, তথায় কেহ নাই। কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তা হেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটী ভগ্ন গৃহ আছে। গৃহটী ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য, তাহাতে একটীমাত্র ঘর। সেই ঘর হইতে মনুষ্যকথোপকথনশব্দ নির্গত হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দপদক্ষেপে গৃহ-সন্নিধানে গেলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বোধ হইল, দুই জন মনুষ্য সাবধানে কথোপকথন করিতেছে। প্রথমে কথোপকথন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে ক্রমে চেষ্টাজনিত কর্ণের তীক্ষ্ণতা জন্মিলে নিম্নলিখিত মত কথা শুনিতে পাইলেন।

এক জন কহিতেছে, "আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমার সাহায্য করিব না; তুমিও আমার সহায়তা করিও না।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্ব্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

প্রথমালাপকারী কহিল, "তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি। মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব; চতুর্দ্দিক্ একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।

বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষপ্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরু শ্বাস বহিতেছিল।

সমভিব্যাহারীর কথায় গৃহমধ্যস্থ এক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন, এবং আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিলেন। দেখিয়া ভীতা হইবেন, কি প্রফুল্লিতা হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী; সামান্য ধুতি পরা; গাত্র উত্তরীয়ে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক; মুখমণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণীদুর্ল্লভ তেজোগর্ব্ববিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্যাবশেষাত্মক মাত্র নহে, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয়-প্রচ্ছন্ন করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, ঈষৎ স্ফীত, মধ্যস্থলে একমাত্র শিরাপ্রকাশশোভিত। চক্ষু দুটী বিদ্যুত্তেজঃপরিপূর্ণ। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। কিন্তু এ রূপরাশিমধ্যে এক ভীষণ ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া পড়িয়াছিল। অন্তস্তল পর্য্যন্ত অন্বেষণক্ষম কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতিসঞ্চার হইল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

যদি এক বৎসর পূর্ব্বে হিজলীর কিয়াবনে কপালকুণ্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুণ্ডলা কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা! তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ?"

অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক্‌ হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ব্রাহ্মণবেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ?"

সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কাননমধ্যে তোমরা দুই জনে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে?"

ব্রাহ্মণবেশী কিছু কাল নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। যেন কোন নূতন ইষ্টসিদ্ধির উপায় তাঁহার চিত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কপালকুণ্ডলার হস্ত-ধারণ করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া ভগ্ন গৃহ হইতে কিছু দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী অতি মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলার কানের কাছে কহিলেন,

"চিন্তা কি? আমি পুরুষ নহি।"

কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃতা হইলেন। এ কথায় তাঁহার কতক বিশ্বাস হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্ন গৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে? সে তোমারই সম্বন্ধে।"

কপালকুণ্ডলার আগ্রহ অতিশয় বাড়িল। কহিলেন, "শুনিব।"

ছদ্মবেশিনী বলিলেন, "তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এই স্থানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশিনী ভগ্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কপালকুণ্ডলা কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছু ভয় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে একাকিনী অন্ধকার বনমধ্যে বসিয়া থাকাতে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। বিশেষ এই ছদ্মবেশী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে তথায় বসাইয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত সুযোগ পাইয়া আপনার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণবেশীর প্রত্যাগমনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর বসিতে পারিলেন না। উঠিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে

রিলেন না। শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার
য়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া
ন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার
চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন।
ায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা
ল না। অতএব দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে
ইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত
লেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি ভীষণরবে
ঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন
ৌড়িল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি
পালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং
শনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি
ড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণ-
মি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ
রিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক
র্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই
াহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

স্বপ্নে

"I had a dream, which was not all a dream."

Byron.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন,
ারে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ

সময় করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?

সে রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আইসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপালকুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। প্রবলবায়ুতাড়িত বারিধারাপরি-সিঞ্চিত জটাজূটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল অন্ধকার মধ্যেও চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; তৎকৃত ভৈরবীপূজা, নবকুমারের বন্ধন, এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল। শ্যামার ওষধিকামনা, নবকুমারের নিষেধ, তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার তিরস্কার, তৎপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়া-ছিলেন, তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ; সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

পূর্ব্ব দিকে উষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিম গগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে; আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণমেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে, স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল; বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গমধ্য হইতে এক জন জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে

হর হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী
ল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি
তালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে
বেশ করিল।

ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন;
খিলেন, প্রভাত হইয়াছে—গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে; তন্মধ্য দিয়া বসন্তবায়ুস্রোতঃ প্রবেশ
রিতেছে; মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। সেই গবাক্ষের উপর
তকগুলি মনোহর বন্যলতা সুবাসিত কুসুমসহিত দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাব-
তঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে
হার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির হইল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র; পড়িতে
রিতেন। নিম্নোক্ত মত পাঠ করিলেন।

"অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ
ম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে।

অহং ব্রাহ্মণবেশী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃতসঙ্কেতে

"——————I will have grounds
More relative than this."

Hamlet.

কপালকুণ্ডলা সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনন্যচিন্তা হইয়া কেবল ইহাই বিবেচনা
করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ বিধেয় কি না। পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে
রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার

মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই ; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই—পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল ; বিশেষ ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ কি না, তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং সে সঙ্কোচ অনাবশ্যক, কিন্তু এ সাক্ষাতে মঙ্গল, কি অমঙ্গল জন্মিবে, তাহাই অনিশ্চিত বলিয়া কপালকুণ্ডলা এত দূর সঙ্কোচ করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথোপকথন, পরে কাপালিকের দর্শন, তৎপরে স্বপ্ন, এই সকল হেতুতে কপালকুণ্ডলার নিজ অমঙ্গল যে অদূরবর্ত্তী, এমত সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল। সেই অমঙ্গল যে কাপালিকের আগমনসহিত সম্বন্ধমিলিত, এমত সন্দেহও অমূলক বোধ হইল না। এই ব্রাহ্মণবেশীকে তাহারই সহচর বোধ হইতেছে—অতএব তাহার সহিত সাক্ষাতে সেই আশঙ্কার বিষয়ীভূত অমঙ্গলে পতিতও হইতে পারেন। সে ত স্পষ্ট বলিয়াছে যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই পরামর্শ হইতেছিল। কিন্তু এমতও হইতে পারে যে, ইহা হইতে তন্নিরাকরণ-সূচনা হইবে। ব্রাহ্মণকুমার এক ব্যক্তির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিল, সে ব্যক্তিকে এই কাপালিক বলিয়া বোধ হয়। সেই কথোপকথনে কাহারও মৃত্যুর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছিল ; নিতান্ত পক্ষে চিরনির্ব্বাসন। সে কাহার ? ব্রাহ্মণবেশী ত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই কুপরামর্শ হইতেছিল। তবে তাহারই মৃত্যু বা তাহারই চিরনির্ব্বাসন কল্পনা হইতেছিল। হইলই বা ! তার পর স্বপ্ন, —সে স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি ? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, "নিমগ্ন কর।" কার্য্যেও কি সেইরূপ বলিবেন ? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন ; তাহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্ত-রূপরাশিদর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসি-পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তিভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ম্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বমত বনাভিমুখে ত্রা করিলেন। কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। নি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল। — Omen

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা এক কথা বিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী কোন্ স্থানে ক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন? এই জন্য পুনর্ব্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল। গৃহে ত্যাবর্ত্তন করিয়া যে স্থানে প্রাতে লিপি রাখিয়াছিলেন, সে স্থান অন্বেষণ করিলেন, সে নে লিপি পাইলেন না। স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে রাখিবার জন্য বরীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া সন্ধান করিলেন। গুলিতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী আলুলায়িত করিলেন, তথাপি সে লিপি পাইলেন । তখন গৃহের অন্যান্য স্থানে তত্ত্ব করিলেন। কোথাও না পাইয়া, পরিশেষে পূর্ব্ব-ক্ষাৎস্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে শাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়া-লের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

গৃহদ্বারে

"Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list."

Othello.

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি বরীবন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারেন ই। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। কবরী হইতে পত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া কুমার বিস্মিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা কার্য্যান্তরে গেলে লিপি তুলিয়া বাহিরে গিয়া ঠ করিলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া একই সিদ্ধান্ত সম্ভবে। "যে কথা কাল শুনিতে

চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে।” সে কি? প্রণয়-কথা? ব্রাহ্মণবেশী মৃণ্ময়ীর উপপতি? যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রের বৃত্তান্ত অনবগত, তাহার পক্ষে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভবে না।

পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে, অথবা অন্য কারণে, যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করে; দৃষ্টিলোপ করে; অন্ধকার করে; পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জ্বলিতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটী শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দংশন করে, পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; শেষে প্রচণ্ড রবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জ্বালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্ব্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধসত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি এক দিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যন্ত্রণার প্রথম বেগের শমতা হইলে নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিন্তর্ত্তব্যসম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজি তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, কপালকুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না; আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?— এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

এই স্থির করিয়া কপালকুণ্ডলার বহির্গমন প্রতীক্ষায় তিনি খড়্‌কীদ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কপালকুণ্ডলা বহির্গতা হইয়া কিছু দূর গেলে নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে কপালকুণ্ডলা লিপির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিয়া নবকুমারও সরিয়া গেলেন। শেষে কপালকুণ্ডলা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া কিছু দূর গমন করিলে নবকুমার আবার তদনুগমনে বাহির হইতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশ আবৃত করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইয়া, জানিতে নবকুমারের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। কেবল কপালকুণ্ডলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব পথমুক্তির জন্য আগন্তুকের বক্ষে হস্ত দিয়া তাড়িত করিলেন; কিন্তু তাহাকে সরাইতে পারিলেন না।

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।"

আগন্তুক কহিল, "কে আমি, তুমি কি চেন না?"

শব্দ সমুদ্রনাদবৎ কর্ণে লাগিল। নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সে পূর্ব্বপরিচিত জটাজূটধারী কাপালিক।

নবকুমার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভীত হইলেন না। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল—কহিলেন,

"কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাইতেছে?"

কাপালিক কহিল, "না।"

জ্বালিতমাত্র আশার প্রদীপ তখনই নির্ব্বাণ হওয়াতে নবকুমারের মুখ পূর্ব্ববৎ মেঘময় অন্ধকারাবিষ্ট হইল। কহিলেন, "তবে তুমি পথ মুক্ত কর।"

কাপালিক কহিল, "পথ মুক্ত করিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—অগ্রে শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "তোমার সহিত আমার কি কথা? তুমি আবার আমার প্রাণনাশের জন্য আসিয়াছ? প্রাণ গ্রহণ কর, আমি এবার কোন ব্যাঘাত করিব না। তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। যে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল। কাপালিক! আমাকে এবার অবিশ্বাস করিও না। আমি এখনই আসিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব।"

কাপালিক কহিল, "আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। বাটীর ভিতরে চল, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "এক্ষণে নহে। সময়ান্তরে তাহা শ্রবণ করিব, তুমি এখন অপেক্ষা কর; আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—সাধন করিয়া আসিতেছি।"

কাপালিক কহিল, "বৎস! আমি সকলই অবগত আছি; তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে; সে যথায় যাইবে, আমি তাহা অবগত আছি। আমি তোমাকে সে স্থানে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইব। যাহা দেখিতে চাহ, দেখাইব—এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই। আইস।"

এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং স্বয়ংও উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনরালাপে

"তদ্গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।"

কুমারসম্ভব

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কাপালিক এ সকল বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া

কহিলেন, "বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্ব্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

পরে কহিতে লাগিলেন, "ভূপতিত হইয়াই যে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার করদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, আর আর অঙ্গ অভগ্ন আছে, এমত নহে, আমি পতনমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। প্রথমে অবিচ্ছেদে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। পরে ক্ষণে সজ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান রহিলাম। কয় দিন যে আমি এ অবস্থায় রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, দুই রাত্রি এক দিন হইবে। প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী—" বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটী করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এত দিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।' তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যত দিন না পার, আমার পূজা করিও না।'

"কত দিনে বা কি প্রকারে আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে এক জন সহকারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্ম্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্য্যে সহচর হয় না। বহু সন্ধানে আমি পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বাহুবলের অভাব হেতু ভবানীর আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই। কেবল মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি মাত্র। কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণ-কুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।

"বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সেও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা; অতএব তুমি আমাকে সে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা হইবে; পবিত্র কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।"

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুই উত্তর করিলেন না। কাপালিক তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—*—

সপত্নীসম্ভাষে

"Be at peace; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love."

Lucretia.

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ভগ্নগৃহমধ্যে গেলেন। তথায় ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। যদি দিনমান হইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার মুখকান্তি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন যে, "এখানে কাপালিক আসিতে পারে, এখানে কোন কথা অবিধি। স্থানান্তরে আইস।" বনমধ্যে একটী অল্পায়ত স্থান ছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি; মধ্যে পরিষ্কার; তথা হইতে একটী পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে তথায় লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণবেশী কহিলেন,

"প্রথমতঃ আত্মপরিচয় দিই। কত দূর আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবে। যখন তুমি স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ হইতে

আসিতেছিলে, তখন পথিমধ্যে রজনীযোগে এক যবনকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তোমার কি তাহা মনে পড়ে?"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়াছিলেন?"

ব্রাহ্মণবেশধারিণী কহিলেন, "আমিই সেই।"

কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া কহিলেন, "আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে—আমি তোমার সপত্নী।"

কপালকুণ্ডলা চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, "সে কি?"

লুৎফ-উন্নিসা তখন আনুপূর্ব্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। বিবাহ, জাতিভ্রংশ, স্বামী কর্ত্তৃক ত্যাগ, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রাত্যাগ, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত দিবস প্রদোষে ছদ্মবেশে কাননে আগমন, হোমকারীর সহিত সাক্ষাৎ, সকলই বলিলেন। এই সময় কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়াছিলে?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে।"

কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে?"

লুৎফ-উন্নিসা। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যদি আমার পরামর্শমতে কাজ কর, তবে তোমা হইতেই আমার কামনা সিদ্ধ হইবে—অথচ তোমার মঙ্গল সাধন হইবে।

কপা। হোমকারীর মুখে তুমি কাহার নাম শুনিয়াছিলে?

লু। তোমারই নাম। তিনি তোমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, ইহা জানিবার জন্য প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। যতক্ষণ না তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ততক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। হোমান্তে তোমার নামসংযুক্ত হোমের অভিপ্রায় ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার অমঙ্গলসাধনই হোমের প্রয়োজন। আমারও সেই প্রয়োজন। ইহাও তাঁহাকে জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষ পরামর্শ জন্য তিনি আমাকে ভগ্ন গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় আপন মনোগত

ব্যক্ত করিলেন। তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে আমার এত দূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না। এই সময়ে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। বোধ করি, কিছু শুনিয়া থাকিবে।

কপা। আমি ঐরূপ বিতর্কই শুনিয়াছিলাম।

লু। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া কিছু উপদেশ দিতে চাহিল। শেষটা কি দাঁড়ায়, ইহা জানিয়া তোমায় উচিত সংবাদ দিব বলিয়া তোমাকে বনমধ্যে অন্তরালে রাখিয়া গেলাম।

কপা। তার পর আর ফিরিয়া আসিলে না কেন?

লু। তিনি অনেক কথা বলিলেন, বাহুল্যবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিলম্ব হইল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে, অনুভব করিতে পারিতেছ?

কপা। আমার পূর্ব্বপালক কাপালিক।

লু। সেই বটে। কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্তি, তথায় প্রতিপালন, নবকুমারের আগমন, তৎসহিত তোমার পলায়ন, এ সমুদয় পরিচয় দিলেন। তোমাদের পলায়নের পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না। তাহা তোমার গোচরার্থ বিস্তারিত বলিতেছি।

এই বলিয়া লুৎফ-উন্নিসা কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন, সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিলেন,

"কাপালিকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন। বাহু বলহীন, এই জন্য পরের সাহায্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল। আমি এ পর্য্যন্ত এ দুষ্কর্ম্মে স্বীকৃত হই নাই। এ দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না। বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ কার্য্য নিতান্ত অস্বার্থপর হইয়া করি নাই। তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি করিব?"

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন,

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন, "ভগিনি! তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার এক জন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্দ্ধমানে কোন অতিপ্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ।—তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা এরূপ মনঃসংযোগ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন যে, সম্মুখবিঘ্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। যে বন্য পথ তাঁহাদিগের আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়াছিল, সে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কাপালিক ও নবকুমার তাঁহাদিগের প্রতি যে করাল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই।

নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তত দূর হইতে তাহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতিগোচর হইল না। মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে? সংসাররচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

নবকুমার দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না। আবার দেখিলেন যে, সেই কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে।

কপালকুণ্ডলার কেশরাশি ঈদৃশ আয়তনশালী, এবং লঘু স্বরে কথোপকথনের প্রয়োজনে উভয়ে এরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়া ছিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

কাপালিক ইহা দেখিয়া নিজে কটিবিলম্বী এক নারিকেলপাত্র বিমুক্ত করিয়া কহিল, "বৎস! বল হারাইতেছ, এই মহৌষধ পান কর, ইহা ভবানীর প্রসাদ। পান করিয়া বল পাইবে।"

কাপালিক নবকুমারের মুখের নিকট পাত্র ধরিল। তিনি অন্যমনে পান করিয়া দারুণ তৃষা নিবারণ করিলেন। নবকুমার জানিতেন না যে, এই সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। পান করিবামাত্র সবল হইলেন।

এ দিকে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন,

"ভগিনি! তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই; তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সেও আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছি, তুমি দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছ। এক্ষণে নিকটে কিছুই নাই। কল্যকার অন্য প্রয়োজন ভাবিয়া কেশমধ্যে একটী অঙ্গুরীয় আনিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে পাপ প্রয়োজনসিদ্ধির আবশ্যক হইল না। এই অঙ্গুরীয়টী তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যুবনী ভগিনীকে মনে করিও। আজি যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে, কহিও, লুৎফ-উন্নিসা দিয়াছে। ইহা কহিয়া লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলি হইতে বহুধনে ক্রীত এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন। নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন; কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার অদৃশ্য পথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—*—

গৃহাভিমুখে

"No spectre greets me—no vain shadow this."

Wordsworth.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জ্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ক্রটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে? নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে?" প্রশ্ন করিতেছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সংসারের অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে।

কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকটভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি! গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে— বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখনও কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

নবকুমার বা কাপালিক এ সব কিছুই দেখেন নাই। নবকুমার সুরাগরলপ্রজ্বলিত হৃদয়—কপালকুণ্ডলার ধীর পদক্ষেপ অসহিষ্ণু হইয়া সঙ্গীকে কহিলেন, "কাপালিক!"

কাপালিক কহিল, "কি?"

"পানীয়ং দেহি মে।"

কাপালিক পুনরপি তাঁহাকে সুরা পান করাইল।

নবকুমার কহিলেন, "আর বিলম্ব কি?"

কাপালিক উত্তর করিল, "আর বিলম্ব কি?"

নবকুমার ভীম নাদে ডাকিলেন, "কপালকুণ্ডলে!"

কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,

"তোমরা কে? যমদূত?"

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "না না পিতা, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?"

নবকুমার দৃঢ় মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র, মধুময় স্বরে কহিলেন,

"বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

—*—

প্রেতভূমে

"বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্॥"

রঘুবংশ

চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে

গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আরও বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাঁটার সময়ে জল থাকে না। এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ; জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরতবায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাত-জনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল। শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে কচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নাত করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশান-কলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়া ছিল—হতভাগার কেহ সৎকারও করে নাই। দুই জনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক্ বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশুসকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ?"

নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। অতি গম্ভীর স্বরে নবকুমার উত্তর করিলেন,

"ভয়ে, মৃণ্ময়ি? তাহা নহে।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্ন কালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?

নবকুমার কহিলেন, "ভয় নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

আবার সেই কণ্ঠ!

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃণ্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃণ্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদু স্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক পদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, কপালকুণ্ডলা একটা আড়রির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ, —সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃণ্ময়ি!—না!—" এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না।

চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদী-প্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?

সম্পূর্ণ

বিভিন্ন সংস্করণে 'কপালকুণ্ডলা'র পাঠভেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ মিলাইয়া দেখিতে গিয়া পরিবর্ত্তন-বাহুল্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এ বিষয়ে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> তাঁহার মতামত চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল ছিল, সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রতি সংস্করণে প্রচুরপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইত। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে 'ইন্দিরা' উপন্যাসটি আবার rewrite করিবেন, এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩৯।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ মিলাইয়া দেখিলে উপরোক্ত উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপিতেও আমরা অনেক কাটাকুটি লক্ষ্য করিয়াছি। 'কপালকুণ্ডলা' তাঁহার দ্বিতীয় মুদ্রিত উপন্যাস; ইহাতেও প্রথম ও পরবর্ত্তী সংস্করণে পার্থক্য আছে। তবে 'কপালকুণ্ডলা'র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বঙ্কিমের সমসাময়িক সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন—

> অদ্যাবধি ইহার সাতটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ভাল করিয়া দেখিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। সম্প্রতি যে সংস্করণ প্রকাশিত হইল, তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। পরিবর্ত্তন অতি সামান্য এবং সেই সামান্য পরিবর্ত্তনও গ্রন্থের একটি মাত্র চরিত্র—নবকুমারকে লইয়া।—'বঙ্কিমচন্দ্র'। কপালকুণ্ডলা (১৮৮৮), পৃ. ৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কপালকুণ্ডলার আটটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল; ১ম—সংবৎ ১৯২৩ (১৮৬৬), ২য়—সংবৎ ১৯২৬ (১৮৬৯), ৩য়—১৮৭৪, ৪র্থ—১৮৭৮, ৫ম—১৮৮১, ৬ষ্ঠ—১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪), ৭ম—১৮৮৮, ও ৮ম—১৮৯২। তন্মধ্যে আমরা ১ম, ৩য়, ৭ম ও ৮ম সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি। শব্দ ও বিরামচিহ্নের পরিবর্ত্তন, স্থলে স্থলে বাক্য বা বাক্যাংশ যোগ বা বাক্যের আংশিক পরিবর্ত্তন, শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ পরিত্যাগ—অল্পবিস্তর পরবর্ত্তী প্রত্যেক সংস্করণেই আছে; শেষের দুই সংস্করণে পার্থক্য যৎসামান্য এবং ১ম ও ৩য় সংস্করণও প্রায় অভিন্ন। যাহাতে গল্পের ধারার, কোনও বিশেষ চরিত্রের অথবা ঘটনা-সংস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এমন খুঁটিনাটি সামান্য পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের শব্দ ও ভাষাগত অশুদ্ধিও পরবর্ত্তী সংস্করণে যে ভাবে শুদ্ধীকৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন।

'কপালকুণ্ডলা' প্রথম সংস্করণ যেরূপ ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু নূতন অংশ সামান্যই যোজিত হইয়াছে। একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ (চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি পরিচ্ছেদ অংশত বাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও অষ্টম সংস্করণের পার্থক্যই নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিজনে। পৃ. ১০, ১২ পংক্তির পর বাদ পড়িয়াছে—

পর্ব্বততলচারী ব্যক্তির উপরে শিখরখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহাকে যেমন একেবারে নিষ্পেষিত করে, এ সিদ্ধান্ত জন্মমাত্র নবকুমারের হৃদয়, সেইরূপ একেবারে নিষ্পেষিত হইল।

এ সময়ে, নবকুমারের মনের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সঙ্গিগণ প্রাণে নষ্ট হইয়া থাকিবেক, এরূপ সন্দেহে পরিতাপযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু আপনার বিপন্ন অবস্থার সমালোচনায় সে শোক শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। বিশেষ যখন মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন ক্রোধের বেগে শোক দূর হইতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কাপালিকসঙ্গে। পৃ. ১৭, ২ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

জগতীয় পদার্থ বা ঘটনা সকলের সম্বন্ধ বিচারাকাঙ্ক্ষী চিত্তমাত্রেরই এক এক দিন কোন বিচিত্র ঘটনায় চমৎকার হেতুক মনোবৃত্তি সকল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; পূর্ব্বের যাবতীয় স্থির-সিদ্ধান্ত সকল উন্মূলিত হয়। নবকুমারের তাহাই হইল। সুতরাং তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে নিশ্চেষ্ট হইবেন, তাহার বিচিত্র কি!

প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কাপালিকসঙ্গে। পৃ. ১৮, ২৩ পংক্তির পর—

যখন লোকে ইতিকর্ত্তব্য স্থির না করিতে পারে, তখন তাহাদিগকে যে দিকে প্রথম আহূত করা যায়, সেই দিকেই প্রবৃত্ত হয়।

প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ—আশ্রয়ে। পৃ. ২২, ৬ পংক্তি 'উপায় নাই।' ইহার পর ৮ পংক্তি 'দুঃখ করিতেন না।' পর্য্যন্ত অংশ নূতন সংযোজিত। প্রথম সংস্করণে ছিল—

কিন্তু অন্ধকারে বনমধ্যে রমণীকে সকল সময় দেখা যায় না; যুবতী এক দিকে ধাবমানা হইলে, নবকুমার অন্য দিকে যান; রমণী কহিলেন, "আমার অঞ্চল ধর।" নবকুমার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া চলিলেন।

প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ—আশ্রমে। পৃ. ২৪, ২৫ পংক্তি 'তাহা জান না।'র পর—

স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ না করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না, তাহা তুমি জান না। আমিও তন্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি। মা জগদম্বা জগতের মাতা। ইনি সতীর সতীত্ব—সতীপ্রধানা। ইনি সতীত্বনাশসংযুক্ত পূজা কখন গ্রহণ করেন না। এই জন্যই আমি মহাপুরুষের অনভিমত সাধিতেছি। তুমি পলায়ন করিলে কদাপি কৃতঘ্ন হইবে না। কেবল এ পর্য্যন্ত সিদ্ধির সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। আজি তুমি যে কার্য্য করিয়াছ—তাহাতে প্রাণেরও আশঙ্কা। এই জন্য বলিতেছি পলায়ন কর। ভবানীরও এই আজ্ঞা। অতএব যাও। আমার এখানে রাখিবার উপায় থাকিলে রাখিতাম; কিন্তু সে ভরসা যে নাই, তাহা ত জান।

উপরি-উক্ত পংক্তিগুলির পরিবর্ত্তে ২৬ পংক্তি হইতে ২৮ পংক্তি (এই বলিয়া…… ভয় হইল।) দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ—দেবনিকেতনে। প্রথমেই একটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হইয়াছে; পৃ. ২৮, ১৪ পংক্তির পর এইরূপ ছিল—

পুরুষ পাঠক, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি যদি কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে দেখিতেন, তবে এক দিনে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত হইতেন কি না, বলিতে পারি না। প্রাণরক্ষা মাত্র উপকারের অনুরোধে তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন কি না বলিতে পারি না। বোধ করি নহে, কেন না কপালকুণ্ডলা রুক্ষকেশী সন্ন্যাসিনী মাত্র। কিন্তু নবকুমার পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করেন;—এ পৃথিবীর কাঠুরিয়ারা সন্ন্যাসিনীদিগের মর্ম্ম বুঝে। কৃতঘ্ন সহযাত্রী-দিগের জন্য নবকুমার মাথায় কাষ্ঠভার বহিয়াছিলেন,—কৃতোপকারিণী সন্ন্যাসিনীর জন্য যে অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে চাহিবেন, তাহার বিচিত্র কি?

দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ—রাজপথে। পৃ. ৩০, প্রথম অনুচ্ছেদের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে—

কোন জার্ম্মান লেখক বলিয়াছেন, "মনুষ্যের জীবন কাব্যবিশেষ।" কপালকুণ্ডলার জীবনকাব্যের এক সর্গ সমাপ্ত হইল। পরে কি হইবে?

যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য অন্ধ না হইত, তবে সংসারযাত্রা একেবারে সুখহীন হইত। ভাবী বিপদের সম্ভাবনা নিশ্চিত দেখিতে পাইয়া, কোন সুখেই কেহ প্রবৃত্ত হইত না। মিল্টন যদি জানিতেন তিনি অন্ধ হইবেন, তবে কখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন না; শাহাজাহান যদি

জানিতেন, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাচীন বয়সে কারাবদ্ধ রাখিবেন, তবে তিনি কখন দিল্লীর সিংহাসন স্পর্শ করিতেন না। ভাস্করাচার্য্য যদি জানিতেন যে, তাঁহার একমাত্র কন্যা চিরবিধবা হইবে, তবে তিনি কখন দারপরিগ্রহ করিতেন না। নবকুমার বা তাঁহার নূতন পত্নী যদি জানিতেন যে, তাঁহাদিগের বিবাহে কি ফলোৎপত্তি হইবে, তবে কখন তাঁহাদিগের বিবাহ হইত না।

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পান্থনিবাসে। পৃ. ৩২, প্রথম অনুচ্ছেদের পূর্ব্বে ছিল—

আমি বলিয়াছি, নবকুমারের সঙ্গিনী অসামান্য রূপসী। এ স্থলে, যদি প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার রূপবর্ণনে প্রবৃত্ত না হই, তবে পুরুষ পাঠকেরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন। আর যাঁহারা স্বয়ং সুন্দরী, তাঁহারা পড়িয়া বলিবেন, "তবে বুঝি মাগী পাঁচপাচি!" সুতরাং এই কামিনীর রূপ বর্ণনে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু কি লইয়াই বা তাঁহার বর্ণনা করি? কখন কখন বটতলার মা সরস্বতী আমার স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন। তাঁহার অনুগ্রহে কতকগুলিন ফলমূলের ডালি সাজাইয়া রূপ বর্ণনার কার্য্য এক প্রকার সাধন করিতে পারি, কিন্তু পাছে দাড়িম্ব রম্ভা ইত্যাদি নাম শুনিয়া পাঠক মহাশয়ের জঠরানল জ্বলিয়া উঠে, এই আশঙ্কায় সে চেষ্টায় বিরত রহিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুন্দরীসন্দর্শনে। পৃ. ৩৭, প্রথম পংক্তির 'নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল।' ইহার পর বাদ গিয়াছে—

অধিকাংশ স্ত্রীলোক বহুস্বর্ণখচিত হইলে প্রায় কিছু শ্রীহীনা হয়;—অনেকেই সজ্জিতা পুত্তলিকার দশা প্রাপ্ত হয়েন;—কিন্তু মতিবিবিতে সে শ্রীহীনতা বা দশা দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুন্দরীসন্দর্শনে। পৃ. ৩৭, ১৭ পংক্তির 'মোচন করিতে লাগিলেন।' ইহার পর বাদ গিয়াছে—

নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতেছ?" মতি কহিলেন, "দেখুন না।"

দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—অবরোধে। পৃ. ৪৪, ১৯ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

শ্যামা কুলীনপত্নী।

আমরাও এই অবকাশে পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখি যে, ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস, পুষ্পগন্ধ, বিতরণই তার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল; তৃতীয় মূল নাই। এ কথা কেবল স্নেহ সম্বন্ধেই যে সত্য, এমত নহে। ধন, মান, সম্পদ, মহিমা, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলেরই সুখদানশক্তি কেবল মাত্র আদান প্রদান ঘটিত। মৃণ্ময়ী বনমধ্যে থাকিয়া এ কথা কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—অতএব কথার কোন উত্তর দিলেন না।

তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ—রাজনিকেতনে। পৃ. ৫৯, ১৫ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

সে যাহা হউক, এক্ষণে দাসী বিদায় হয়। পামরীর এমন কোন সাধ নাই যে, জাঁহাগীর শাহের ইচ্ছায় নিবারণ না হয়।

তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ—আত্মমন্দিরে। পৃ. ৬২, ১১ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

লু। এ হীরার অঙ্গুরী তোমায় কে দিয়াছে ?

পে। শাহবাজ খাঁ।

লু। আর সেই পান্নার কণ্ঠী ?

পে। আজিম খাঁ।

লু। আর কে কে তোমায় অলঙ্কার দিয়াছে ?

পে। (হাসিয়া) করীম খাঁ, কোকলতাষ, রাজা জীবনসিংহ, রাজা প্রতাপাদিত্য, মুসা খাঁ—কত লোক দিয়াছে কাহার নাম করিব। এখন যা পরিয়া আগ্রার পরিচারিকা-মণ্ডলে প্রাধান্য স্বীকার করাই, সে স্বয়ং জাহাঙ্গীরের দান।

লু। ইহার মধ্যে কাহাকে আমি ভাল বাসিতাম ?

পে। (হাসিয়া) সকলকেই।

লু। এ ত গেল মুখের কথা। মনের কথা কি ?

এই পংক্তিগুলির পরিবর্তে ১২শ পংক্তিটি যোজিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ—শয়নাগারে। পৃ. ৬৮, এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদই বাদ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল—

গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে

"Real Fatalism is of two kinds.* Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of Œdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will

overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character."

J. S. Mill.

এত দূরে এ আখ্যায়িকা হৃদয়ঙ্গামিত্ব প্রাপ্ত হইল। চিত্রকর চিত্রপুত্তলী লিখিতে অগ্রে হস্ত পাদাদির রেখানিচয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অঙ্কিত করে, শেষে তৎসমুদয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ছায়ালোকভিন্নতা লিখে। আমরা এ পর্য্যন্ত এই মানসচিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ রেখাঙ্কিত করিয়াছি; এক্ষণে তৎসমুদায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া তাহার ছায়ালোক সন্নিবেশ করিব।

রবিকরাকৃষ্ট বারিবাষ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন, তিল তিল করিয়া, মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে; তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না; কেহ মেঘ মনে করে না; শেষে অকস্মাৎ একেবারে পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়ী করিয়া বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান হইল, আমরা এত দিন তিল তিল করিয়া তাহার বারিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম।

পাঠক মহাশয় "অদৃষ্ট" স্বীকার করেন? ললাট-লিপির কথা বলিতেছি না, সে ত অলস ব্যক্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু, কখন কখন যে, কোন ভবিষ্য ঘটনার জন্য পূর্ব্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্য্য সকল এরূপ দুর্দ্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন কি না? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে দূরদর্শিগণ কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট য়ুনানী নাটকাবলির প্রাণ; সর্ব্বজ্ঞ সেক্‌স্‌পীয়রের মাক্‌বেথের আধার; ওয়ালটর স্কটের "ব্রাইড্ অব লেমার মুরে" ইহার ছায়াপাত হইয়াছে; গেটে প্রভৃতি জর্ম্মান কবিগুরুগণ ইহার স্পষ্টতঃ সমালোচনা করিয়াছেন। রূপান্তরে, "ফেট্" ও "নেসেসিটি" নাম ধারণ করিয়া ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রধান মতভেদের কারণ হইয়াছে।

অস্মদ্দেশে এই "অদৃষ্ট" জনসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত। যে কবিগুরু কুরুকুলসংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহমন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত; কৌরবপাণ্ডবের বাল্য-ক্রীড়াবধি এই করালছায়া কুরুশিরে বিদ্যমান; শ্রীকৃষ্ণ ইহার অবতারস্বরূপ। "যদাশ্রৌষং জাতুষাদ্বেশ্মনস্তান্" ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে কবি স্বয়ং ইহা প্রাঞ্জলীকৃত করিয়াছেন। দার্শনিকদিগের মধ্যে অদৃষ্টবাদীর অভাব নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ। অধুনা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" ইতি কবিতার্দ্ধ পাঠ করিয়া অনেকে অদৃষ্টের পূজা করেন। অপর সকলে "কপাল!" বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

অদৃষ্টের তাৎপর্য্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য্য ফল; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে। *

কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, "এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।" ইহার উত্তর, "অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থারম্ভে যেখানে যে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্বিপরীতে সত্যের বিঘ্ন ঘটিবে।"

এক্ষণে আমরা অদৃষ্টগতির অনুগামী হই। সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে; গ্রন্থিবন্ধন করি।

চতুর্থ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ—প্রেতভূমে। (১ম সং.—১০ম পরিচ্ছেদ) পৃ. ৯২, ১২ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

শবভুক্ পক্ষিগণের বৃহৎ পক্ষসঞ্চালনের কচিৎ ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। কপালকুণ্ডলা মানস চক্ষে সেই প্রেতভূমিতে কত প্রেতিনীকে নরদেহ চর্ব্বণ করিতে দেখিতে লাগিলেন; কত পিশাচীকে কর্দ্দমোপরে সশব্দে নাচিয়া বেড়াইতে শুনিতে লাগিলেন।

চতুর্থ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ—প্রেতভূমে। (১ম সং.—১০ম পরিচ্ছেদ) পৃ. ৯৪, শেষ ই পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত অংশ ছিল—

কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন—বোধ হইল, যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

---

* কবিদিগের "Destiny" দার্শনিকদিগের "Fate" এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। ভিন্ন ভিন্ন ; ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিতেছি না।

তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল "মৃণ্ময়ি! মৃণ্ময়ি!"

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণ্ময়ী কোথায়?" নবকুমার উত্তর করিলেন, "মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি!"

ভ্রম-সংশোধন

পৃ.	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৮	marbel	marble
১৩	৩	পরিতোষং	পরিতোষঃ
৭৩	৩	পাইতেছি।	পাইতেছি।"

ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

মৃণালিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য দুই টাকা

পৌষ, ১৩৪৫

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬এ জুন) রাত্রি ৯টায় ালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন— দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে বৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় ্চন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য- ৎ নানা উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং ষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা া দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় ার একটি প্রামাণিক 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা জী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল cholarly সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম—১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার ান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে—করা হইতেছে; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য- ৎ যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে গৌরব বোধ করিতেছি।

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। তাঁহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্কিমের প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও খযোগ্য।

শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে রা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাঁহারা বহু

অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ও জীবনীর উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই সুযোগে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে মল্লিখিত সাধারণ ভূমিকা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার লিখিত বঙ্কিমের সাহিত্যপ্রতিভা বিষয়ক ভূমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বঙ্কিমের রচনাপঞ্জী ও রাজকার্যের ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সঙ্কলিত বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বঙ্কিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা থাকিবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এই খণ্ডে বিভিন্ন ভাষায় বঙ্কিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে বিবৃতি দিবেন।

বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্বল থাকুক।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫
কলিকাতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভূমিকা

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাধান্য অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত হয়; বঙ্কিমচন্দ্র নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি আবিষ্কার করিয়া যেন দিগ্বিজয়ের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠেন। বক্তিয়ার খিলজির নেতৃত্বে সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের অবিশ্বাস্য গল্প বাঙালীর গৌরবে ও বলে আস্থাবান বঙ্কিমচন্দ্রকে বরাবর পীড়া দিত। ইতিহাসের কলঙ্ক তিনি কল্পনার জলসিঞ্চনে ক্ষালন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। পশুপতি-চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া তিনি সেদিনকার লাঞ্ছিত বাঙালীর পক্ষে লেখনীধারণ করেন। 'মৃণালিনী' উপন্যাস তাঁহার এই কলঙ্ক-ক্ষালন চেষ্টার ফল।

বারুইপুরে ও আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে অবস্থানকালে 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী' রচিত ও প্রকাশিত হয়। 'মৃণালিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস। শচীশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দশ মাস মাত্র ছিলেন। সেই দশ মাসের [১৮৬৭ আগস্ট হইতে ১৮৬৮ জুন] ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মাসের ছুটী লইলেন। ছুটীর কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি-সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছিল। অবকাশান্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া আসিলেন; তখনও মৃণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে চলিয়া গেলেন।—'বঙ্কিম-জীবনী', ৩য় সং, পৃ. ৯৭।

বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ইহাকে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বলিয়াছিলেন। পরে অনেক বিবেচনা করিয়া তিনি "ঐতিহাসিক" বিশেষণ প্রয়োগ রহিত করেন। আসলে 'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিকতা সামান্য; সমস্ত গল্পটি তাঁহার অক্ষম সবল কল্পনার ফল।

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইলে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'রহস্য-সন্দর্ভে' ইহার এক বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন। সমসাময়িক শিক্ষিত মহলে 'মৃণালিনী'

কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে। আমরা এখানে অংশতঃ রাজেন্দ্রলালের আলোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি—

পুস্তক খানি অতিক্ষুদ্রায়তন; ২৪১ পৃষ্ঠামাত্র ইহার পরিমাণ, এবং তাহাও বিরল অক্ষরে ব্যাপ্ত। পরন্তু ইহার আয়তনের সহিত ইহার গৌরবের কোন সমতা নাই। বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে আমরা তাহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি; বোধ হয় এমত কোন বাঙ্গালী ভদ্র পুস্তক নাই যাহা আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই; এবং স্বভাবতঃ ও সমালোচকের ধর্ম্মরক্ষার্থে আমরা পুস্তকের দোষ-গুণ-বিচারে সর্ব্বদা অনুরক্ত। এই প্রকারে বিবিধ গ্রন্থের আলোচনানন্তর আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে বঙ্গভাষায় গদ্যে মৃণালিনীর সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই; এবং যে কোন ভাষায় গ্রন্থকার ঐরূপ রম্য রচনা নিষ্পন্ন করিলে বিশেষ প্রশংসার ভাজন হইতেন। সাধারণের একটী সংস্কার আছে যে নব্য সম্প্রদায় ইংরাজীর অনুরাগে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় স্বদেশভাষার নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, সুতরাং তাহার উন্নতি-সাধনে বা তাহাতে সদ্রচনায় সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু সে কুসংস্কারের একেবারে উন্মূলন করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালাবধি ইংরাজীর অনুরাগী; ২৩ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষারই সর্ব্বদা অনুশীলন করিয়া তাহাতে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালমধ্যে বাঙ্গালীর অল্প মাত্র অনুধাবন করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, সংস্কৃতে তিনি অভিজ্ঞ নহেন। অপর বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া ইংরাজীরই সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছেন, এবং আদৌ ইংরাজীতেই রচনাচাতুর্য্য-প্রকাশার্থে কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রে উপন্যাস প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তত্রাপি তিনি বাঙ্গালী ভাষায় যে প্রকার পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদ্বারা অদ্যাপি নিষ্পন্ন হয় নাই। বহু কালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনিলে শ্রোতার মনে বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশসিংহাসন মনে পড়িত। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা কএক বৎসরাবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূত-প্রেতের পরিবর্ত্তে মানুসিক ঘটনার উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন; এবং কএক খানি সুচারু পুস্তকও প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইংরাজীর প্রকৃত নবেলের পারিপাট্য লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবুও সেই অনুরাগের অনুরাগী; এবং ইংরাজী উপন্যাস লেখকের মধ্যে স্কট্-নামা এক জন শ্রেষ্ঠতমকে আদর্শ স্বীকার করিয়া পর পর তিন খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন; অধিকন্তু যে কেহ ঐ তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তেঁহ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার রচনাচাতুর্য্যের ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতালাভ করিয়াছে।—'রহস্য-সন্দর্ভ,' ১৯২৭ সংবৎ, ৫৭ খণ্ড, পৃ. ১৪২।

বিষয় ও বর্ণন সামঞ্জস্যে কেহ কেহ 'মৃণালিনী'কে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অব্যবহিত পরের
না বলিয়াছেন ; 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যাংশে এই দুই গ্রন্থের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ার দরুন
রূপ ধারণা হওয়া সম্ভব। আসলে 'মৃণালিনী'ও কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট। বিশেষ করিয়া
রিজায়া ও মৃণালিনীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল সঙ্গীত ও ছড়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,
হা তাঁহার অদ্ভুত কাব্য-কল্পনা-কুশলতার পরিচায়ক ; 'ইন্দিরা' ও 'আনন্দমঠ' ব্যতীত
র আর কুত্রাপি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাধারণ ক্ষমতার প্রয়োগ দেখা যায় না।

পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমের যে স্ফূর্ত্তি দেখা
য়, 'মৃণালিনী'তে তাহার অঙ্কুর দেখিতে পাই।

'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ সর্ব্বপ্রথম ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো
ন্যাল-বাড়ীতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রদর্শিত হয়।

'মৃণালিনী'র ইংরেজী অনুবাদ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে
Simha কর্ত্তৃক হিন্দুস্থানীতে অনূদিত হইয়া ইহা লক্ষ্নৌ হইতে প্রকাশিত হয়।
রন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'হেমচন্দ্র' নামে ইহার পরিশিষ্ট ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত
ভৃতি 'মৃণালিনী' সম্বন্ধে সামান্য সামান্য আলোচনা করিয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্ন রায়
ধুরী, পূর্ণচন্দ্র বসু ও ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃণালিনী'র চরিত্রবিশ্লেষণ উল্লেখ-
াগ্য। 'মৃণালিনী'-বিষয়ে সাময়িক-পত্রাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়।

'মৃণালিনী'র প্রথম সংস্করণের একটি খণ্ডিত কপি আমরা ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার
র সৌজন্যে পাঠনির্ণয়ার্থ পাইয়াছি।

মৃণালিনী

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দশম সংস্করণ হইতে]

"বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ।"

বঙ্গকবিকুলতিলক

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র

সুহৃৎপ্রধানকে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহারস্বরূপ

উৎসর্গ করিলাম।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আচার্য্য

একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব্ব প্রাবৃট্‌দিনান্তশোভা প্রকটিত তছিল। প্রাবৃট্‌কাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ চম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার দঞ্চারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই নী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা নতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুই জন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গত সাহসে সেই মনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। জন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত ষ্ঠ দেহ, যোদ্ধৃবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে পদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর! ঘাটের উপরে, সংসারবিরাগী পুণ্য-াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ রলেন।

কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন; ব্রাহ্মণ ত দীর্ঘাকার পুরুষ; শরীর শুষ্ক; আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত; ললাট ও লকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি গম্ভীর এবং কটাক্ষ ন; দেখিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় বা অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, চ শঙ্কা হইত। আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাঁহার সে পরুষভাব যেন দূর হইল, মুখের ম্ভীর্য্যমধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল। আগন্তুক, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছিল; এই জন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দিল্লীর সংবাদ আমি সকল শুনিয়াছি। বখ্তিয়ার খিলিজিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু পশু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে।"

হেমচন্দ্র। তাহাকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।

ব্রাহ্মণ। তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি বখ্তিয়ারকে না মারিয়া সে হাতীকে মারিলে কেন?

হেমচন্দ্র। আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ-রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "এ সকল ঘটনা ত অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরায় গিয়াছিলে?"

হেমচন্দ্র অধোবদন হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বুঝিলাম তুমি মথুরায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মথুরায় গিয়াছিলে, তাহার কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ?"

এবার হেমচন্দ্র রুক্ষভাবে কহিলেন, "সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে আপনারই দয়া। মৃণালিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি যে কোথায় পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিলে?"

হে। মাধবাচার্য্য ভিন্ন এ মন্ত্রণা কাহার? আমি মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, মৃণালিনী আমার আঙ্গটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আর তাহার উদ্দেশ নাই। আমার আঙ্গটি আপনি পাথেয় জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। আঙ্গটির পরিবর্ত্তে অন্য রত্ন দিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম,

আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, এই জন্যই বিনা বিবাদে আঙ্গটি দিয়াছিলাম।
আমার সে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি
কার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন-
াত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার
াবে কেন? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার
পর রাজ্য হারাইয়াছ; যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে
কিত, তবে মগধজয় কেন হইবে? আবার কি সেই মৃণালিনী-পাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট
য়া থাকিবে? মাধবাচার্য্যের জীবন থাকিতে তাহা হইবে না। সুতরাং যেখানে
কলে তুমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।"

হে। আপনার দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন; আমি এই পর্য্যন্ত।

মা। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। এই কি তোমার দেবভক্তি? ভাল, তাহাই না
ক; দেবতারা আত্মকর্ম্ম সাধন জন্য তোমার ন্যায় মনুষ্যের সাহায্যের অপেক্ষা করেন
। কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রুশাসন হইতে অবসর
ইতে চাও? এই কি তোমার বীরগর্ব্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে
য়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?

হে। রাজ্য—শিক্ষা—গর্ব্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক।

মা। নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া
ণা ভোগ করিয়াছিল? কেনই বা দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ পাষণ্ডকে
ল বিদ্যা শিখাইলাম?

মাধবাচার্য্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্নকপোল হইয়া রহিলেন। ক্রমে হেমচন্দ্রের
নিন্দ্য গৌর মুখকান্তি মধ্যাহ্ন-মরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল;
ন্তু গর্ভাগ্নিগিরি-শিখর-তুল্য, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে মাধবাচার্য্য
হিলেন, "হেমচন্দ্র, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। মৃণালিনী কোথায়, তাহা বলিব—মৃণালিনীর
হিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব। কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হও, আগে
াপনার কাজ সাধন কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় না বলিলে আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ
রিব না।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আর যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে?"

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি কহিলেন, "তবে সে আপনারই কাজ।" মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকার্য্যের কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি।"

হেমচন্দ্রের মুখকান্তি বর্ষণোন্মুখ মেঘবৎ হইল। ত্রস্তহস্তে ধনুকে শরসংযোগ করিয়া কহিলেন, "যে মৃণালিনীর বধকর্ত্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।"

মাধবাচার্য্য হাস্য করিলেন, কহিলেন, "গুরুহত্যায় ব্রহ্মহত্যায় তোমার যত আমোদ, স্ত্রীহত্যায় আমার তত নহে। এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে না। মৃণালিনী জীবিতা আছে। পার, তাহার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে স্থানান্তরে যাও। আশ্রম কলুষিত করিও না; অপাত্রে আমি কোন ভার দিই না।" এই বলিয়া মাধবাচার্য্য পূর্ব্ববৎ জপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিলেন। যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নৌকায় ছিল, তাহাকে বলিলেন, "দিগ্বিজয়! নৌকা ছাড়িয়া দাও।"

দিগ্বিজয় বলিল, "কোথায় যাইব?" হেমচন্দ্র বলিলেন, "যেখানে ইচ্ছা—যমালয়।"

দিগ্বিজয় প্রভুর স্বভাব বুঝিত। অস্ফুটস্বরে কহিল, "সেটা অল্প পথ।" এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে কহিলেন, "দূর হউক। ফিরিয়া চল।"

দিগ্বিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনীত হইল। হেমচন্দ্র লম্ফে তীরে অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার মাধবাচার্য্যের আশ্রমে গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "পুনর্ব্বার কেন আসিয়াছ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই স্বীকার করিব। মৃণালিনী কোথায় আছে আজ্ঞা করুন।"

মা। তুমি সত্যবাদী—আমার আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গৌড়নগরে এক শিষ্যের বাটীতে মৃণালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের

আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যত দিন মৃণালিনী তাঁহার গৃহে থাকিবে, তত দিন রুষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।

হে। সাক্ষাৎ না পাই, যাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে ার্য্য করিতে হইবে অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ?

হে। যবনেরা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি ত্বরায় বখ্‌তিয়ার খিলিজি লইয়া, গৌড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্য্যের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "এত দিনে বিধাতা বুঝি শের প্রতি সদয় হইলেন।"

হেমচন্দ্র একতানমনে মাধবাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লেন। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "কয় মাস পর্য্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত , গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।"

হেম। কি প্রকার?

মা। গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।

হে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে? আর কাহা ?

মা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক্ বঙ্গরাজ্যে ারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবেক।

হে। তবে আমার জয়লাভের কোথা সম্ভাবনা? আমি ত বণিক্ নহি।

মা। তুমিই বণিক্। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে?

হে। আমি তখন বণিক্ বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে।

মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক্। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ াই যবননিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই ৷ যাত্রা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্য্যন্ত ানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু যুদ্ধ করিয়া কি করিব?"

মা। গৌড়েশ্বরের সেনা আছে।

হে। থাকিতে পারে—সে বিষয়েও কতক সন্দেহ ; কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন ?

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানেই গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে। গৌড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্ত্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, মাধবাচার্য্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যাও, বৎস! প্রতি পদে বিজয় লাভ কর। যদি ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মৃণালিনী! মৃণালিনী পাখী আমি তোমারই জন্যে পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এইজন্য তোমার পরম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছু দিনের জন্য মনঃপীড়া দিতেছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরের বিহঙ্গী

লক্ষ্মণাবতী-নিবাসী হৃষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে যথায় দুইটি তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন, তথায় পাঠক মহাশয়কে দাঁড়াইতে হইবে। উভয় রমণীই আত্মকর্ম্মে সবিশেষ মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন পরস্পরের সহিত কথোপকথনের কোন বিঘ্ন জন্মিতেছিল না। সেই কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে আরম্ভ করিব।

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, "কেন, মৃণালিনি, কথার উত্তর দিস্ না কেন? আমি সেই রাজপুত্রটির কথা শুনিতে ভালবাসি।"

"সই মণিমালিনি! তোমার সুখের কথা বল, আমি আনন্দে শুনিব।"

মণিমালিনী কহিল, "আমার সুখের কথা শুনিতে শুনিতে আমিই জ্বালাতন হইয়াছি, ামাকে কি শুনাইব ?"

মৃ। তুমি শোন কার কাছে—তোমার স্বামীর কাছে ?

মণি। নহিলে আর কারও কাছে বড় শুনিতে পাই না। এই পদ্মটি কেমন িকিলাম দেখ দেখি ?

মৃ। ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্ম অনেক ঊর্দ্ধে আছে, কিন্তু সরোবরে রূপ থাকে না ; পদ্মের বোঁটা জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রেও সেইরূপ হইবে। আর য়কটি পদ্মপত্র আঁক ; নহিলে পদ্মের শোভা স্পষ্ট হয় না। আরও, পার যদি, উহার কট একটি রাজহাঁস আঁকিয়া দাও।

মণি। হাঁস এখানে কি করিবে ?

মৃ। তোমার স্বামীর মত পদ্মের কাছে সুখের কথা কহিবে।

মণি। (হাসিয়া) দুই জনেই সুকণ্ঠ বটে। কিন্তু আমি হাঁস লিখিব না। আমি খের কথা শুনিয়া শুনিয়া জ্বালাতন হইয়াছি।

মৃ। তবে একটি খঞ্জন আঁক।

মণি। খঞ্জন আঁকিব না। খঞ্জন পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইবে। এ ত ালিনী নহে যে, স্নেহ-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব।

মৃ। খঞ্জন যদি এমনই দুষ্ট হয়, তবে মৃণালিনীকে যেমন পিঞ্জরে পূরিয়াছ, খঞ্জনকেও ইরূপ করিও।

ম। আমরা মৃণালিনীকে পিঞ্জরে পূরি নাই—সে আপনি আসিয়া পিঞ্জরে য়াছে।

মৃ। সে মাধবাচার্য্যের গুণ।

ম। সখি, তুমি কতবার বলিয়াছ যে, মাধবাচার্য্যের সেই নিষ্ঠুর কাজের কথা শেষ বলিবে। কিন্তু কই, আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে ?

মৃ। মাধবাচার্য্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচার্য্যকে আমি চিনিতাম না। মি ইচ্ছাপূর্ব্বকও এখানে আসি নাই। এক দিন সন্ধ্যার পর, আমার দাসী আমাকে এই ়টি দিল ; এবং বলিল যে, যিনি এই আঙ্গুটি দিয়াছেন, তিনি ফুলবাগানে অপেক্ষা তেছেন। আমি দেখিলাম যে, উহা হেমচন্দ্রের সঙ্কেতের আঙ্গুটি। তাঁহার সাক্ষাতের

অভিলাষ থাকিলে তিনি এই আঙ্গুটি পাঠাইয়া দিতেন। আমাদিগের বাটীর পিছনেই বাগান ছিল। যমুনা হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়াইত। তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত।

মণিমালিনী কহিলেন, "ঐ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?"

মৃ। অসুখ কেন সখি—তিনি আমার স্বামী। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না।

ম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই। রাগ করিও না সখি! তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি; এই জন্য বলিতেছি।

মৃণালিনী অধোবদনে রহিলেন। ক্ষণেক পরে চক্ষুর জল মুছিলেন। কহিলেন, "মণিমালিনি! এ বিদেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই। আমাকে ভাল কথা বলে, এমন কেহ নাই। যাহারা আমাকে ভালবাসিত, তাহাদিগের সহিত যে, আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে, সে ভরসাও করি না। কেবলমাত্র তুমি আমার সখী—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে?"

ম। আমি তোমাকে ভালবাসিব; বাসিয়াও থাকি, কিন্তু যখন ঐ কথাটি মনে পড়ে, তখন মনে করি—

মৃণালিনী পুনশ্চ নীরবে রোদন করিলেন। কহিলেন, "সখি, তোমার মুখে এ কথা আমার সহ্য হয় না। যদি তুমি আমার নিকটে শপথ কর যে, যাহা বলিব, তাহা এ সংসারে কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবে না, তবে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি। তাহা হইলে তুমি আমাকে ভালবাসিবে।"

ম। আমি শপথ করিতেছি।

মৃ। তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে। তাহা ছুঁয়ে শপথ কর।

মণিমালিনী তাই করিলেন।

তখন মৃণালিনী মণিমালিনীর কাণে যাহা কহিলেন, তাহার এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। শ্রবণে মণিমালিনী পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন কথা সমাপ্ত হইল।

মণিমালিনী কহিলেন, "তাহার পর, মাধবাচার্য্যের সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে? সে বৃত্তান্ত বলিতেছিলে বল।"

মৃণালিনী কহিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের আঙ্গুটি দেখিয়া তাঁকে দেখিবার ভরসায় গানে আসিলে দূতী কহিল যে, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া হিয়াছে। আমি অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি নাই। বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বেচনাশূন্য হইলাম। তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থ ই একখানি নৌকা লাগিয়া হিয়াছে। তাহার বাহিরে এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মনে করিলাম যে, জপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আসিলাম। নৌকার উপর নি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি বিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শে ই বুঝিলাম যে, এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র হে।"

মণি। আর অমনি তুমি চীৎকার করিলে ?

মৃ। চীৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চীৎকার াসিল না।

মণি। আমি হইলে জলে ঝাঁপ দিতাম।

মৃ। হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মরিব ?

মণি। তার পর কি হইল ?

মৃ। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে "মা" বলিয়া বলিল, "আমি তোমাকে মাতৃ-ম্বোধন করিতেছি—আমি তোমার পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না। আমার নাম মাধবাচার্য্য, ামি হেমচন্দ্রের গুরু। কেবল হেমচন্দ্রের গুরু এমত নহি ; ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে নেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে মেচন্দ্র আমার প্রধান সহায় ; তুমি তাহার প্রধান বিঘ্ন।"

আমি বলিলাম, "আমি বিঘ্ন ?" মাধবাচার্য্য কহিলেন, "তুমিই বিঘ্ন। যবনদিগের য় করা, হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার করা, সুসাধ্য কর্ম্ম নহে ; হেমচন্দ্র ব্যতীত কাহারও সাধ্য হে ; হেমচন্দ্রও অনন্যমনা না হইলে তাঁর দ্বারাও এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। যত দিন তামার সাক্ষাৎলাভ সুলভ থাকিবে, তত দিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য ব্রত নাই—সুতরাং বন মারে কে ?" আমি কহিলাম, "বুঝিলাম, প্রথমে আমাকে না মারিলে যবন মারা ইবে না। আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আঙ্গুটি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে মারিতে াজ্ঞা করিয়াছেন ?"

মণি। এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে ?

মৃ। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায় আমার হাড় জ্বলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা কি? মাধবাচার্য্য আমাকে মুখরা মনে করিলেন, মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "আমি যে তোমাকে এইরূপে হস্তগত করিব, তাহা হেমচন্দ্র জানেন না।"

আমি মনে মনে কহিলাম, তবে যাঁহার জন্য এ জীবন রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে জীবন ত্যাগ করিব না। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল আপাততঃ হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল। যাহাতে তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া তোমাকে রাজমহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নহে? তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সে ভাব দূর করা কি উচিত নহে?" আমি কহিলাম, "আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয়, তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না।" মাধবাচার্য্য বলিলেন, "বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বুড়া উভয়ের বিবেচনা শক্তি তুল্য; কিন্তু তাহা নহে। হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমাদিগের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না। আর তুমি সম্মত হও বা না হও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব। গৌড় দেশে অতি শান্তস্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাখিয়া আসিব। তিনি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।" এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি। ও কি ও সই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভিখারিণী

সখীদ্বয় এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোমলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

"মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি,
শ্যামবিলাসিনি—রে!"

মৃণালিনী কহিলেন, "সই, কোথায় গান করিতেছে ?"

মণিমালিনী কহিলেন, "বাহির বাড়ীতে গায়িতেছে !"

গায়ক গায়িতে লাগিল।

"কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী—রে।"

মৃ। সখি ! কে গায়িতেছে জান ?

মণি। কোন ভিখারিণী হইবে।

আবার গীত।

"বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাঁহে তু তেয়াগী,—রে ;
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি—রে।"

মৃণালিনী বেগের সহিত কহিলেন, "সই ! সই ! উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

মণিমালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন। ততক্ষণ সে গায়িতে লাগিল।

"বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী,
না মিটল আশা—রে।
সা নিশা—সমরি—"

এমন সময়ে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বাটীর ভিতর আনিলেন।

সে অন্তঃপুরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল।

"সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি,
কাঁহা মিলে দেখা—রে।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী,
বনে বনে একা—রে।"

মৃণালিনী তাহাকে কহিলেন, "তোমার দিব্য গলা, তুমি গীতটি আবার গাও।"

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমন নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জ্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড়, চঞ্চল, হাস্যময়; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছে। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার—ধূলিকর্দ্দমপরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে। প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বালা, গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটি তিলক, ভ্রমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ। সে আজ্ঞামত পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল।

“মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে।*
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী—রে॥
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী—রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি—রে॥
বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা—রে॥
সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা—রে।
শুনি, যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা—রে॥”

গীত সমাপ্ত হইলে মৃণালিনী কহিলেন, “তুমি সুন্দর গাও। সই মণিমালিনি, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয়। একে কিছু দাও না?”

মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে মৃণালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুন, ভিখারিণি! তোমার নাম কি?”

ভিখা। আমার নাম গিরিজায়া।

* এই গীত ঢিমে তেতালা তাল যোগে জয়জয়ন্তী রাগিণীতে গেয়।

মৃণা। তোমার বাড়ী কোথায় ?

গি। এই নগরেই থাকি।

মৃ। তুমি কি গীত গাইয়া দিনপাত কর ?

গি। আর কিছুই ত জানি না।

মৃ। তুমি গীত সকল কোথায় পাও ?

গি। যেখানে যা পাই তাই শিখি।

মৃ। এ গীতটি কোথায় শিখিলে ?

গি। একটি বেণে আমাকে শিখাইয়াছে।

মৃ। সে বেণে কোথায় থাকে ?

গি। এই নগরেই আছে।

মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—প্রাতঃসূর্য্যকরস্পর্শে যেন পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "বেণেতে বাণিজ্য করে—সে বণিক্ কিসের বাণিজ্য করে ?"

গি। সবার যে ব্যবসা, তারও সেই ব্যবসা।

মৃ। সে কিসের ব্যবসা ?

গি। কথার ব্যবসা।

মৃ। এ নূতন ব্যবসা বটে। তাহাতে লাভালাভ কিরূপ ?

গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অলাভ কোন্দল।

মৃ। তুমিও ব্যবসায়ী বট। ইহার মহাজন কে ?

গি। যে মহাজন।

মৃ। তুমি ইহার কি ?

গি। নগ্‌দা মুটে।

মৃ। ভাল তোমার বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে দেখি।

গি। এ সামগ্রী দেখে না ; শুনে।

মৃ। ভাল—শুনি।

গিরিজায়া গাইতে লাগিল।

"যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।

ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,

পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে।

নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কণ্ঠের কাটিল ডোর মণি হরে নিল।"

মৃণালিনী বাষ্পপীড়িতলোচনে, গদ্গদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, "এ কোন্ চোরের কথা?"

গি। বেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার।

মৃ। তাঁহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের প্রাণ বাঁচে না।

গি। বুঝি ব্যাপারিরও নয়।

মৃ। কেন, ব্যাপারির কি?

গিরিজায়া গায়িল।

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥"

মৃণালিনী সস্নেহে কোমল স্বরে কহিলেন, "মৃণাল কোথায়? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে রাখিতে পারিবে?"

গি। পারিব—কোথায় বল।

মৃণালিনী বলিলেন,

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে, করিল বন্ধন॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।
হৃদয়কমলে মোর, তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ, মানস বিলাসে॥

ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিল অতল জলে, মৃণালিনী মরে॥

কেমন গিরিজায়া, গীত শিখিতে পারিবে?"

গিরি। তা পারিব। চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব?

মৃ। না। এ ব্যবসায়ে আমার লাভের মধ্যে ঐটুকু।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মালিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহার স্নেহশালিনী সখী—সকলই নিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী পিতৃপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এরূপ তাঁহার াস জন্মিল না। অতএব তিনি এ সকল কথা সখীর নিকট গোপনে যত্নবতী হইয়া রিজায়াকে কহিলেন, "আজি আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবার কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আমি নিব।"

গিরিজায়া বিদায় হইল। মৃণালিনী যে তাহাকে পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় রয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গিরিজায়া কতিপয় পদ গমন করিলে মণিমালিনী কিছু চাউল, একছড়া কলা, খানি পুরাতন বস্ত্র, আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আর মৃণালিনীও খানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার সময়ে উহার কাণে কাণে কহিলেন, "আমার র্য্য হইতেছে না, কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রে প্রহরেকের য় আসিয়া এই গৃহের উত্তর দিকে প্রাচীরমূলে অবস্থিতি করিও; তথায় আমার সাক্ষাৎ ইবে। তোমার বণিক্ যদি আসেন সঙ্গে আনিও।"

গিরিজায়া কহিল, "বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব।"

মৃণালিনী মণিমালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে মণিমালিনী কহিলেন, "সই, খারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?"

মৃণালিনী কহিলেন,

"কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—
কাণে কাণে কি কথাটি ব'লে দিলি ওই॥

সই ফিরে ক'না সই, সই ফিরে ক'না সই।
সই কথা কোস্ কথা কব, নইলে কারো নই।"

মণিমালিনী হাসিয়া কহিলেন, "হ'লি কি লো সই?"

মৃণালিনী কহিলেন, "তোমারই সই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দূতী

লক্ষ্মণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্ব্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল; অপরাহ্নে তাহার তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুসুমিত অশোকশাখা নিষ্প্রয়োজনে হেমচন্দ্র ছুরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন, এবং মুহুর্মুহুঃ পথপ্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে আসিল না। ভৃত্য দিগ্বিজয় আসিল, হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে কহিলেন, "দিগ্বিজয়, ভিখারিণী আজি এখনও আসিল না। আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল। নগরীর রাজপথে গিরিজায়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

গিরিজায়া বলিল, "কেও দিব্বিজয়?" দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, "আমার নাম দিগ্বিজয়।"

গি। ভাল দিগ্বিজয়—আজি কোন্ দিক্ জয় করিতে চলিয়াছ?

দি। তোমার দিক্।

গি। আমি কি একটা দিক্? তোর দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান নাই।

দি। কেমন করিয়া থাকিবে—তুমি যে অন্ধকার। এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না।

দি। না। সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।

গি। পরের জন্যেই মলেম। তবে চল।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের সঙ্গে চলিলেন। দিগ্বিজয় অশোকতলস্থ হেমচন্দ্রকে খাইয়া দিয়া অন্যত্র গমন করিল। হেমচন্দ্র অন্যমনে মৃদু মৃদু গাইতেছিলেন,

"বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে—"

গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে গায়িল—

"চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা রে।"

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "কে গিরিজায়া! আশা কি মিট্‌ল?"

গি। কার আশা? আপনার না আমার?

হে। আমার আশা। তাহা হইলেই তোমার মিটিবে।

গি। আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে? লোকে বলে রাজা রাজ্‌ড়ার আশা কিছুতেই মিটে না।

হে। আমার অতি সামান্য আশা।

গি। যদি কখন মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা তাঁহার নিকট বলিব।

হেমচন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন, "তবে কি আজিও মৃণালিনীর সন্ধান পাও নাই? আজি কোন্ পাড়ায় গীত গাইতে গিয়াছিলে?"

গি। অনেক পাড়ায়—সে পরিচয় আপনার নিকট নিত্য নিত্য কি দিব? অন্য কথা বলুন।

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বুঝিলাম বিধাতা বিমুখ। ভাল পুনর্ব্বার কালি সন্ধানে যাইবে।"

গিরিজায়া তখন প্রণাম করিয়া কপট বিদায়ের উদ্যোগ করিল। গমনকালে হেমচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে। আজি কি তোমার গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিয়াছে?"

গি। কে কি বলিবে? এক মাগী তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল—বলে ব্রজবাসিনীর জন্যে শ্যামসুন্দরের ত মাথাব্যথা পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে, যেন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এত যত্নেও যদি সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা—কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া স্বকর্ম্ম নষ্ট করি;—গিরিজায়ে, কালি তোমাদিগের নগর হইতে বিদায় হইব।"

"তথাস্তু" বলিয়া গিরিজায়া মৃদু মৃদু গান করিতে লাগিল,—

"শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা রে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "ও গান এই পর্য্যন্ত। অন্য গীত গাও।"

গিরিজায়া গাইল,

"যে ফুল ফুটিত সখি, গৃহতরুশাখে,
কেন রে পবনা, উড়ালি তাকে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জন্য দুঃখ কি? ভাল গীত গাও।"

গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥"

হেম। কি, কি? মৃণাল কি?

গি। কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল, পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥

না—অন্য গান গাই।

হে। না—না—না—এই গান—এই গান গাও। তুমি রাক্ষসী।

গি। বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।
হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টকসহ মৃণালিনী জলে॥

হে। গিরিজায়া! গিরি—এ গীত তোমাকে কে শিখাইল?

গি। (সহাস্যে)
হেন কালে কালমেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে।
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥

হেমচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদস্বরে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ আমারই মৃণালিনী। তুমি তাহাকে কোথায় দেখিলে?"

গি। দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবনভরে,
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

হে। এখন রূপক রাখ, আমার কথার উত্তর দাও—কোথায় মৃণালিনী?

গি। এই নগরে।

হেমচন্দ্র রুষ্টভাবে কহিলেন, "তা ত আমি অনেক দিন জানি। এ নগরে কোন্ স্থানে?"

গি। হৃষীকেশ শর্ম্মার বাড়ী।

হে। কি পাপ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ?

গি। সন্ধান করিয়াছি।

হেমচন্দ্র দুই বিন্দু—দুই বিন্দু মাত্র অশ্রুমোচন করিলেন। পুনরপি কহিলেন, "সে এখান হইতে কত দূর?

গি। অনেক দূর।

হে। এখান হইতে কোন্ দিকে যাইতে হয়?

গি। এখান হইতে দক্ষিণ, তার পর পূর্ব্ব, তার পর উত্তর, তার পর পশ্চিম—

হেমচন্দ্র হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। কহিলেন, "এ সময়ে তামাসা রাখ—নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

গি। শান্ত হউন। পথ বলিয়া দিলে কি আপনি চিনিতে পারিবেন? যদি তা না পারিবেন, তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হউক—মৃণালিনী কি বলিল?"

গি। তা ত বলিয়াছি।—
"ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে।"

হে। মৃণালিনী কেমন আছে?

গি। দেখিলাম শরীরে কোন পীড়া নাই।

হে। সুখে আছে কি ক্লেশে আছে—কি বুঝিলে?

গি। শরীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়—হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের কন্যার সই।

হে। তুমি অধঃপাতে যাও; মনের কথা কিছু বুঝিলে?

গি। বর্ষাকালের পদ্মের মত; মুখখানি কেবল জলে ভাসিতেছে।

হে। পরগৃহে কি ভাবে আছে?

গি। এই অশোক ফুলের স্তবকের মত। আপনার গৌরবে আপনি নম্র।

হে। গিরিজায়া! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র। তোমার ন্যায় বালিকা আর দেখি নাই।

গি। মাথা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্রও এমন আর দেখেন নাই।

হে। সে অপরাধ লইও না, মৃণালিনী আর কি বলিল?

গি। যো দিন জানকী—

হে। আবার?

গি। যো দিন জানকী, রঘুবীর নিরখি—

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করিলেন। তখন সে কহিল, "ছাড়! ছাড়! বলি! বলি!"

"বল" বলিয়া হেমচন্দ্র কেশ ত্যাগ করিলেন।

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল, "মহাশয়, আপনি যদি মৃণালিনীকে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন।"

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অশোকতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন, "মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মৃণালিনী কি বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া যাইও।"

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তিতান্তঃকরণে অশোকবৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ভুজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ

রাখিয়া, শয়ান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে, সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন করস্পর্শ হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান কর। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় কেন চাহিয়া রহিয়াছ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন?"

মাধবাচার্য্য এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ—ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করা হইবে না। বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। আমি আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে। অস্ত্র শস্ত্রাদি গৃহমধ্য হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।"

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হানি নাই—আমি আশা ভরসা বিসর্জ্জন করিয়াছি। চলুন। কিন্তু আপনি—কামচর না অন্তর্যামী?"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এবং আপনার সম্পত্তি এক জন বাহকের স্কন্ধে দিয়া আচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লুব্ধ

মৃণালিনী বা গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্শ্বে সংমিলিত হইলেন। মৃণালিনী গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "কই, হেমচন্দ্র কোথায়?"

গিরিজায়া কহিল, "তিনি আইসেন নাই।"

"আইসেন নাই।" এই কথাটি মৃণালিনীর অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল। ক্ষণেক উভয়ে নীরব। তৎপরে মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আসিলেন না?"

গি। তাহা আমি জানি না। এই পত্র দিয়াছেন।

এই বলিয়া গিরিজায়া তাঁহার হস্তে পত্র দিল। মৃণালিনী কহিলেন, "কি প্রকারেই বা পড়ি। গৃহে গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িলে মণিমালিনী উঠিবে।"

গিরিজায়া কহিল, "অধীরা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল, চক্‌মকি, সোলা সকলই আনিয়া রাখিয়াছি। এখনই আলো করিতেছি।"

গিরিজায়া শীঘ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জ্বালিত করিল। অগ্ন্যুৎপাদন-শব্দ একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল। দীপালোক সে দেখিতে পাইল।

গিরিজায়া দীপ জ্বালিত করিলে মৃণালিনী নিম্নলিখিত মত মনে মনে পাঠ করিলেন।

"মৃণালিনি! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব? তুমি আমার জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবানুগ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্রণয়ী মনে করিবে—অথবা অন্যা হইলে মনে করিত—তুমি করিবে না। আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি—যদি তৎপ্রতি অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। তৎসাধন জন্য আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি যে তোমার জন্য সত্যভঙ্গ করিব, তোমারও এমন সাধ নহে। অতএব এক বৎসর কোন ক্রমে দিন যাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুরবধূ করিয়া আত্মসুখ সম্পূর্ণ করিব। এই অল্পবয়স্কা প্রগল্‌ভবুদ্ধি বালিকাহস্তে উত্তর প্রেরণ করিও।"

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া! আমার পাতা লেখনী কিছুই নাই যে উত্তর লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও। তুমি বিশ্বাসী, পুরস্কার স্বরূপ আমার অঙ্গের অলঙ্কার দিতেছি।"

গিরিজায়া কহিল, "উত্তর কাহার নিকট লইয়া যাইব? তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, 'আজ রাত্রেই আমাকে প্রত্যুত্তর আনিয়া দিও।' আমিও স্বীকার করিয়াছিলাম। আসিবার সময় মনে করিলাম, হয়ত তোমার নিকট লিখিবার সামগ্রী কিছুই নাই; এজন্য সে সকল যোটপাট করিয়া আনিবার জন্য

তাঁহার উদ্দেশে গেলাম। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। শুনিলাম তিনি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন।"

মৃ। নবদ্বীপ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। সন্ধ্যাকালেই?

গি। সন্ধ্যাকালেই। শুনিলাম তাঁহার গুরু আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য্য! মাধবাচার্য্যই আমার কাল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।"

গিরিজায়া কহিল, "আমি চলিলাম।" এই বলিয়া গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃদু মৃদু গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে মৃণালিনী গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। মৃণালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল, "তবে সাধ্বি! এইবার জালে পড়িয়াছ। অনুগৃহীত ব্যক্তিটা কে শুনিতে পাই না?"

মৃণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন, "ব্যোমকেশ! ব্রাহ্মণকুলে পাষণ্ড! হাত ছাড়।"

ব্যোমকেশ হৃষীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোর মূর্খ এবং দুশ্চরিত্র। সে মৃণালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং স্বাভিলাষ পূরণের অন্য কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলপ্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতেন না, এ জন্য ব্যোমকেশ এ পর্য্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃণালিনীর ভর্ৎসনায় ব্যোমকেশ কহিল, "কেন হাত ছাড়িব? হাতছাড়া কি করতে আছে? ছাড়াছাড়িতে কাজ কি, ভাই? একটা মনের দুঃখ বলি, আমি কি মনুষ্য নই? যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না?"

মৃ। কুলাঙ্গার! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকিয়া গৃহস্থ সকলকে উঠাইব।

ব্যো। উঠাও। আমি কহিব অভিসারিকাকে ধরিয়াছি।

মৃ। তবে অধঃপাতে যাও। এই বলিয়া মৃণালিনী সবলে হস্তমোচন জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, "অধীর হইও না। আমার মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিব। এখন তোমার সেই ভগিনী মণিমালিনী কোথায়?"

মৃ। আমিই তোমার ভগিনী।

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর ভগিনী—আমার ব্রাহ্মণীর ভেয়ের ভগিনী—আমার প্রাণাধিকা রাধিকা! সর্ব্বার্থসাধিকা!

এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যখন মাধবাচার্য্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, তখন মৃণালিনী স্ত্রীস্বভাবসুলভ চীৎকারে রতি দেখান নাই, এখনও শব্দ করিলেন না।

কিন্তু মৃণালিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। ব্যোমকেশ লাথি খাইয়া বলিল, "ভাল ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "আর আমি তোমার অর্জ্জুন।"

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "রাক্ষসি! তোর দন্তে কি বিষ আছে?" এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া আপন পৃষ্ঠে হস্ত-মার্জ্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিল যে পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিত রুধির পড়িতেছে।

মৃণালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও প্রথমে ব্যোমকেশের ন্যায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কেন না তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভল্লুকোচিত কার্য্য তাঁহার করণীয় নহে। কিন্তু তখনই নক্ষত্রালোকে খর্ব্বাকৃতা বালিকামূর্ত্তি সম্মুখ হইতে অপসৃতা হইতেছে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহার বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে, "পলাইয়া আইস" বলিয়া স্বয়ং পলায়ন করিল।

পলায়ন মৃণালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে। তিনি পলায়ন করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি গজেন্দ্র-গমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল। সম্মুখে হৃষীকেশ। হৃষীকেশ পুত্রকে শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? কেন ষাঁড়ের মত চীৎকার করিতেছ?"

ব্যোমকেশ কহিল, "মৃণালিনী অভিসারে গমন করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে।"

হৃষীকেশ পুত্রের কুরীতি কিছুই জানিতেন না। মৃণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল। তৎকালে তিনি মৃণালিনীকে কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে গজগামিনীর পশ্চাৎ তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হৃষীকেশ

মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া হৃষীকেশ কহিলেন, "মৃণালিনি! তামার এ কি চরিত্র?"

মৃ। আমার কি চরিত্র?

হৃ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, গুরুর অনুরোধে আমি তামাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। তুমি আমার মেয়ে মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শাও—তোমার কুলটাবৃত্তি কেন?

মৃ। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী।

হৃষীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন, "কি পাপীয়সী! আমার অন্নে দর পূরাবি, আর আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ। না হয় াধবাচার্য্য রাগ করিবেন, তা বলিয়া এমন কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না।"

মৃ। যে আজ্ঞা—কালি প্রাতে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

হৃষীকেশের বোধ ছিল যে, যে কালে তাঁহার গৃহবহিষ্কৃত হইলেই মৃণালিনী াশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন উত্তর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু মৃণালিনী রাশ্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতা নহেন দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি জারগৃহে স্থান াইবার ভরসাতেই এরূপ উত্তর করিলেন। ইহাতে হৃষীকেশের কোপ আরও বৃদ্ধি হইল। চনি অধিকতর বেগে কহিলেন, "কালি প্রাতে! আজই দূর হও।"

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীর নিকট বিদায় হইয়া আজই দূর ইতেছি।

এই বলিয়া মৃণালিনী গাত্রোত্থান করিলেন।

হৃষীকেশ কহিলেন, "মণিমালিনীর সহিত কুলটার আলাপ কি?"

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল। কহিলেন, "তাহাই হইবে। আমি কিছুই লইয়া আসি নাই; কিছুই লইয়া যাইব না। একবসনে চলিলাম। আপনাকে প্রণাম হই।"

এই বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মৃণালিনী শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া চলিলেন।

যেমন অন্যান্য গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তদ্রূপ উঠিয়াছিলেন। মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা শয্যাগৃহ পর্য্যন্ত আসিলেন দেখিয়া তিনি এই অবসরে ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন; এবং ভ্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। যখন তিনি ভর্ৎসনা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন প্রাঙ্গণভূমে, দ্রুতপাদবিক্ষেপিণী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই, অমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "সখি, মণিমালিনী, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না—তোমার বাপ মানা করেছেন।"

মণি। সে কি মৃণালিনী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সর্ব্বনাশ! বাবা কি বলি[illegible] না জানি কি বলিয়াছেন। সখি, ফের। রাগ করিও না।

মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। পর্ব্বতসানুবাহী শিলাখণ্ডের ন্যায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন। তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃসন্নিধানে আসিলেন। মৃণালিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বসঙ্কেত স্থানে গিরিজায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিলাম। তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।

মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে?

গি। তা ক্ষতি কি? বামুন বৈ ত গরু নয়?

মৃ। কিন্তু তুমি যে গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম?

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। :খ মনে হলো, মিন্সে আমাকে একদিন "কালা পিঁপ্‌ড়ে" বলে ঠাট্টা করেছিল। সে দিন ' ফুটানটা বাকি ছিল। সুযোগ পেয়ে বামুনের ঋণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা ইবে ?

মৃ। তোমার ঘরদ্বার আছে ?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। সেখানে আর কে থাকে ?

গি। এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ি বলি।

মৃ। চল তোমার ঘরে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরিজায়া কহিল, "কিন্তু সে ত ড়। সেখানে কয় দিন থাকিবে ?"

মৃ। কালি প্রাতে অন্যত্র যাইব।

গি। কোথা ? মথুরায় ?

মৃ। মথুরায় আমার আর স্থান নাই।

গি। তবে কোথায় ?

মৃ। যমালয়।

এই কথার পর দুই জনে ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া রহিল। তার পর মৃণালিনী লল, "এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় ?"

গি। বিশ্বাস হইবে না কেন ? কিন্তু সে স্থান ত আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই ইতে পারিবে। এখন কেন আর এক স্থানে যাও না ?

মৃ। কোথা ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ভিখারিণী বেশে কোন মায়াবিনী। তোমার নিকট ান কথা গোপন করিব না। বিশেষ তুমি হিতৈষী। নবদ্বীপেই যাইব স্থির রিয়াছি।

গি। একা যাইবে ?

মৃ। সঙ্গী কোথায় পাইব ?

গি। (গায়িতে গায়িতে)

"মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে॥
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে॥

মৃ। এ কি রহস্য, গিরিজায়া ?

গি। আমি যাব।

মৃ। সত্য সত্যই ?

গি। সত্য সত্যই যাব।

মৃ। কেন যাবে ?

গি। আমার সর্ব্বত্র সমান। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌড়েশ্বর

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ রিতেছেন। উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বেদির উপরে রত্নপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবাল-ণ্ডত ছত্রতলে বর্ষীয়ান্ রাজা বসিয়া আছেন। শিরোপরি কনককিঙ্কিণী সংবেষ্টিত বিচিত্র ারুকার্য্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষ-ভূষিত, অনিন্দ্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে াসনে, এক দিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী টুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্য দিকে মহামাত্য ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, পরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকগণ, ক্যত্রপ, প্রান্তপালেরা, াষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিক্য, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। হাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাধারণতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয় পার্শ্বে শ্রণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া ণ্ডিতবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্য্যসকল সমাপ্ত হইলে, সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন াধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জ্জনা রিবেন। আপনি রাজনীতিবিশারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলে যত রাজগণ আছেন সর্ব্বাপেক্ষা দূরদর্শী; প্রজাপালক; আপনিই আজন্ম রাজা। আপনার অবিদিত নাই যে, শত্রুদমন াজার প্রধান কর্ম্ম। আপনি প্রবল শত্রুদমনের কি উপায় করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?" সকল কথা বর্ষীয়ান্ রাজার শ্রুতিসুলভ হয় নাই।

মাধবাচার্য্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! মাধবাচার্য্য রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রুদমনের কি উপায় হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্য্যন্ত দমিত হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি সবিশেষ বাচন করুন।"

মাধবাচার্য্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বরে কহিলেন, "মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়-রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।"

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। তিনি কহিলেন, "তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন; এখনও তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্তু আসিলে আপনি কি প্রকারে তাহাদিগের নিবারণ করিবেন?"

রাজা কহিলেন, "আমি কি করিব—আমি কি করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক।"

এবম্ভূত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্য্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবশ্য ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ভাল সভাপণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন?"

দামোদর কহিলেন, "বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—"

মাধ। 'যথা' থাকুক—বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন; দেখান এরূপ উক্তি কোথায় আছে?

দামো। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম? ভাল, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, মন্ত্রতে ধা আছে কি না?

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রেরও কি পারদর্শী নহেন?

দামো। কি জ্বালা! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। আপনার ধ সরস্বতী বিমনা হয়েন, আমি কোন্ ছার? আপনার সম্মুখে গ্রন্থের নাম স্মরণ। না; কিন্তু কবিতাটা শ্রবণ করুন।

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্টুপ্ ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া বেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তুরকজাতীয় কর্ত্তৃক বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।

পশুপতি কহিলেন, "আপনি কি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পন্ন করুন?"

সভাপণ্ডিতের এক জন পারিষদ্ কহিলেন, "আমি করিব। আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে দ্ধ। যে আত্মশ্লাঘাপরবশ, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "মূর্খ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার পোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ধ মূর্খ।"

সভাপণ্ডিতের পারিষদ্ অধোবদনে উপবেশন করিলেন।

পশুপতি কহিলেন, "যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "সাধু! সাধু! আপনার যেরূপ যশঃ, সেইরূপ প্রস্তাব লন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন! আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, যদি অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে?"

পশুপতি কহিলেন, "মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য। এ সভাতলে প্রকাশ্য নহে। কিন্তু শ্ব, পদাতি এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্য্যটন করিলে জানিতে পারিবেন।"

মা। কতক কতক জানিয়াছি।

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন?

মা। প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য। আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে।

মা। যবনবিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন। এই মাত্র কারণ।

প। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ?

মা। আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ডবিধান করিবেন। গৌড়রাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া উভয়ে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল।

প। রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে। তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে।

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমনির্ম্মিতা

উপনগর প্রান্তে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থে রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পরামর্শানুসারে সুরম্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দ্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বয়োবাহুল্যপ্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ। অথচ নিঃসহায়। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছু দিন হইল, ইহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি ইঁহারা আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া বাসান্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।" ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ কার্য্য ভৃত্য দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না।"

ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না—কেন না, তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমান প্রযুক্ত ভৃত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এজন্য স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

জনার্দ্দন আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

হে। আমি আপনার ভৃত্য।

জ। কি বলিলে—তোমার নাম রামকৃষ্ণ?

হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতর-স্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।"

জ। ভাল ভাল; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম হনূমান্ দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "নামের কথা দূর হউক। কার্য্যসাধন হইলেই হইল।" বলিলেন, "নবদ্বীপাধিপতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিলাম আমার আসায় আপনি স্থান ত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না, এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

হে। (অত্যুচ্চৈঃস্বরে) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না? তোমার বাটীতে কি? আদ্য শ্রাদ্ধ?

হে। ভাল; আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেরূপ এ বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন,

প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণকৌশল-সীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, "তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমা কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?"

বালিকা বলিল, "আমি মনোরমা।"

হে। ইনি তোমার পিতামহ?

মনো। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?

হে। শুনিলাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

ম। কেন?

এ 'কেন'র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অন্য উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?"

ম। তুমি কি আমার ভাই?

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী?" কহিলেন, "কেন তিরস্কার করিব?"

ম। যদি আমি দোষ করি?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?"

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?

হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, "আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি?"

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দ্দনের নি ট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন।

হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং কহিলেন, "মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন—আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং "ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ। কাণে কম শোনেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৌকাযানে

হেমচন্দ্র ত উপবনগৃহে সংস্থাপিত হইলেন। আর মৃণালিনী? নির্ব্বাসিতা, পরপীড়িতা, সহায়হীনা মৃণালিনী কোথায়?

সান্ধ্য গগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহু লোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল। নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিঙ্গী অন্য

নৌকা হইতে পৃথক্ এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকেরা আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র তরণীতে দুইটিমাত্র আরোহী। দুইটিই স্ত্রীলোক। পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃণালিনী আর গিরিজায়া।

গিরিজায়া মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আজিকার দিন কাটিল।"

মৃণালিনী কোন উত্তর করিল না।

গিরিজায়া পুনরপি কহিল, "কালিকার দিনও কাটিবে—পরদিনও কাটিবে—কেন কাটিবে না?"

মৃণালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না; কেবলমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণি! এ কি এ? দিবানিশি চিন্তা করিয়া কি হইবে? যদি আমাদিগের নদীয়া আসা কাজ ভাল না হইয়া থাকে, চল, এখনও ফিরিয়া যাই।"

মৃণালিনী এবার উত্তর করিলেন। বলিলেন, "কোথায় যাইবে?"

গি। চল, হৃষীকেশের বাড়ী যাই।

মৃ। বরং এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিব।

গি। চল, তবে মথুরায় যাই।

মৃ। আমি ত বলিয়াছি, তথায় আমার স্থান নাই। কুলটার ন্যায় রাত্রিকালে যে বাপের ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব?

গি। কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ ভাবিয়াও আইস নাই। যাইতে ক্ষতি কি?

মৃ। সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যে বাপের ঘরে আদরের প্রতিমা ছিলাম, সে বাপের ঘরে ঘৃণিত হইয়াই বা কি প্রকারে থাকিব?

গিরিজায়া অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, মৃণালিনীর চক্ষু হইতে বারিবিন্দুর পর বারিবিন্দু পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া কহিল, "তবে কোথায় যাইবে?"

মৃ। যেখানে যাইতেছি।

গি। সে ত সুখের যাত্রা। তবে অন্যমন কেন? যাহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, ইহার অপেক্ষা সুখ আর কি আছে?

মৃ। নদীয়ায় আমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না।

গি। কেন? তিনি কি সেখানে নাই?

মৃ। সেইখানেই আছেন। কিন্তু তুমি ত জান যে, আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত। আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব?

গিরিজায়া নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী আবার কহিলেন, "আর কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব? আমি কি বলিব যে, হৃষীকেশের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি, না, বলিব যে, হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে?"

গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, "তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না?"

মৃ। না।

গি। তবে যাইতেছ কেন?

মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।

গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না। বলিল, "তবে আমি গীত গাই,

চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন॥

ঠাকুরাণি, তুমি তাঁহাকে দেখিয়া ত জীবনধারণ করিবে। আমি তোমার দাসী হইয়াছি, আমার ত তাহাতে পেট ভরিবে না, আমি কি খেয়ে বাঁচিব?"

মৃ। আমি দুই একটি শিল্পকর্ম্ম জানি। মালা গাঁথিতে জানি, চিত্র করিতে জানি, কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানি। তুমি বাজারে আমার শিল্পকর্ম্ম বিক্রয় করিয়া দিবে।

গিরি। আর আমি ঘরে ঘরে গীত গায়িব। "মৃণাল অধমে" গাইব কি?

মৃণালিনী অর্দ্ধহাস্য, অর্দ্ধ সকোপ দৃষ্টিতে গিরিজায়ার প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, "অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত গায়িব।" এই বলিয়া গায়িল,

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিল, "যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "আগে কি জানি।" বলিয়া গায়িতে লাগিল,

"ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
এখন—গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিল, "কূলে ফিরিয়া যাও না কেন?"

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

"মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "তবে ডুবিয়া মর না কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু" বলিয়া আবার গায়িল,

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, এ কোন অপ্রেমিকের গান।"

গি। কেন?

মৃ। আমি হইলে তরী ডুবাই।

গি। সাধ করিয়া?

মৃ। সাধ করিয়া।

গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাতায়নে

হেমচন্দ্র কিছু দিন উপবনগৃহে বাস করিলেন। জনার্দ্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরতাপ্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র। মনোরমার সহিতও সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোরমা কখন তাঁহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন বা বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বস্তুতঃ মনোরমার প্রকৃতি

তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তাঁহার বয়ঃক্রম স্বল্পমেয়, সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাম্ভীর্য্যশালিনী দেখিতেন। মনোরমা কি অদ্যাপি কুমারী? হেমচন্দ্র এক দিন কথোপকথনচ্ছলে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা?" মনোরমা কহিল, "বলিতে পারি না।" আর এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইয়াছ?" মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, "বলিতে পারি না।"

মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ সময় গৌড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবদ্বীপে সসৈন্য সমবেত হইয়া গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্কর্ম্মে দিনযাপন ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, দিগ্বিজয়কে গৃহরক্ষায় রাখিয়া অশ্ব লইয়া একবার গৌড়ে গমন করেন। কিন্তু তথায় মৃণালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, বিনা সাক্ষাতে গৌড়যাত্রায় কি ফলোদয় হইবে? এই সকল আলোচনায় যদিও গৌড়যাত্রায় হেমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন, তথাপি অনুদিন মৃণালিনীচিন্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মৃণালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় সুখলাভ করিতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে হেমচন্দ্র প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্ম্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, ক্বচিৎ স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল-তরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী। নববারি-সমাগমজনিত কল্লোল হেমচন্দ্র শুনিতে পাইতেছিলেন। বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্ল বন্যকুসুমসংস্পর্শে সুগন্ধি; চন্দ্রকর-প্রতিঘাতী-শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীরবিরাজিত কাশকুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছিল। হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকের গতি রোধ হইল। হেমচন্দ্র বাতায়নসন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। বাতায়ন, ভূমি হইতে কিছু উচ্চ—

কিন্তু কাহারও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মুখ দেখিলেন। মুখখানি অতি বিশালশ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ। সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, বাতায়নের নিকটে, সম্মুখে শ্মশ্রুসংযুক্ত উষ্ণীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, হেমচন্দ্র শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন।

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন যে, বাতায়নে আর মনুষ্যমুণ্ড নাই।

হেমচন্দ্র অসিহস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাতায়নতলে আসিলেন। তথায় কেহ নাই।

গৃহের চতুঃপার্শ্বে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকে দেখিলেন না।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধ্‌বেশে আপাদ-মস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন। অকালজলদোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাপীকূলে

অকালজলদোদয়স্বরূপ ভীমমূর্ত্তি রাজপুত্র হেমচন্দ্র তুরকের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন আহার্য্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তুরকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না।

হেমচন্দ্র একটিমাত্র তুরক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুকায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্ব্বচর। যদি তুরকসেনাই আসিয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। যে মহৎকার্য্য জন্য মৃণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অস্ত রাত্রিতে

নিয়াতিভূত হইয়া সে কর্ম্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষ যবনবধে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ। উষ্ণীষধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি তাঁহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্থির হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন।

উপবনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরল-লোক-প্রবাহ গ্রাম্য পথ মাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন। সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত, সুরম্য সোপানাবলিশোভিত এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাপার্শ্বে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্বত্থ, বট, আম্র, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি যে সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত ছিল, এমত নহে, বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া বাপীতীরে ঘনান্ধকার করিয়া রহিত। দিবসেও তথায় অন্ধকার। কিম্বদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতিবাসীদিগের মনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সচরাচর তথায় কেহ যাইত না। যদি যাইত, তবে একাকী কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

পৌরাণিক ধর্ম্মের একাধিপত্যকালে হেমচন্দ্রও ভূতযোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু প্রেতসম্বন্ধে প্রত্যয়শালী বলিয়া তিনি গন্তব্য পথে যাইতে সঙ্কোচ করেন, এরূপ ভীরুস্বভাব নহেন। অতএব তিনি নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন। নিঃসঙ্কোচ বটে, কিন্তু কৌতূহলশূন্য নহেন। বাপীর পার্শ্বে সর্ব্বত্র এবং তত্তীরপ্রতি অনিমেষলোচন নিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিলেন। সোপানমার্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জনশ্রুতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্ব্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসন-পরিধানা কে বসিয়া আছে: স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণী-সম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। প্রেত বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয়? এত রাত্রে কে এ স্থানে? সে ত তুরককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাপীতীরারোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রেতিনী তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও সরিল না, পূর্ব্বমত রহিল। হেমচন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিলেন। তখন সে

উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিল; হস্তদ্বারা মুখাবরণকারী কেশদাম অপসৃত করিল। হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতেন না। কহিলেন, "কে, মনোরমা। তুমি এখানে?"।

মনোরমা কহিল, "আমি এখানে অনেকবার আসি—কিন্তু তুমি এখানে কেন?

হেম। আমার কর্ম্ম আছে।

মনো। এ রাত্রে কি কর্ম্ম?

হেম। পশ্চাৎ বলিব; তুমি এ রাত্রে এখানে কেন?

মনো। তোমার এ বেশ কেন? হাতে শূল; কাঁকালে তরবারি; তরবারে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি হীরা? মাথায় এ কি? ইহাতে ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি? এও কি হীরা? এত হীরা পেলে কোথা?

হেম। আমার ছিল।

মনো। এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে?

হেম। আমার নিকট হইতে চোরে কাড়িতে পারে না।

মনো। তা এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? তুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ?

হেম। তোমার কি বোধ হয়, মনোরমা?

মনো। মানুষ মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ করিতে যায় না। তুমি যুদ্ধে যাইতেছ।

হেম। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমিই বা এখানে কি করিতেছিলে?

মনো। স্নান করিতেছিলাম। স্নান করিয়া বাতাসে চুল শুকাইতেছিলাম। এই দেখ, চুল এখনও ভিজা রহিয়াছে।

এই বলিয়া মনোরমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পর্শ করাইলেন।

হেম। রাত্রে স্নান কেন?

মনো। আমার গা জ্বালা করে।

হেম। গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন?

মনো। এখানকার জল বড় শীতল।

হেম। তুমি সর্ব্বদা এখানে আইস?

মনো। আসি।

হেম। আমি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি—তোমার বিবাহ হইবে। বিবাহ হইলে [illegible] কি প্রকারে আসিবে?

মনো। আগে বিবাহ হউক।

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তোমার লজ্জা নাই—তুমি কালামুখী।"

মনো। তিরস্কার কর কেন? তুমি যে বলিয়াছিলে, তিরস্কার করিবে না।

হেম। সে অপরাধ লইও না। এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?

মনো। দেখিয়াছি।

হেম। তাহার কি বেশ?

মনো। তুরকের বেশ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে?"

মনো। আমি পূর্ব্বে তুরক দেখিয়াছি।

হেম। সে কি? কোথায় দেখিলে?

মনো। যেখানে দেখি না—তুমি কি সেই তুরকের অনুসরণ করিবে?

হেম। করিব—সে কোন্ পথে গেল?

মনো। কেন?

হেম। তাহাকে বধ করিব।

মনো। মানুষ মেরে কি হবে?

হেম। তুরক আমার পরম শত্রু।

মনো। তবে একটি মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে?

হেম। আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব।

মনো। পারিবে?

হেম। পারিব।

মনোরমা বলিল, "তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস।"

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যবনযুদ্ধে এই বালিকা পথপ্রদর্শিনী!

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, "আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?"

হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন, মনোরমা কি মানুষী ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পশুপতি

গৌড়দেশের ধর্ম্মাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। রাজা বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যের ধর্ম্মানুসারে পরমতাবলম্বী এবং রাজকার্য্যে অযত্নবান্ হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানামাত্য ধর্ম্মাধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল। এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্য্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দিরস্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞানগাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পরুষভাবপ্রকাশক। তাহা হইলে কি হয়, রাজসভাতলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের পর কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদতুল্য উচ্চ

অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামানয়ননিঃসৃত জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।

আজি রাত্রে সেই উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে পশুপতি একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতেই আম্রকানন। আম্রকাননে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে, মৃদু মৃদু কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান। হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি, তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন।

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, "বুঝিলাম আপনি তুরকসেনাপতির বিশ্বাসপাত্র। সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। আপনারই নাম মহম্মদ আলি? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

যবন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতের তিন ভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলিরই সৃষ্ট সংস্কৃত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন। পাঠক মহাশয়ের সে কষ্টভোগের প্রয়োজন নাই, আমরা তাঁহার সুবোধার্থ সে নূতন সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

যবন কহিল, "খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন?"

পশুপতি কহিলেন, "আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না, তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কর্ম্ম কেন করিব?"

য। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন?

প। তাঁহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা জানিবার জন্য।

য। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া যাই। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ।

প। মনুষ্যযুদ্ধে, পশুযুদ্ধে চ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ?

মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, "গৌড়ে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসা পশুযুদ্ধেই আসা। বুঝিলাম, ব্যঙ্গ করিবার জন্যই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমরা যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি না। যাহা জানি, তাহা করিব।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি গমনোদ্যোগী হইল। পশুপতি কহিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আর কিছু শুনিয়া যান। আমি যবনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি; অক্ষমও নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেনরাজা নামমাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব?"

মহম্মদ আলি কহিলেন, "আপনি কি চাহেন?"

প। খিলিজি কি দিবেন?

য। আপনার যাহা আছে, তাহা সকলই থাকিবে—আপনার জীবন, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলই থাকিবে। এই মাত্র।

প। তবে আমি পাইলাম কি? এ সকলই ত আমার আছে—কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিব?

য। আমাদের আনুকূল্য না করিলে কিছুই থাকিবে না; যুদ্ধ করিলে, আপনার ঐশ্বর্য্য, পদ, জীবন পর্য্যন্ত অপহৃত হইবে।

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না। আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিবেন না। বিশেষ মগধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হইতেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জন্য এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত, গৌড়জয় চেষ্টা আপাততঃ কিছু দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন না দিবেন; কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি স্থির হয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম সময়। যখন বিহারে বিদ্রোহিসেনা সজ্জিত হইবে, গৌড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে।

ম। ক্ষতি কি? পিঁপড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুরস্কার কি, তাহা শুনিয়া যাইতে বাসনা করি।

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, কিন্তু লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোপ হইয়া পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন? আমাদিগকে কি দিবেন?

প। রাজকর মাত্র। মুসলমানের অধীনে করপ্রদ মাত্র রাজা হইব।

ম। ভাল; আপনি যদি প্রকৃত গৌড়েশ্বর, রাজা যদি আপনার এরূপ করতলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত আপনার কথাবার্ত্তার আবশ্যক কি? আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন কি? আমাদিগকে কর দিবেন কেন?

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব। ইহাতে কপটতা করিব না। প্রথমতঃ সেনরাজ আমার প্রভু; বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন। স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করি—তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া, আমার আনুকূল্যে বিনা যুদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে সে নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত হইলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ আমি স্বয়ং রাজা হইলে এক্ষণে সেনরাজার সহিত আপনাদিগের যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আমাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে। যুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি—কিন্তু জয় পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। জয় হইলে আমার নূতন কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু পরাজয়ে সর্ব্বস্বহানি। কিন্তু আপনাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। বিশেষতঃ সর্ব্বদা যুদ্ধোদ্যত থাকিতে হইলে নূতন রাজ্য সুশাসিত হয় না।

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজ একেশ্বর হইবেন, অন্য রাজার নামমাত্র আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে গৌড়ে শাসনকর্ত্তা করিব। যেমন দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন, যেমন পূর্ব্বদেশে কুতবউদ্দীনের প্রতিনিধি বখ্‌তিয়ার খিলিজি, তেমনই গৌড়ে আপনি বখ্‌তিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে স্বীকৃত আছেন কি না?

পশুপতি কহিলেন, "আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।"

ম। ভাল; কিন্তু আমার আর এক কথা জিজ্ঞাসা আছে। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি?

প। আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে। আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ

হইবে না। পাঁচ জন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে বলিও; কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না, "কে তোমরা?"

ম। আরও এক কথা বাকি আছে। এই দেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রে তাহার মুণ্ড যবন-শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।

প। আপনারা আসিয়াই তাহা ছেদন করিবেন—আমি শরণাগত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব?

ম। আমাদিগের হইতে হইবে না। যবন-সমাগম শুনিবা মাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে। আজি সে নিশ্চিন্ত আছে। আজি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বধ করুন।

প। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

ম। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

প। যে আজ্ঞা। আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

ম। কি, আজ্ঞা করুন।

প। আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে যদি আপনারা আমাকে বহিষ্কৃত করেন?

ম। আমরা আপনার কথায় নির্ভর করিয়া অল্পমাত্র সেনা লইয়া দূত পরিচয়ে পুরপ্রবেশ করিব। তাহাতে যদি আমরা স্বীকার মত কর্ম্ম না করি, আপনি সহজেই আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

প। আর যদি আপনারা অল্প সেনা লইয়া না আইসেন?

ম। তবে যুদ্ধ করিবেন।

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৌরোদ্ধরণিক

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্য এক জন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "প্রবেশ করিব?"

পশুপতি কহিলেন, "কর।"

এক জন চৌরোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত হইলে পশুপতি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শান্তশীল। মঙ্গল সংবাদ ত?"

চৌরোদ্ধরণিক কহিল, "আপনি একে একে প্রশ্ন করুন—আমি ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

পশু। যবনদিগের অবস্থিতি স্থানে গিয়াছিলে?

শান্ত। সেখানে কেহ যাইতে পারে না।

পশু। কেন?

শান্ত। অতি নিবিড় বন, দুর্ভেদ্য।

পশু। কুঠারহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে গেলে না কেন?

শান্ত। ব্যাঘ্র ভল্লুকের দৌরাত্ম্য।

পশু। সশস্ত্রে গেলে না কেন?

শান্ত। যে সকল কাঠুরিয়ারা ব্যাঘ্র ভল্লুক বধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই যবন-হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—কেহই ফিরিয়া আইসে নাই।

পশু। তুমিও না হয় না আসিতে?

শান্ত। তাহা হইলে কে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিত?

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তুমিই আসিতে।"

শান্তশীল প্রণাম করিয়া কহিল, "আমিই সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

পশুপতি আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে গেলে?"

শান্ত। প্রথমে উষ্ণীষ অস্ত্র ও তুরকী বেশ সংগ্রহ করিলাম। তাহা বাঁধিয়া পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিলাম। তার উপর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বন-পথে প্রবেশ করিলাম। পরে যখন যবনেরা কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল—তখন আমি অপসৃত হইয়া বৃক্ষান্তরালে বেশপরিবর্ত্তন করিলাম। পরে মুসলমান হইয়া যবন-শিবিরে সর্ব্বত্র বেড়াইলাম।

পশু। প্রশংসনীয় বটে। যবন-সৈন্য কত দেখিলে?

শান্ত। সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয়, পঁচিশ হাজার হইবে।

পশুপতি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "তাহাদিগের কথাবার্ত্তা কি শুনিলে?"

শান্ত। বিস্তর শুনিলাম—কিন্তু তাহার কিছুই আপনার নিকট নিবেদন করিতে পারিলাম না।

পশু। কেন?

শান্ত। যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি।

পশুপতি হাস্য করিলেন। শান্তশীল তখন কহিলেন, "মহম্মদ আলি এখানে যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ্ আশঙ্কা করিতেছি।"

পশুপতি চমকিত হইয়া কহিলেন, "কেন?"

শান্ত। তিনি অলক্ষিত হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, "কিসে জানিলে?"

শান্তশীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণ দর্শনে আসিবার সময় দেখিলাম যে, বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল। তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝিলাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না।"

পশু। তার পর?

শান্ত। তার পর দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

পশুপতি চৌরোদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, "কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি বিহিত করা যাইবেক। আজি রাত্রিতে সে কারারুদ্ধই থাক্। এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে। যবন-সেনাপতির ইচ্ছা, অদ্য রাত্রিতে তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শন করেন। তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে।"

শান্ত। কার্য্য নিতান্ত সহজ নহে। রাজপুত্র পিঁপ্ড়ে মাছি নন।

পশু। আমি তোমাকে একা যুদ্ধে যাইতে বলিতেছি না। কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবে।

শান্ত। লোকে কি বলিবে?

পশু। লোকে বলিবে, দস্যুতে তাঁহাকে মারিয়া গিয়াছে।

শান্ত। যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম।

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। পরে গৃহাভ্যন্তরে যথা বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত মন্দিরে অষ্টভুজা মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া

প্রতিমাগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া যুক্তকরে ভক্তিভাবে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, "জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎপ্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।"

এই বলিয়া পশুপতি পুনরপি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়া দেখিলেন—অপূর্ব্ব দর্শন—

সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।

তরুণী বীণানিন্দিত স্বরে কহিলেন, "পশুপতি!"

পশুপতি দেখিলেন—মনোরমা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মোহিনী

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনোরমা নিতান্ত খর্ব্বাকৃতা নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্ব্বচনীয় কোমল, অনির্ব্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা বয়সের ঔদার্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোজ্জ্বল রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বু-বিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশসকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে। মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার; সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য; সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথসময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য; আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে, ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যঃপ্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মোহিতা

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগল্ভ বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিজ্ঞা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ?—এ কি? আজি তোমার এ ভাব কেন?"

মনোরমা উত্তর করিলেন, "আমার কি ভাব দেখিলে?"

প। তোমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা—সে মূর্ত্তিতে কেন আসিলে না?—সেইরূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখরবুদ্ধিশালিনী—এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, তুমি কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজি তুমি এ মূর্ত্তিতে আমাকে ভয় দেখাইতে কেন আসিয়াছ?

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ?

প। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু তুমি—

ম। পশুপতি, আবার? রাজকার্য্যে না নিজকার্য্যে?

প। নিজকার্য্যই বল। রাজকার্য্যেই হউক, আর নিজকার্য্যেই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি? তুমি আজি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

ম। আমি সকল শুনিয়াছি।

প। কি শুনিয়াছ?

ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা—শান্তশীলের সঙ্গে মন্ত্রণা—দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘান্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম—না হয় তুমি আগে শুনিয়াছ। তুমি কোন্ কথা না জান?"

ম। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?

প। কেন, মনোরমা? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পশুপতি, সে সকল আমার স্বপ্ন মাত্র। তুমি রাজা হইলে, আমার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমি কখনও তোমার মহিষী হইব না।"

প। কেন মনোরমা?

ম। কেন? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আর কি আমায় ভালবাসিবে? রাজ্যই তোমার হৃদয়ে প্রধান স্থান পাইবে।—তখন আমার প্রতি তোমার অনাদর হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিলে—তবে আমি কেন তোমার পত্নীত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িব?

প। এ কথাকে কেন মনে স্থান দিতেছ? আগে তুমি—পরে রাজ্য। আমি চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজা হইয়া যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না। তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। স্ত্রৈণ-রাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; কহিলেন, "যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি? না হয়, তাহাই হউক। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিব।"

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন? ত্যাগের জন্য গ্রহণে ফল কি?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।

ম। সে আশা ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।

প। কেন, মনোরমা! আমি কি অপরাধ করিলাম?

ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক—আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব?

প। কেন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম?

ম। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা করিতেছ; ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম নয়? যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন?

পশুপতি নীরব হইয়া রহিলেন। মনোরমা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর।"

পশুপতি পূর্ব্ববৎ অধোবদনে রহিলেন। তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়। সেও অত্যাজ্য। উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। "যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি?" এইরূপ পুনঃ পুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে; সকলের ঘৃণিত হইব। তাহা কি প্রকারে সহিব?" পশুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।

অমনই মনোরমা আবার ফিরিল। আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিল। পশুপতি তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তেজোগর্ব্ববিশিষ্টা, কুঞ্চিতভ্রূবীচিবিক্ষেপ-কারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই; সে প্রতিভা দেবী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন; কুসুমসুকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন?"

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, "তোমার কথায়।"

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?

ম। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ফাঁদ

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্ত্তী হইয়া যবন-সন্ধানে আসিতেছিলেন। মনোরমা ধর্ম্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, "সম্মুখে এই অট্টালিকা দেখিতেছ?"

হেম। দেখিতেছি।

মনো। ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।

হেম। কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরমা কহিলেন, "তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে।"

হেম। তুমি কোথায় যাইবে?

মনো। আমিও এই বাড়ীতে যাইব।

হেমচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। মনোরমার আচরণ দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তাহার পরামর্শানুসারে পথিপার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইয়া রহিলেন। মনোরমা গুপ্তপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শান্তশীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইল। শান্তশীল সন্দেহপ্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে চৌর অনুমানে কহিল, "কে তুমি? এখানে কি করিতেছ?" পরে তৎক্ষণে হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কারশোভিত যোদ্ধৃবেশ দেখিয়া কহিল, "আপনি কে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যে হই না কেন?"

শা। আপনি এখানে কি করিতেছেন?

হেম। আমি এখানে যবনানুসন্ধান করিতেছি।

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, "যবন কোথায়?"

হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তশীল ভীত ব্যক্তির ন্যায় স্বরে কহিল, "এ গৃহে কেন?"

হে। তাহা আমি জানি না।

শা। এ গৃহ কাহার?

হেম। তাহা জানি না।

শা। তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, এই গৃহে যবন প্রবেশ করিয়াছে?

হেম। তা তোমার শুনিয়া কি হইবে?

শা। এই গৃহ আমার। যদি যবন ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্টকামনা করিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যোদ্ধা এবং যবনদ্বেষী দেখিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন—উভয়ে চোরকে ধৃত করিব।

হেমচন্দ্র সম্মত হইয়া শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। শান্তশীল সিংহদ্বার দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণ রত্নাদি সকল আছে, আপনি ইহার প্রহরায় অবস্থিতি করুন। আমি ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন লুক্কায়িত আছে।"

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং হেমচন্দ্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহির দিকে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন। হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্ত

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিল। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিল যে, ঐ ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

আসিয়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিল। হেমচন্দ্রকে কহিল, "হেমচন্দ্র, বাহির হইয়া যাও।"

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিলেন। মনোরমা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। তখন হেমচন্দ্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন?"

ম। তাহা পরে বলিব।

হে। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে?

ম। শান্তশীল।

হে। শান্তশীল কে?

ম। চৌরোদ্ধরণিক।

হে। এই কি তাহার বাড়ী?

ম। না।

হে। এ কাহার বাড়ী?

ম। পরে বলিব।

হে। যবন কোথায় গেল?

ম। শিবিরে গিয়াছে।

হে। শিবির! কত যবন আসিয়াছে?

ম। পঁচিশ হাজার।

হে। কোথায় তাহাদের শিবির?

ম। মহাবনে।

হে। মহাবন কোথায়?

ম। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে।

হেমচন্দ্র করলগ্নকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মনোরমা কহিল, "ভাবিতেছ কেন? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে?"

হে। পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একের যুদ্ধ সম্ভবে?

ম। তবে কি করিবে—ঘরে ফিরিয়া যাইবে?

হে। এখন ঘরে যাব না।

ম। কোথা যাবে?

হে। মহাবনে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ?

হে। যবনদিগকে দেখিতে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে ?

হে। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহাদিগকে মারিতে পারিব !

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিশ হাজার মানুষ মারিবে ? কি সর্ব্বনাশ। ছি। ছি !"

হে। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে ?

ম। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্য তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজি ঘরে যাইও না।

এই বলিয়া মনোরমা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অতিথি-সৎকার

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন ; এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন ; তৎপরে প্রান্তর। প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন। দেখিলেন, স্কন্ধে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, তিন জন অশ্বারোহী আসিতেছে।

হেমচন্দ্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান করিল। হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন।

অশ্বারোহিগণ পুনর্ব্বার একেবারে শরসংযোগ করিল। এবং তাহা নিবারিত হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার শরত্রয় ত্যাগ করিল।

এইরূপ অবিরতহস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্নাদিমণ্ডিত চর্ম্ম হস্তে লইলেন, এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই

শরজালবর্ষণ নিরাকরণ করিতে লাগিলেন ; কদাচিৎ দুই এক শর অশ্বশরীরে বিদ্ধ হইল মাত্র। স্বয়ং অক্ষত রহিলেন।

বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহিত্রয় নিরস্ত হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র সেই অবকাশে একজনের প্রতি এক শরত্যাগ করিলেন। সে অব্যর্থ সন্ধান। শর একজন অশ্বারোহীর ললাটমধ্যে বিদ্ধ হইল। সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ধরাতলশায়িত হইল।

তৎক্ষণাৎ অপর দুই জনে অশ্বে কশাঘাত করিয়া, শূলযুগল প্রণত করিয়া হেমচন্দ্রের প্রতি ধাববান হইল। এবং শূলক্ষেপযোগ্য নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল। যদি তাহারা হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শূল ত্যাগ করিত, তবে হেমচন্দ্রের বিচিত্র শিক্ষায় তাহা নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া আক্রমণকারীরা হেমচন্দ্রের অশ্বপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শূলত্যাগ করিয়াছিল। তত দূর অধঃপর্য্যন্ত হস্তসঞ্চালনে হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। একের শূল নিবারিত হইল, অপরের নিবারিত হইল না। শূল অশ্বের গ্রীবাতলে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র সে রমণীয় ঘোটক মুমূর্ষু হইয়া ভূতলে পড়িল।

সুশিক্ষিতের ন্যায় হেমচন্দ্র পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। এবং পলকমধ্যে নিজ করস্থ করাল শূল উন্নত করিয়া কহিলেন, "আমার পিতৃদত্ত শূল শত্রুরক্ত পান না করিয়া কখন ফেরে নাই।" তাঁহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন করিল। সেই শান্তশীল।

হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্কন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। তীর কিছু অধিক মাংসভেদ করিয়াছিল—মোচন মাত্র অতিশয় শোণিতস্রুতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র নিজ বস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। ক্রমে হেমচন্দ্র রক্তক্ষতি হেতু দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, যবন-শিবিরে গমনের অন্ত আর কোন সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হইয়াছে—নিজবল হত হইতেছে। অতএব অপ্রসন্ন মনে, ধীরে ধীরে, নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। তখন শরীর নিতান্ত অবশ হইয়া আসিল—শোণিতস্রোতে সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র হইল ; গতিশক্তি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। কষ্টে

নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর যাইতে পারেন না। এক কুটীরের নিকট বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম—রক্তস্রাবে বলহানি—এই সকল কারণে হেমচন্দ্রের চক্ষুতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল—নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গায়িতেছে,

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।"

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"উনি তোমার কে?"

যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটীর-মধ্যে এক পাটনী বাস করিত। কুটীরমধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন করিত। অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশুসন্তান সকল লইয়া শয়ন করিত। তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী কন্যা রত্নময়ী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল। সেই দুইটি স্ত্রীলোক পাঠক মহাশয়ের নিকট পরিচিতা; মৃণালিনী আর গিরিজায়া নবদ্বীপে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

একে একে তিনটি স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগরিতা হইল। প্রথমে রত্নময়ী জাগিল। গিরিজায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "সই?"

গি। কি সই?

র। তুমি কোথায় সই?

গি। বিছানাসই।

র। উঠ না সই।

গি। না সই।

র। গায়ে জল দিব সই।

গি। জলসই? ভাল সই, তাও সই।

র। নহিলে ছাড়ি কই।

গি। ছাড়িবে কেন সই? তুমি আমার প্রাণের সই—তোমার মত আছে কই? তুমি পারঘাটার রসমই—তোমায় না কইলে আর কারে কই?

র। কথায় সই তুমি চিরজই; আমি তোমার কাছে বোবা হই, আর মিলাইতে পারি কই?

গি। আরও মিল চাই?

র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া রত্নময়ী গৃহকর্ম্মে গেল। মৃণালিনী এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। এখন গিরিজায়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, জাগিয়াছ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "জাগিয়াই আছি। জাগিয়াই থাকি।"

গি। কি ভাবিতেছিলে?

মৃ। যাহা ভাবি।

গিরিজায়া তখন গম্ভীরভাবে কহিল, "কি করিব? আমার দোষ নাই। আমি শুনিয়াছি, তিনি এই নগরমধ্যে আছেন; এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আমরা ত সবে দুই তিন দিন আসিয়াছি। শীঘ্র সন্ধান করিব।"

মৃ। গিরিজায়া, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই? তবে যে এই পাটনীর গৃহে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিতে হইবে। আমার যে যাইবার স্থান নাই।

মৃণালিনী উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও গণ্ডে নীরবস্রুত অশ্রু বহিতে লাগিল।

এমন সময়ে রত্নময়ী শশব্যস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া কহিল, "সই! সই! দেখিয়া যাও। আমাদিগের বটতলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য্য পুরুষ!"

গিরিজায়া কুটীরদ্বারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটীরদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল।

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।"

সেই ধ্বনি স্বপ্নবৎ হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃণালিনী গিরিজায়ার কণ্ঠকণ্ডুয়ন দেখিয়া কহিলেন, "চুপ, রাক্ষসী, আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে না, ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন। উনি যেখানে যান, অদৃশ্যভাবে দূরে থাকিয়া উঁহার সঙ্গে যাও।—এ কি! উঁহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন? চল, তবে আমিও সঙ্গে চলিলাম।"

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

হেমচন্দ্র কিয়দ্দূর গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজায়া তাঁহার অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তখন রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে?"

মৃণালিনী কহিলেন, "দেবতা জানেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্

বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন। শোণিতস্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল। শূলে ভর করিয়া হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন।

মৃণালিনী ও গিরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাকে দেখিলেন।

মনোরমা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া মৃণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, "আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।" গিরিজায়া ভাবিল, "রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "মনোরমা—এমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?"

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না। হেমচন্দ্র পুনরপি ডাকিলেন, "মনোরমা!"

তথাপি উত্তর নাই; হেমচন্দ্র দেখিলেন, আকাশমার্গে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "মনোরমা, কি হইয়াছে?"

তখন মনোরমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিল। এবং কিয়ৎকাল অনিমেষলোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। পরে হেমচন্দ্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল। তখন মনোরমা বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কি হেমচন্দ্র! রক্ত কেন? তোমার মুখ শুষ্ক; তুমি কি আহত হইয়াছ?"

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্কন্ধের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেল। বং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার আনীত করিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পরিত্যক্ত রাইয়া অঙ্গের রুধির সকল ধৌত করিল। এবং গোজাতিপ্রলোভন নবদূর্ব্বাদল ভূমি ইতে ছিন্ন করিয়া আপন কুন্দনিন্দিত দন্তে চর্ব্বিত করিল। পরে তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ রিয়া উপবীতাকারে বস্ত্র দ্বারা বাঁধিল। তখন কহিল, "হেমচন্দ্র! আর কি করিব? মি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর হইতেছি।"

মৃণালিনী মনোরমার কার্য্য দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ কে ারিজায়া?"

গি। নাম শুনিলাম মনোরমা।

মৃ। এ কি হেমচন্দ্রের মনোরমা?

গি। তুমি কি বিবেচনা করিতেছ?

মৃ। আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে রিলাম না, সে করিল। যে কার্য্যের জন্য আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—মনোরমা কার্য্য সম্পন্ন করিল—দেবতারা উহাকে আয়ুষ্মতী করুন। গিরিজায়া, আমি গৃহে লাম, আমার আর থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন কেন, সংবাদ লইয়া যাইও। মনোরমা যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেতু—ধূমাৎ

মনোরমা এবং হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মৃণালিনীকে বিদায় দিয়া রিজায়া উপবন-গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে বাতায়ন-পথ মুক্ত খিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক ক্ষ হেমচন্দ্রকে শয়ানাবস্থায় দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার শয্যোপরি মনোরমা বয়া আছে। গিরিজায়া সেই বাতায়ন-তলে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বরাত্রে সেই তায়ন-পথে যবন হেমচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিরিজায়ার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হেমচন্দ্র মনোরমায় কি কথোপকথন হয়, তাহা বিরলে থাকিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই ত হয় না। একাকী নীরবে সেই বাতায়ন-তলে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল। কথা কহিতে পায় না, হাসিতে পায় না, ব্যঙ্গ করিতে পায় না, বড়ই কষ্ট—স্ত্রীরসনা কণ্ডূয়িত হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সেই পাপিষ্ঠ দিগ্বিজয়ই বা কোথায়? তাহাকে পাইলেও ত মুখ খুলিয়া বাঁচি। কিন্তু দিগ্বিজয় গৃহমধ্যে প্রচুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল—তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। তখন অন্য পাত্রাভাবে গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল। সে কথোপকথন শুনিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহা জানাইতে পারি। গিরিজায়াই প্রশ্নকর্ত্রী, গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী।

প্র। ওলো, তুই বসিয়া কে লো?

উ। গিরিজায়া লো।

প্র। এখানে কেন লো?

উ। মৃণালিনীর জন্যে লো।

প্র। মৃণালিনী তোর কে?

উ। কেউ না।

প্র। তবে তার জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

উ। আমার আর কাজ কি? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব?

প্র। মৃণালিনীর জন্যে এখানে কেন?

উ। এখানে তার একটি শিকলীকাটা পাখী আছে।

প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি?

উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে?

প্র। তবে বসিয়া কেন?

উ। দেখি, শিকল কেটেছে কি না।

প্র। কেটেছে না কেটেছে, জেনে কি হইবে?

উ। পাখীটির জন্যে মৃণালিনী প্রতিরাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজি না জানি কতই কাঁদবে। যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে।

প্র। আর যদি শিকল কেটে থাকে?

উ। মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঁজরা খালি ও না।

প্র। মর্ ভিখারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি! মৃণালিনী রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়া ফেলে?

উ। ঠিক্ বলেছিস্ সই! তা সে পারে। বলা হবে না।

প্র। তবে এখানে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া মরিস্ কেন?

উ। বড় মাথা ধরিয়াছে, তাই। এই যে মেয়েটা ঘরের ভিতর বসিয়া আছে—য়েটা বোবা—নহিলে এখনও কথা কয় না কেন? মেয়েমানুষের মুখ এখনও

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। হেমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে?"

হে। বেশ ঘুম হয়েছে।

ম। এখন বল, কি প্রকারে আঘাত পাইলে?

তখন হেমচন্দ্র রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মনোরমা চিন্তা ত লাগিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার জিজ্ঞাস্য শেষ হইল। এখন আমার কথার উত্তর কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বল।"

মনোরমা মৃদু মৃদু অস্ফুটস্বরে কি বলিল, গিরিজায়া তাহা শুনিতে পাইল না। চুপি চুপি কি কথা হইল।

গিরিজায়া আর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া গাত্রোত্থান করিল। তখন পুনর্ব্বার রমালা মনোমধ্যে গ্রন্থিত হইতে লাগিল।

প্র। কি বুঝিলে?

উ। কয়েকটি লক্ষণ মাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ?

গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল, এক—মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী; আগুনের ঘ কি গাঢ় থাকে? দুই—মনোরমা ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন

করিল কেন? তিন—একত্রে বাস। চারি—একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি?

উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই।

প্র। কিন্তু মৃণালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে। তবে ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই।

উ। যথার্থ। কিন্তু মৃণালিনী অনুপস্থিত, মনোরমা উপস্থিত।

এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "ভিক্ষা দাও গো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপনয়—বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্

গিরিজায়া গীত গায়িল,

"কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিল।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

"ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজবধূ টুটায়ল পরাণ।"

হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

"মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুঙারী।

কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপকি ভিখারী ॥"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "এ কি! মনোরমা, এ যে গিরিজায়ার স্বর। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া লম্ফ দিয়া হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

"আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,
হৃদি বৈনু চরণ যুগল।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল ॥"

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত স্বরে কহিলেন, "গিরিজায়া! এ কি, গিরিজায়া! তুমি এখানে? তুমি এখানে কেন? তুমি এ দেশে কবে আসিলে?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি এখানে অনেক দিন আসিয়াছি।" এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল,

"কিবা কাননবল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এ দেশে কেন এলে?"

গিরিজায়া কহিল, "ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। রাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি—

কিবা কাননবল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।"

হেমচন্দ্র গীতে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "মৃণালিনী কেমন আছে; দেখিয়া আসিয়াছ?"

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

"নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি,
ছার তনু করব বিনাশ।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার গীত রাখ। আমার কথার উত্তর দাও! মৃণালিনী কেমন আছে, দেখিয়া আসিয়াছ?"

গিরিজায়া কহিল, "মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই। এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্য গীত গায়িতেছি।

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিবা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পূরাইবে॥"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "গিরিজায়া, তোমাকে মিনতি করিতেছি—গান রাখ, মৃণালিনীর সংবাদ বল।"

গি। কি বলিব?

হে। মৃণালিনীকে কেন দেখিয়া আইস নাই?

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই।

হে। কেন? কোথায় গিয়াছেন?

গি। মথুরায়।

হে। মথুরায়? মথুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন? কি প্রকারে গেলেন? কেন গেলেন?

গি। তাঁহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বুঝি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত। বুঝি বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছেন।

হে। কি? কি করিতে?

গি। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। গিরিজায়া সে মুখ দেখিতে পাইল না; আর হেমচন্দ্রের স্কন্ধস্থ ক্ষতমুখ ছুটিয়া বন্ধনবস্ত্র রক্তে প্লাবিত হইতেছিল, তাহাও দেখিতে পাইল না। সে পূর্ব্বমত গায়িল,

"বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পূরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি দিবে॥"

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, "গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গিরিজায়া মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া মৃণালিনীর বিবাহের কথা

বলিয়া সে হেমচন্দ্রের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মনে করিয়াছিল যে, মৃণালিনীর বিবাহ উপস্থিত শুনিয়া হেমচন্দ্র বড় কাতর হইবে, বড় রাগ করিবে। কৈ, তা ত কিছুই হইল না। তখন গিরিজায়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিল, "হায় কি করিলাম! কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটনা করিলাম! হেমচন্দ্র ত সুখী হইল দেখিতেছি—বলিয়া গেল—সংবাদ শুভ। এখন ঠাকুরাণীর দশা কি হইবে?" হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন, তোমার সংবাদ শুভ, তাহা, গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ ত নয়—কি বুঝিবে? যে ক্রোধভরে, হেমচন্দ্র, এই মৃণালিনীর জন্য গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই দুর্জ্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল। অভিমানাধিক্যে, দুর্দ্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বলিলেন, "তোমার সংবাদ শুভ।"

গিরিজায়া তাহা বুঝিতে পারিল না। মনে করিল, এই ষষ্ঠ লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না; সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না; "শিকলী কাটিয়াছে" সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর একটি সংবাদ

সেই দিন মাধবাচার্য্যের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রকে দর্শনদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন। এবং আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্নাদির পরে বিরলে উভয়ের উদ্দেশ্য সাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "এত শ্রম করিয়া কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। এতদ্দেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সেন রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাঁহারা অদ্যই এ স্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবন-সেনা আসিয়াছে, মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে। আজি কালি নগর আক্রমণ করিবে।"

মাধবাচার্য্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গৌড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে?"

হে। কিছুই না। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে এ সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিয়া সৎপরামর্শ দাও নাই কেন?

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিলাম। এই মাত্র গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি। বলহানিপ্রযুক্ত রাজসমক্ষে যাইতে পারি নাই। এখনই যাইতেছি।

মা। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট যাইতেছি। পশ্চাৎ যেরূপ হয় তোমাকে জানাইব।

এই বলিয়া মাধবাচার্য্য গাত্রোত্থান করিলেন।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু! আপনি গৌড় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম—"

মাধবাচার্য্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "গিয়াছিলাম। তুমি মৃণালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? মৃণালিনী তথায় নাই।"

হে। কোথায় গিয়াছে?

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না।

হে। কেন গিয়াছে?

মা। বৎস! সে সকল পরিচয় যুদ্ধান্তে দিব।

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "স্বরূপ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইব, সে আশঙ্কা করিবেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

মাধবাচার্য্য গৌড়নগরে গমন করিলে হৃষীকেশ তাঁহাকে আপন জ্ঞানমত মৃণালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া মাধবাচার্য্যেরও বোধ হইয়াছিল; মাধবাচার্য্য কস্মিন্ কালে স্ত্রীজাতির অনুরাগী নহেন—সুতরাং স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন না। এক্ষণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যে, হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্তই কতক কতক শ্রবণ করিয়া মৃণালিনীর কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন—অতএব কোন নূতন মনঃপীড়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পুনর্ব্বার আসনগ্রহণপূর্ব্বক হৃষীকেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র অধোমুখে করতলোপরি ভ্রূকুটিকুটিল ললাট সংস্থাপিত করিয়া নিঃশব্দে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মাধবাচার্য্যের কথা সমাপ্ত হইলেও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন

না। সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচার্য্য ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র !" কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরপি ডাকিলেন, "হেমচন্দ্র !" তথাপি নিরুত্তর।

তখন মাধবাচার্য্য গাত্রোত্থান করিয়া হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন; অতি কোমল, স্নেহময় স্বরে কহিলেন, "বৎস! তাত! মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও!"

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্য্যও ভীত হইলেন। মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমার সহিত আলাপ কর। ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা ব্যক্ত কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? হৃষীকেশ একরূপ কহিয়াছে। ভিখারিণী আর এক প্রকার বলিল।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ভিখারিণী কে? সে কি বলিয়াছে?"

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য্য সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন, "হৃষীকেশেরই কথা মিথ্যা বোধ হয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "হৃষীকেশের প্রত্যক্ষ।"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

হেমচন্দ্র করস্থ শূল দেখাইয়া কহিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইয়া অপসৃত হইলেন।

প্রাতে মৃণালিনী বলিয়া গিয়াছিলেন, "হেমচন্দ্র আমারই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"আমি ত উন্মাদিনী"

অপরাহ্নে মাধবাচার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন যে, ধর্ম্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যবনসেনা আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বজিত রাজ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা শুনিয়া যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহারা দূত প্রেরণ করিবেন। দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম

হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "এই কুলাঙ্গার রাজা ধর্ম্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।"

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য্য বিদায় হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিল, "ভাই! আজ তুমি অমন কেন?"

হেম। কেমন আমি?

মনো। তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; ভাদ্র মাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; অত ভ্রূকুটি করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন—আর দেখি—তাই ত, চোখে জল; তুমি কেঁদেছ?

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; আবার চক্ষু অবনত করিলেন; পুনর্ব্বার উন্নত গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিলেন; আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বুঝিল যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির কোন উদ্দেশ্য নাই। যখন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয়। মনোরমা কহিল, "হেমচন্দ্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে?" হেমচন্দ্র কহিলেন, "কিছু না।"

মনোরমা প্রথমে কিছু বলিল না—পরে আপনা আপনি মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিল। "কিছু না—বলিবে না। ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে!" বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি বহিল;—পরে অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাকে বলিবে না কেন? আমি যে তোমার ভগিনী।"

মনোরমার মুখের ভাবে, শান্তদৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃদুতা, এত সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল যে, হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীয় নহে।"

মনোরমা কহিল, "তবে আমি ভগিনী নহি।"

হেমচন্দ্র কিছুতেই উত্তর করিলেন না। তথাপি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া মনোরমা তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। কহিল, "আমি তোমার কেহ নহি।"

হেম। আমার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য—অপরেরও অশ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর করুণাময়—নিতান্ত আধিব্যক্তিপরিপূর্ণ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল। তখনই সে স্বর পরিবর্ত্তিত হইল, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত

হইল—অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণি ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।"

মনোরমা আবার পূর্ব্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। বালিকা প্রগল্‌ভতাপ্রাপ্ত হইল। সূর্য্যরশ্মির অপেক্ষা যে রশ্মি সমুজ্জ্বল, তাহার কিরীট পরিয়া প্রতিভাদেবী দেখা দিলেন। মনোরমা কহিল, "বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেম। ভালবাসিতাম।

হেমচন্দ্র বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে নিঃস্রুত অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোরমা বিরক্ত হইল। বলিল, "ছি! ছি! প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে, সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে।" মনোরমা বিরক্তিবশতঃ আপন অলকদাম চম্পকাঙ্গুলিতে জড়িত করিয়া টানিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "কি প্রতারণা করিলাম?"

মনোরমা কহিল, "ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন? কি? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?" বলিতে বলিতে মনোরমার প্রৌঢ়ভাবাপন্ন মুখকান্তি সহসা প্রফুল্ল পদ্মবৎ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হইতে লাগিল; চক্ষু অধিক জ্যোতিঃস্ফুরৎ হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর অধিকতর পরিস্ফুট, আগ্রহকম্পিত হইতে লাগিল; বলিতে লাগিল, "এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। অহঙ্কার করিয়া আগুন নিবান যায়? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতারক!"

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "আমি ইহাকে এক দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম!"

মনোরমা কহিতে লাগিল, "তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা

প্রেমপ্রবাহস্বরূপ ; ইহা জগদীশ্বর-পাদ-পদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী ; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক্ সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ। সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয় ; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শত পাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।"

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই ? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে ?

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে ; কেন না, প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে ? যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মনোরমা, এ সকল তোমায় কে শিখাইল ? তোমার উপদেষ্টা অলৌকিক ব্যক্তি।"

মনোরমা মুখাবনত করিয়া কহিলেন, "তিনি সর্ব্বজ্ঞানী, কিন্তু—"

হে। কিন্তু কি ?

ম। তিনি অগ্নিস্বরূপ—আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।

মনোরমা ক্ষণেক মুখাবনত করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা, তোমার মুখ দেখিয়া, আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, তুমিও ভালবাসিয়াছ। বোধ হয়, যাঁহাকে তুমি অগ্নির সহিত তুলনা করিলে, তিনিই তোমার প্রণয়াধিকারী।"

মনোরমা পূর্ব্বমত নীরবে রহিল। হেমচন্দ্র পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার একটি কথা শুন। স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই ; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও অধম। সতীত্বের হানি কেবল কার্য্যেই ঘটে, এমন নহে ; স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন। তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও।"

মনোরমা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল ; পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল, হাসি বন্ধ হয় না। হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইলেন, কহিলেন, "হাসিতেছ কেন ?"

মনোরমা কহিলেন, "ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও ; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্ব্বতে ফিরে যাও।"

হেম। কেন ?

ম। স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন ? রাজপুত্র, কালসর্পকে মনে করিয়া কি সুখ ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে ভুলিতেছ না কেন ?

হে। তাহার দংশনের জ্বালায়।

ম। আর সে যদি দংশন না করিত ? তবে কি তাহাকে ভুলিতে ?

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন না। মনোরমা বলিতে লাগিল, "তোমার ফুলের মালা কালসাপ হইয়াছে, তবু তুমি ভুলিতে পারিতেছ না ; আমি, আমি ত পাগল—আমি আমার পুষ্পহার কেন ছিঁড়িব ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এক প্রকার অন্যায় বলিতেছ না। বিস্মৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে ; লোক আত্মগরিমায় অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে 'বিস্মৃত হও' এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। কেহ কাহাকে বলে না, অর্থচিন্তা ছাড় ; যশের ইচ্ছা ছাড় ; জ্ঞানচিন্তা ছাড় ; ক্ষুধানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর ; তৃষ্ণানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর ; নিদ্রা ছাড় ; তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড় ? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট ? এ সকল অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন নহে—কিন্তু ধর্ম্মের অপেক্ষা ন্যূন বটে। ধর্ম্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিবে। স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম সতীত্ব। সেই জন্য বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর।"

ম। আমি অবলা ; জ্ঞানহীনা ; বিবশা ; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

হে। সাবধান, মনোরমা ! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে ; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে। তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্ম্মে একের পত্নী, মনে অন্যের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না ?

গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম্ম ঝুলিতেছিল ; মনোরমা চর্ম্ম হস্তে লইয়া কহিল, "ভাই, হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া ?"

হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন। মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গিরিজায়ার সংবাদ

গিরিজায়া যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন প্রাসাদে হেমচন্দ্রের নবানুরাগের কথা মৃণালিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে না স্থির করিয়াছিল। মৃণালিনী তাহার আগমন প্রতীক্ষায় পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় চঞ্চলা হইয়া রহিয়াছিলেন; গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "বল গিরিজায়া, কি দেখিলে? হেমচন্দ্র কেমন আছেন?"

গিরিজায়া কহিল, "ভাল আছেন।"

মৃ। কেন, অমন করিয়া বলিলে কেন? তোমার কথায় উৎসাহ নাই কেন? যেন দুঃখিত হইয়া বলিতেছ; কেন?

গি। সে কি?

মৃ। গিরিজায়া, আমাকে প্রতারণা করিও না; হেমচন্দ্র কি ভাল হয়েন নাই? তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। সন্দেহের অপেক্ষা প্রতীতি ভাল।

গিরিজায়া এবার সহাস্যে কহিল, "তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত হও? আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহার শরীরে কিছুই ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।"

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্ত্তা শুনিলে?"

গি। শুনিলাম।

মৃ। কি শুনিলে?

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা কহিলেন। কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে যে মনোরমা নিশা পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও কাণে কাণে কথা বলিয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় গোপন করিলেন। মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

গিরিজায়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "করিয়াছি।"

মৃ। তিনি কি কহিলেন?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৃ। তুমি কি বলিলে ?

গি। আমি বলিলাম, তুমি ভাল আছ।

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিতেছ, তোমার মুখ শুকন। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না। আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, আমি স্বয়ং হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইব। পার, আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ আমি একাকিনী যাইব।

এই বলিয়া মৃণালিনী অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজায়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইল। কিছু দূর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি, ফের ; আমি যাহা লুকাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।"

মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গিরিজায়া যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে ঠকাইয়াছিল ; কিন্তু মৃণালিনীকে ঠকাইতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃণালিনীর লিপি

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন, 'উত্তম হইয়াছে' ; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন ?"

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, "ইহা সম্ভব বটে।"

তখন মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। এর বিহিত করা উচিত ; তুমি আহারাদি করিতে যাও। আমি ততক্ষণ একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি খাইবার পর, সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে।

গিরিজায়া স্বীকৃতা হইয়া সত্বরে আহারাদির জন্য গমন করিল। মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন।

লিখিলেন,

"গিরিজায়া মিথ্যাবাদিনী। যে কারণে সে তোমার নিকট মৎসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কহিবে। আমি মথুরায় যাই নাই। যে রাত্রিতে তোমার অঙ্গুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে আসিয়াছিলাম, সেই রাত্রি অবধি আমার পক্ষে মথুরার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে আসিয়াও যে এ পর্য্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার এক কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে। আমার অভিলাষ, তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্যক কি?"

গিরিজায়া এই লিপি লইয়া পুনরপি হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যাকালে, মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজায়া তাঁহার হস্তে লিপি দিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি আবার কেন?"

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি।

হে। পত্র কাহার?

গি। মৃণালিনীর পত্র।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, "এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল?"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মথুরার কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাঁহার?

গি। হাঁ, তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

হেমচন্দ্র লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ছিন্নখণ্ড সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছি। তুমি যে দুষ্টার পত্র লইয়া আসিয়াছ, সে যে বিবাহ করিতে যায় নাই, হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আমি কুলটার পত্র পড়িব না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

গিরিজায়া চমৎকৃত হইয়া নিরুত্তরে হেমচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র-বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হস্তে লইয়া কহিলেন, "দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।"

গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, "বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে! মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবদুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু গিরিজায়ার রাগ গেল না। বলিল, "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।"

এই বলিয়া গিরিজায়া, সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ব্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গিরিজায়া প্রত্যাগতা হইয়া হেমচন্দ্রের আচরণ মৃণালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। এবার কিছু লুকাইল না। মৃণালিনী শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন, সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নহে বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল।

পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণী ছিল, তথায় গিয়া গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল। শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দনরহিত কুসুমশ্রেণী অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; চারি দিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরাশ্লিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল; ক্বচিৎ দুই একটি দীর্ঘ শাখা ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জমধ্য হইতে নবস্ফুটকুসুমসৌরভ আসিতেছিল। গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল।

গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল—যেন নবশিক্ষিতা বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতালাভ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কণ্ঠধ্বনি, পুষ্করিণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গচ্যুত স্বরসরিত্তরঙ্গস্বরূপ মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিজায়া গায়িল;—

"পরাণ না গেলো।
যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয় সই, কাহে কালো নীরে,
জীবন না গেলো ?
ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি,
তইখন না গেলো ?
শুনমু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে ;
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো ?
ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি,
মরণ না ভেল ?"

গিরিজায়া গায়িতে গায়িতে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে চন্দ্রের কিরণোপরি মনুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী কাঁদিতেছেন।

গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন,—তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যখন মৃণালিনীর চক্ষুতে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না—মনে করে, "কই, ইহার চক্ষুতে ত জল দেখিলাম না, তবে ইহার কিসের দুঃখ ?" যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ম্মপীড়াই না জানি নিবারণ হইত।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী কিছু বলিতে পারেন না ; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। পরে মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, আর একবার তোমাকে যাইতে হইবে।"

গি। আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন ?

মৃ। পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ সংসারে অভ্রান্ত কে? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট এখনই যাইব—তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর—তুমি আমার জন্য না করিয়াছ কি? তুমি কখনও আমাকে অকারণে মনঃপীড়া দিবে না—কখনও আমার নিকট এ সকল কথা মিথ্যা করিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না শুনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারি? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব।

গি। প্রাণবিসর্জ্জন! সে কি মৃণালিনী?

মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহুস্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অমৃতে গরল—গরলামৃত

হেমচন্দ্র, আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৃণালিনীকে দুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন; মৃণালিনীর পত্র পাঠ না করিয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি মৃণালিনীকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। মৃণালিনীর জন্য তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী হইয়াছিলেন। এই মৃণালিনীর জন্য গুরুর প্রতি শরসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মৃণালিনীর জন্য গৌড়ে নিজ ব্রত বিস্মৃত হইয়া ভিখারিণীর তোষামোদ করিয়াছিলেন। আর এখন? এখন হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব!" কিন্তু তাই বলিয়া কি, এখন তাঁহার স্নেহ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল? স্নেহ কি একদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে? বহুদিন অবধি পার্ব্বতীয় বারি পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত করে, একদিনের সূর্য্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায়? জলের যে পথ নিখাত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে, সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। হেমচন্দ্র সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে, শয্যোপরি শয়ন করিয়া সেই মুক্ত বাতায়নসন্নিধানে

মস্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে দৃষ্টি করিতেছিলেন—তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতেছিলেন? যদি তাঁহাকে সে সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, রাত্রি সজ্যোৎস্না কি অন্ধকার, তাহা তিনি তখন সহসা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্না! নহিলে তাঁহার উপাধান আর্দ্র কেন? কেবল মেঘোদয় মাত্র। যাহার হৃদয়-আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন করে না।

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখও কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ্য করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্ কালে, এক দিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্য রোদন করিতেছিলেন। মৃণালিনীর কি তিনি দোষ আলোচনা করিতেছিলেন? তাহা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এক একবার মৃণালিনীর প্রেমপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ কার্য্য সকল স্মরণ করিতেছিলেন। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী? একদিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত বাহক পাইলেন না; কিন্তু মৃণালিনীকে গবাক্ষ-পথে দেখিতে পাইলেন। তখন হেমচন্দ্র একটি আম্রফলের উপরে আবশ্যক কথা লিখিয়া মৃণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাতায়নপথে প্রেরণ করিলেন; আম্র ধরিবার জন্য মৃণালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসাতে আম্র মৃণালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাঁহার কর্ণে লাগিল, অমনি তদাঘাতে কর্ণবিলম্বী রত্নকুণ্ডল কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল; কর্ণস্রুত রুধিরে মৃণালিনীর গ্রীবা ভাসিয়া গেল। মৃণালিনী ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; কর্ণে হস্তও দিলেন না; হাসিয়া আম্র তুলিয়া লিপি পাঠপূর্ব্বক, তখনই তৎপৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর লিখিয়া আম্র প্রতিপ্রেরণ করিলেন। এবং যতক্ষণ হেমচন্দ্র দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া হাস্যমুখে দেখিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের তাহা মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী কি অবিশ্বাসিনী? ইহা সম্ভব নহে। আর একদিন

মৃণালিনীকে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণায় মৃণালিনী মুমূর্ষুবৎ কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার এক জন পরিচারিকা তাহার উত্তম ঔষধ জানিত; তৎপ্রয়োগ মাত্র যন্ত্রণা একেবারে শীতল হয়; দাসী শীঘ্র ঔষধ আনিতে গেল। ইত্যবসরে হেমচন্দ্রের দূতী গিয়া কহিল যে, হেমচন্দ্র উপবনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ঔষধ আসিত, কিন্তু মৃণালিনী তাহার অপেক্ষা করেন নাই; অমনি সেই মরণাধিক যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া উপবনে উপস্থিত হইলেন। আর ঔষধ প্রয়োগ হইল না। হেমচন্দ্রের তাহা স্মরণ হইল। সেই মৃণালিনী ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক ব্যোমকেশের জন্য হেমচন্দ্রের কাছে অবিশ্বাসিনী হইবে? না, তা কখনই হইতে পারে না। আর একদিন হেমচন্দ্র মথুরা হইতে গুরুদর্শনে যাইতেছিলেন; মথুরা হইতে এক প্রহরের পথ আসিয়া হেমচন্দ্রের পীড়া হইল। তিনি এক পান্থনিবাসে পড়িয়া রহিলেন; কোন প্রকারে এ সংবাদ অন্তঃপুরে মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণালিনী সেই রাত্রিতে এক ধাত্রীমাত্র সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে সেই এক যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। যখন মৃণালিনী পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তিতে প্রায় নির্জ্জীব; চরণ ক্ষতবিক্ষত,—রুধির বহিতেছিল। সেই রাত্রিতেই মৃণালিনী পিতার ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি স্বয়ং পীড়িতা হইলেন। হেমচন্দ্রের তাহাও মনে পড়িল। সেই মৃণালিনী নরাধম ব্যোমকেশের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিবে? সে কি অবিশ্বাসিনী হইতে পারে? যে এমন কথায় বিশ্বাস করে, সেই অবিশ্বাসী—সে নরাধম, সে গণ্ডমূর্খ। হেমচন্দ্র শতবার ভাবিতেছিলেন, "কেন আমি মৃণালিনীর পত্র পড়িলাম না? নবদ্বীপে কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না?" পত্রখণ্ডগুলি যে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা যুক্ত করিয়া যতদূর পারেন, ততদূর মর্ম্মাবগত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে বনতলস্থ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায়েন নাই। বায়ু লিপিখণ্ডসকল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলে হেমচন্দ্র সেই লিপিখণ্ডগুলি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র তাহাও দিতেন।

আবার ভাবিতেছিলেন, "আচার্য্য কেন মিথ্যা কথা বলিবেন? আচার্য্য অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ—কখনও মিথ্যা বলিবেন না। বিশেষ আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন—জানেন, এ সংবাদে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হইবে, কেন আমাকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া এত

যন্ত্রণা দিবেন? আর তিনিও স্বেচ্ছাক্রমে এ কথা বলেন নাই। আমি সদর্পে তাঁহার নিকট কথা বাহির করিয়া লইলাম—যখন আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি—তখনই তিনি কথা বলিলেন। মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, বলিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন? তবে হইতে পারে, হৃষীকেশ তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকিবে। কিন্তু হৃষীকেশই বা অকারণে গুরুর নিকট মিথ্যা বলিবে কেন? আর মৃণালিনীই বা তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিবে কেন?"

যখন এইরূপ ভাবেন, তখন হেমচন্দ্রের মুখ কালিমাময় হয়, ললাট ঘর্ম্মসিক্ত হয়; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসেন; দন্তে অধর দংশন করেন, লোচন আরক্ত এবং বিস্ফারিত হয়; শূলধারণ জন্য হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। আবার মৃণালিনীর প্রেমময় মুখমণ্ডল মনে পড়ে। অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় শয্যায় পতিত হয়েন; উপাধানে মুখ লুক্কায়িত করিয়া শিশুর ন্যায় রোদন করেন। হেমচন্দ্র ঐরূপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরমা? তখনই দেখিলেন, সে কুসুমময়ী মূর্ত্তি নহে। পরে চিনিলেন যে, গিরিজায়া। প্রথমে বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত, শেষে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আবার কেন?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি মৃণালিনীর দাসী। মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। সুতরাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে। আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিব, স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।"

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তোমার কোন শঙ্কা নাই। স্ত্রীলোককে আমি মারিব না। তুমি কেন আসিয়াছ? মৃণালিনী কোথায়? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন; নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন? আমি তাঁহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই।"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল। এই মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় আছেন?"

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। সরোবর-তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি আসুন।

এই বলিয়া গিরিজায়া চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় মৃণালিনী সোপানোপরি বসিয়া ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। হেমচন্দ্রও তথায় আসিলেন। গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণী! উঠ। রাজপুত্র আসিয়াছেন।"

মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। মৃণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল; অশ্রুজলে চক্ষু পূরিয়া গেল। অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে যেমন শাখা-বিলম্বিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন। গিরিজায়া অন্তরে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

এত দিনের পর!

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এত কাল পরে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। যে দিন প্রদোষকালে, যমুনার উপকূলে নৈদাঘানিলসন্তাড়িত বকুলমূলে দাঁড়াইয়া, নীলাম্বুময়ীর চঞ্চল-তরঙ্গ-শিরে নক্ষত্ররশ্মির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল। নিদাঘের পর বর্ষা গিয়াছে, বর্ষার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইঁহাদিগের হৃদয়মধ্যে যে কত দিন গিয়াছে, তাহা কি ঋতুগণনায় গণিত হইতে পারে?

সেই নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরে, দুই জনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারি দিকে সেই নিবিড় বন, ঘনবিন্যস্ত লতাস্রগ্‌বিশোভী বিশাল বিটপী-সকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সম্মুখে নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক—আকাশে, বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে

—সর্ব্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্য্যময়ী। সেই ধৈর্য্যময়ী প্রকৃতির প্রাসাদ-মধ্যে, মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন।

ভাষায় কি শব্দ ছিল না? তাঁহাদিগের মনে কি বলিবার কথা ছিল না? যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না? তখন চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ত—কথা কহিবে কি প্রকারে? এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকটে অবস্থিতিতে এত সুখ যে, হৃদয়মধ্যে অন্য সুখের স্থান থাকে না। যে সে সুখভোগ করিতে থাকে, সে আর কথার সুখ বাসনা করে না।

সে সময়ে এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন্ কথা আগে বলিব, তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মনুষ্যভাষায় এমন কোন্ শব্দ আছে যে, সে সময়ে প্রযুক্ত হইতে পারে?

তাঁহারা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন—হৃষীকেশবাক্যে প্রত্যয় দূর হইতে লাগিল। সে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ত পবিত্রতা লেখা আছে। হেমচন্দ্র তাঁহার লোচনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; সেই অপূর্ব্ব আয়তনশালী, ইন্দীবর-নিন্দী, অন্তঃকরণের দর্পণরূপ চক্ষুঃপ্রতি চাহিয়া রহিলেন—তাহা হইতে কেবল প্রেমাশ্রু বহিতেছে।—সে চক্ষু যাহার, সে কি অবিশ্বাসিনী।

হেমচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী! কেমন আছ?"

মৃণালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই; উত্তরের উপক্রম করিলেন, কিন্তু আবার চক্ষুঃ জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আসিয়াছ?"

মৃণালিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন না। হেমচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সোপানোপরি বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃণালিনীর যে কিছু চিত্তের স্থিরতা ছিল, এই আদরে তাহার লোপ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মস্তক আপনি আসিয়া হেমচন্দ্রের স্কন্ধে স্থাপিত হইল, মৃণালিনী তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। মৃণালিনী আবার রোদন করিলেন—তাঁহার অশ্রুজলে হেমচন্দ্রের স্কন্ধ, বক্ষঃ প্লাবিত হইল। এ সংসারে মৃণালিনী যত সুখ অনুভূত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন সুখই এই রোদনের তুল্য নহে।

হেমচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, "মৃণালিনি! আমি তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিবার কতক কারণও ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি দূর করিতে পারিবে। যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও।"

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের স্কন্ধ হইতে মস্তক না তুলিয়া কহিলেন, "কি?"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিলে কেন?"

ঐ নাম শ্রবণমাত্র কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মৃণালিনী মাথা তুলিল। কহিল, "হৃষীকেশ আমাকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে।"

হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলেন—অল্প সন্দিহান হইলেন—কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। এই অবকাশে মৃণালিনী পুনরপি হেমচন্দ্রের স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন। সে সুখাসনে শিরোরক্ষা এত সুখ যে, মৃণালিনী তাহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমাকে হৃষীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল?"

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুরবে কহিলেন, "তোমাকে কি বলিব? হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।"

শ্রুতমাত্র তীরের ন্যায় হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষশ্চ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল।

"পাপীয়সি—নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি!" এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে গিরিজায়াকে দেখিলেন; গিরিজায়া তাঁহার সজলজলদভীম মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কিন্তু না লিখিলে নয়—হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপসৃতা করিলেন। বলিলেন, "তুমি যাহার দূতী, তাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্য্য মাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের নিপাত হইয়াছিল। "অশ্বত্থামা হতঃ" এই শব্দ শুনিয়া তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন। প্রশ্নান্তর দ্বারা সবিশেষ তত্ত্ব লইলেন না। হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য্য নহে—অধৈর্য্য, অভিমান, ক্রোধ।

শীতল সমীরণময়ী উষার পিঙ্গল মূর্ত্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল। তখনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন। গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণী, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে?"

মৃণালিনী কহিলেন, "কিসের আঘাত?"

গি। মাথায়।

মৃ। মাথায় আঘাত? আমার মনে হয় না।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঊর্ণনাভ

যতক্ষণ মৃণালিনীর সুখের তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গৌড়দেশের সৌভাগ্যশশীও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল। নিশীথ সময়ে নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি, নিজ দক্ষিণহস্তস্বরূপ শান্তশীলকে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, "শান্তশীল! প্রাতে যে সংবাদ দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা নাই।"

শান্তশীল কহিল, "যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই। অন্য কার্য্যে পরিচয় গ্রহণ করুন।"

প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে?

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ না সাজে।

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে?

শা। এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের নিকট হইতে কর লইয়া কয় জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে।

প। দামোদর শর্ম্মা উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন কি না?

শা। তিনি বড় চতুরের ন্যায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

প। সে কি প্রকার?

শা। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি বসাইয়াছিলেন। তাহা লইয়া অদ্য প্রাতে রাজাকে শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবাচার্য্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

প। কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়বিজেতার রূপবর্ণনা সবিস্তারে লিখিত আছে। সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

শা। করিয়াছিলেন। মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ মহারাজ অবগত আছেন। মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়জেতার অবয়ব বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মগধে যবন-রাজ-প্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছ ?" সে কহিল, "আসিয়াছি।" মহারাজ তখন আজ্ঞা করিলেন, "সে দেখিতে কি প্রকার, বিবৃত কর।" তখন মদনসেন বখ্‌তিয়ার খিলিজির যথার্থ যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিলেন। কবিতাতেও সেইরূপ বর্ণিত ছিল। সুতরাং গৌড়জয় ও তাঁহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন।

প। তাহার পর ?

শা। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিব ? সপরিবারে যবনহস্তে প্রাণে নষ্ট হইব দেখিতেছি।" তখন দামোদর শিক্ষামত কহিলেন, "মহারাজ! ইহার সদুপায় এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্ম্মাধিকারের প্রতি রাজকার্য্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।" রাজা এ পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত পক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্য্যসিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে ত্রুটি করিব না, তাহা ত জান। এক্ষণে বিদায় হও। কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে।

শান্তশীল বিদায় হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনা সূতার হার

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকায় বহু ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহ যাহাতে আলো হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার—এ সকলই তাঁহার গৃহে ছিল না।

অন্ত শান্তশীলের সহিত কথোপকথনের পর, পশুপতির সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, "এত কালের পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হইল—যদি জগদম্বা অনুকূলা হয়েন, তবে মনোরমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শয়নের পূর্ব্বে অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণাম-বন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় মনোরমা বসিয়া আছে।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, কখন আসিলে?"

মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছিল। কথার কোন উত্তর দিল না। পশুপতি কহিলেন, "আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।"

মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, "আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।"

পশুপতি কহিলেন, "তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, "আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি—বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ, তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এজন্য তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমা লাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী অনুগ্রহ করেন, তবে দুই চারি দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, তুমি কুলীনকন্যা, জনার্দ্দন শর্ম্মা কুলীনশ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রিয়।"

মনোরমা এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেছিল কি না সন্দেহ। পশুপতি দেখিলেন যে, মনোরমা চিত্ত হারাইয়াছে। পশুপতি, সরলা অবিকৃতা বালিকা মনোরমাকে ভালবাসিতেন,—প্রৌঢ়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মনোরমাকে ভয় করিতেন। কিন্তু অন্ত

ভাবান্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তথাপি পুনরুদ্যম করিয়া পশুপতি কহিলেন, "কিন্তু কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে, কুলনাশে ধর্ম্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না। তাঁহার অজ্ঞাতে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতিই কি? তুমি সম্মত হইলেই, তাহা পারি। পরে তোমার পিতামহ জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।"

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাসূত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল। পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা তখন আপন মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া, তৎসূত্রে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল।

পশুপতি উত্তর না পাইয়া নিঃশব্দে মালাকুসুমমধ্যে মনোরমার অনুপম অঙ্গুলির গতি মুগ্ধলোচনে দেখিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহঙ্গী পিঞ্জরে

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধিপ্রদীপ জ্বালিবার অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোৎপত্তি কঠিন হইল। পরিশেষে বলিলেন, "মনোরমা, রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমি শয়নে যাই।"

মনোরমা অম্লানবদনে কহিলেন, "যাও।"

পশুপতি শয়নে গেলেন না। বসিয়া মালা গাঁথা দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়ান্তর স্বরূপ, ভয়সূচক চিন্তার আবির্ভাবে কার্য্য সিদ্ধ হইবেক ভাবিয়া, মনোরমাকে ভীতা করিবার জন্য পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, যদি ইতিমধ্যে যবন আইসে, তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

মনোরমা মালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, "বাটীতে থাকিব।"

পশুপতি কহিলেন, "বাটীতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে?"

মনোরমা পূর্ব্ববৎ অন্য মনে কহিল, "জানি না; নিরুপায়।"

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ?"

ম। দেবতা প্রণাম করিতে।

পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন—তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না ?"

মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল—সে তাহা একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের গলায় পরাইতেছিল। পশুপতির কথা কর্ণে গেল না। মার্জ্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল—যতবার মনোরমা মালা তাহার গলায় দিতেছিল, ততবার সে মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল—মনোরমা কুন্দনিন্দিত দন্তে অধর দংশন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিল, আর আবার মালা তাহার গলায় দিতেছিল। পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল ঊর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল।

মার্জ্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্ম্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধরা হাস্যময়ীর তৎকালীন অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।

পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন ; ক্ষণেক মনোরমার মুখপ্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রৌঢ়বয়ঃপ্রফুল্লমুখী মহিমাময়ী সুন্দরী।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর।" মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, "পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায় ?"

পশুপতি কহিলেন, "কেশবের মেয়ে কোথায় জানি না—জানিতেও চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্নী।"

ম। আমি জানি কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব ?

পশুপতি অবাক্ হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বলিতে লাগিল, "একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই কথায় অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু

বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কস্মিন্ কালে না পাইতে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্ব্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্য্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে কেশব আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, 'এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। ইহার স্বামী পশুপতি—কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্পবয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। অতএব আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী। অথবা পশুপতিকে কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাঁহার স্ত্রী।'

"আচার্য্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।"

প। এখন সে কন্যা কোথায়?

ম। আমিই কেশবের মেয়ে—জনার্দ্দন শর্ম্মা তাঁহার আচার্য্য।

পশুপতি চিত্ত হারাইলেন; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া প্রতিমাসমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। মনোরমা পূর্ব্ববৎ সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "এখন রয়—আরও কথা আছে।"

প। মনোরমা—রাক্ষসী! এতদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে?

ম। কেন! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে?

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিশ্বাস করিয়াছি? আর যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দ্দন শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম।

ম। জনার্দ্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন? তিনি শিষ্যের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন।

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন?

ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই। একদিন গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম। আরও আমি বিধবা বলিয়া পরিচিতা। তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে লোকে প্রত্যয় করিবে কেন? তুমি লোকের কাছে নিন্দনীয় না হইয়া কি প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে?

প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতাম।

ম। ভাল, তাহাই হউক,—জ্যোতির্বিদের গণনা ?

প। আমি গ্রহশান্তি করাইতাম। ভাল, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যদি আমি রত্ন পাইয়াছি, তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইব না। তুমি আর আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মনোরমা কহিল, "এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি! আমি যাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি শুন। এ ঘর ছাড়। তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন আমাদিগের আয়ুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে—"

প। নহিলে কি ?

মনোরমা তখন উন্নতমুখে, সবাষ্পলোচনে, দেবীপ্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যুক্তকরে, গদগদকণ্ঠে কহিল, "নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

পশুপতিও দেবীর সমক্ষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই—যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি, তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া কি আমার পরমসুখে আমি বঞ্চিত হইব ? তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। মনোরমার চিত্তে সংশয় জন্মিল। সে চিন্তিতান্তঃকরণে কিয়ৎক্ষণ মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার পশুপতির নিকট বিদায় না লইয়া যাইতে পারিল না।

অল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "প্রাণাধিকে! আজি আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

মনোরমা বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যবনদূত—যমদূত বা

বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিতজাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের আকারেঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপবাসীরা ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট; তাহাদিগের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ; তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রুরাজিবিভূষিত; নয়ন প্রশস্ত, জ্বালাবিশিষ্ট। তাহাদিগের পরিচ্ছদ অনর্থক চাকচিক্যবিবর্জ্জিত; তাহাদিগের যোদ্ধ্‌বেশ; সর্ব্বাঙ্গে প্রহরণজালমণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর যে সকল সিন্ধুপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর! পর্ব্বতশিলাখণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, বিমার্জ্জিত-দেহ, বক্রগ্রীব, বল্গারোধ-অসহিষ্ণু, তেজোগর্ব্বে নৃত্যশীল! আরোহীরা কিবা তচ্চালন-কৌশলী—অবলীলাক্রমে সেই রুদ্ধবায়ুতুল্য তেজঃপ্রখর অশ্ব সকল দমিত করিতেছে। দেখিয়া গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। কৌতূহলবশতঃ কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, "ইহারা যবন রাজার দূত।" এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল—এবং পশুপতির আজ্ঞাক্রমে সেই পরিচয়ে নির্ব্বিঘ্নে নগরমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র—অল্পসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?"

যবনেরা উত্তর করিল, "আমরা যবন-রাজপ্রতিনিধির দূত; গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দৌবারিক কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন সাক্ষাৎ হইবে না।"

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বাগ্রে একজন খর্ব্বকায়, দীর্ঘবাহু, কুরূপ যবন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দৌবারিক তাহার গতিরোধজন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "ফের—নচেৎ এখনই মারিব।"

"আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্ষুদ্রাকার যবন দৌবারিককে নিজকরস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।" অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুখিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল এবং অশনি-সম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধবনিতা পৌর-জন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে অসি দ্বারা ছিন্নমস্তক, অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

পৌরজন তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সেই ঘোর আর্ত্তনাদ, অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথা প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে—যবন আসিয়াছে?"

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, "যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।"

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুষ্কশরীর জলস্রোতঃ-প্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজনপাত্রের উপর পড়িয়া যান দেখিয়া, মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন; কহিলেন, "চিন্তা নাই—আপনি উঠুন।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

মহিষী কহিলেন, "চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কী দ্বার দিয়া সোণারগাঁ যাত্রা করি।"

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কিদ্বারপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাল ছিঁড়িল

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখ্‌তিয়ার খিলিজি ধর্ম্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাধিকারের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার সহিত যবনের সন্ধিনিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোৎপাদনের সময় উপস্থিত!

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া, কুপিতা মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া, কদাচিৎ উল্লসিত—কদাচিৎ শঙ্কিত চিত্তে যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহার অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভৃত্যবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বখ্‌তিয়ার খিলিজি তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "পণ্ডিতবর! রাজসিংহাসন আরোহণের পথ কুসুমাবৃত নহে। এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্ব্বদা পদে বিদ্ধ হয়।"

পশুপতি কহিলেন, "সত্য। কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহাদিগেরই বধ আবশ্যক। ইহারা নির্ব্বিরোধী।"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "আপনি কি শোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার স্মরণে অসুখী হইতেছেন?"

পশুপতি কহিলেন, "যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য করিব। মহাশয়ও যে তদ্রূপ করিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই।"

বখ্‌। কিছুমাত্র সংশয় নাই। কেবলমাত্র আমাদিগের এক যাচ্ঞা আছে।

প। আজ্ঞা করুন।

ব। কুতবুউদ্দীন গৌড়-শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই যে, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্য্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না। আপনাকে ইস্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

পশুপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলেন, "সন্ধির সময়ে এরূপ কোন কথা হয় নাই।"

ব। যদি না হইয়া থাকে, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আর এ কথা উত্থাপিত না হইলেও আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে। কেন না, এমন কখনও সম্ভবে না যে, মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।

প। আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না বুঝিয়া থাকেন, এখন বুঝিলেন; আপনি যবনধর্ম্ম অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন।

প। (সদর্পে) আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যবন-সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতনধর্ম্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

ব। ইহা আপনার ভ্রম। যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ-উক্ত ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গলসাধন করুন।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই মাত্র যে, কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নিবদ্ধ সন্ধি ছলক্রমে ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে, বলক্রমে করিবে। অতএব কপটের সহিত কাপট্য অবলম্বন না করিয়া দর্প করিয়া ভাল করেন নাই। তিনি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "যে আজ্ঞা। আমি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব।"

বখ্‌তিয়ারও তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বখ্‌তিয়ার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুর না হইতেন, তবে এত সহজে গৌড়জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "ভাল, ভাল। আজ আমাদিগের শুভ দিন। এরূপ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইস্‌লামের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।"

পশুপতি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! বলিলেন, "একবার মাত্র অবকাশ দিউন, পরিবার-গণকে লইয়া আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন।"

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল। পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "সে কি? আমি কি বন্দী হইলাম?"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "আপাততঃ তাহাই বটে।"

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিরুদ্ধ হইলেন। ঊর্ণনাভের জাল ছিঁড়িল—সে জালে কেবল সে স্বয়ং জড়িত হইল।

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। ঊর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জর ভাঙ্গিল

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনোরমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি যবনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তশীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন।

পশুপতি যাইবামাত্র, মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পলায়নের উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিল না। অতি ঊর্দ্ধে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল; কিন্তু তাহা দুরারোহণীয়; তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্যশরীর নির্গত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; আর তাহা ভূমি হইতে এত উচ্চ যে, তথা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। মনোরমা উন্মাদিনী; সেই গবাক্ষ-পথেই নিষ্ক্রান্ত হইবার মানস করিল।

অতএব পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই, মনোরমা পশুপতির শয্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ করিল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষারোহণ সুলভ হইল। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া, মনোরমা গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ষ পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিল। গবাক্ষনিকটে উদ্যানস্থ একটি আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল। মনোরমা তাহা ধারণ করিল; এবং তখন পশ্চাদ্ভাগ গবাক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। কোমল শাখা তাহার ভরে নমিত হইল; তখন ভূমি তাহার চরণ হইতে অনতিদূরবর্ত্তী হইল। মনোরমা শাখা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িল। এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জনার্দ্দনের গৃহাভিমুখে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যবনবিপ্লব

সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার নিষ্পীড়নে বাত্যাসন্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ, ভূরি ভূরি অশ্বারোহিগণে, ভূরি ভূরি পদাতিদলে, ভূরি ভূরি খড়্গী, ধানুকী, শূলিসমূহসমারোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দ্বার রুদ্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

যবনেরা রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। কোথায়ও বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথায়ও বা শঠতাপূর্ব্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহপ্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্ব্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্ব্বক করিতে লাগিল। কেবল যুবতীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম।

শোণিতে গৃহস্থের গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শোণিতে যবনসেনা রক্তচিত্রময় হইল। অপহৃত দ্রব্যজাতের ভারে অশ্বের পৃষ্ঠ এবং মনুষ্যের স্কন্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ড সকল ভীষণভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে দুলিতে লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলা সকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অশ্বের পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃংহিত, যবনের জয়শব্দ, তদুপরি পীড়িতের আর্ত্তনাদ। মাতার রোদন, শিশুর রোদন; বৃদ্ধের করুণাকাঙ্ক্ষা, যুবতীর কণ্ঠবিদার।

যে বীরপুরুষকে মাধবাচার্য্য এত যত্নে যবনদমনার্থ নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা?

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে, হেমচন্দ্র রণোন্মুখ নহেন। একাকী রণোন্মুখ হইয়া কি করিবেন?

হেমচন্দ্র তখন আপন গৃহের শয়নমন্দিরে, শয্যোপরি শয়ন করিয়া ছিলেন। নগরাক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ?"

দিগ্বিজয় কহিল, "যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে।"

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বখ্‌তিয়ারকর্ত্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের বৃত্তান্ত শুনেন নাই। দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নাগরিকেরা কি করিতেছে?"

দি। যে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে সে প্রাণ হারাইতেছে।

হে। আর গৌড়ীয় সেনা ?

দি। কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে ? রাজা ত পলাতক। সুতরাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে।

হে। আমার অশ্বসজ্জা কর।

দিগ্বিজয় বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন ?"

হে। নগরে।

দি। একাকী ?

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটি করিলেন। ভ্রূকুটি দেখিয়া দিগ্বিজয় ভীত হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল।

হেমচন্দ্র তখন মহামূল্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এবং ভীষণ শূলহস্তে নির্ঝরিণীপ্রেরিত জলবিম্ববৎ সেই অসীম যবন-সেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যুদ্ধজন্য কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হয় নাই, সুতরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন ছিল না। যাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কোন যবন তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্যম করিল, সে তৎক্ষণাৎ মরিল।

হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু যবনেরা পূর্ব্বেই বিজয়লাভ করিয়াছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "একটি একটি করিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িয়া কে অরণ্যকে নিষ্পত্র করিতে পারে ? একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব ? যবন যুদ্ধ করিতেছে না —যবনবধেই বা কি সুখ ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।" হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দুইজন যবন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে, অপর যবনে সেই অবসরে গৃহস্থদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া চলিয়া যায়। যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্বে এক কুটীরমধ্য হইতে হেমচন্দ্র আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন গৃহমধ্যে যবন নাই। কিন্তু গৃহমধ্যে যবনদৌরাত্ম্যের চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই, যাহা আছে তাহার ভগ্নাবস্থা, আর এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সে এ প্রকার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু আসন্ন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যবনভ্রমে কহিতে লাগিল, "আইস—প্রহার কর—শীঘ্র মরিব—মার—আমার মাথা লইয়া সেই রাক্ষসীকে দিও—আঃ—প্রাণ যায়—জল! জল! কে জল দিবে!"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার ঘরে জল আছে?"

ব্রাহ্মণ কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, "জানি না—মনে হয় না—জল! জল! পিশাচী!—সেই পিশাচীর জন্য প্রাণ গেল!"

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জলদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "না!—না! জল খাইব না! যবনের জল খাইব না।" হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যবন নহি, আমি হিন্দু, আমার হাতের জল পান করিতে পার। আমার কথায় বুঝিতে পারিতেছ না?"

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার আর কি উপকার করিব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কি করিবে? আর কি? আমি মরি! মরি! যে মরে তাহার কি করিবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার কেহ আছে? তাহাকে তোমার নিকট রাখিয়া যাইব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কে—কে আছে? ঢের আছে। তার মধ্যে সেই রাক্ষসী! সেই রাক্ষসী—তাহাকে—বলিও—বলিও আমার অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র। কে সে? কাহাকে বলিব?

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, "কে সে পিশাচী! পিশাচী চেন না? পিশাচী মৃণালিনী—মৃণালিনী! মৃণালিনী—পিশাচী।"

ব্রাহ্মণ অধিকতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী তোমার কে হয়?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মৃণালিনী কে হয়? কেহ না—আমার যম।"

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী তোমার কি করিয়াছে?

ব্রাহ্মণ। কি করিয়াছে?—কিছু না—আমি—আমি তার দুর্দ্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল—

হেমচন্দ্র। কি দুর্দ্দশা করিয়াছ?

ব্রাহ্মণ। আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও।

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার তাহাকে জলপান করাইলেন। ব্রাহ্মণ জলপান করিয়া স্থির হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

ব্রা। ব্যোমকেশ।

হেমচন্দ্রের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। দন্তে অধর দংশন করিলেন। করস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। আবার তখনই শান্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিবাস কোথা?"

ব্রা। গৌড়—গৌড় জান না? মৃণালিনী আমাদের বাড়ীতে থাকিত।

হে। তার পর?

ব্রা। তার পর—তার পর আর কি? তার পর আমার এই দশা—মৃণালিনী পাপিষ্ঠা; বড় নির্দ্দয়—আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। রাগ করিয়া আমার পিতার নিকট আমি তাহার নামে মিছা কলঙ্ক রটাইলাম। পিতা তাহাকে বিনাদোষে তাড়াইয়া দিলেন। রাক্ষসী—রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল।

হে। তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন?

ব্রা। কেন?—কেন? গালি—গালি দিই? মৃণালিনী আমাকে ফিরিয়া দেখিত না—আমি—আমি তাহাকে দেখিয়া জীবন—জীবন ধারণ করিতাম। সে চলিয়া আসিল, সেই—সেই অবধি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ, তাহার জন্য কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি—কোথায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি? গিরিজায়া—ভিখারীর মেয়ে—তার আয়ি বলিয়া দিল—নবদ্বীপে আসিয়াছে—নবদ্বীপে আসিলাম, সন্ধান নাই। যবন—যবন-হস্তে মরিলাম, রাক্ষসীর জন্য মরিলাম—দেখা হইলে বলিও—আমার পাপের ফল ফলিল।

আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে পরিশ্রমে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিবিল! ক্ষণপরে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ প্রাণত্যাগ করিল।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। আর যবন বধ করিলেন না—কোন মতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃণালিনীর সুখ কি?

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপানপ্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—মৃণালিনী এখনও সেইখানে। পৃথিবীতে যাইবার আর স্থান ছিল না—সর্ব্বত্র সমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া যত কিছু বলিলেন—মৃণালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামাইয়া স্নান করাইল। স্নান করিয়া মৃণালিনী আর্দ্রবসনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গিরিজায়া স্বয়ং ক্ষুধাতুরা হইল—কিন্তু গিরিজায়া মৃণালিনীকে উঠাইতে পারিল না—সাহস করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। সুতরাং নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফল-মূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃণালিনীকে দিল। মৃণালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল—ক্ষুধার অনুরোধে মৃণালিনীকে ত্যাগ করিল না।

এইরূপে পূর্ব্বাচলের সূর্য্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য্য পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। গিরিজায়া দেখিলেন যে, তখনও মৃণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইলেন। পূর্ব্বরাত্রে জাগরণ গিয়াছে এ রাত্রেও জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল না—বৃক্ষপল্লব সংগ্রহ করিয়া সোপানোপরি আপন শয্যা রচনা করিল। মৃণালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "তুমি ঘরে গিয়া শোও।"

গিরিজায়া মৃণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "একত্র যাইব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি যাইতেছি।"

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিখারিণী দুই দণ্ড পাতা পাতিয়া শুইলে ক্ষতি কি? কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?

মৃ। গিরিজায়া—হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে উঠিয়া বসিল। বলিল, "কি ঠাকুরাণী। তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাঁহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই।"

মৃ। গিরিজায়া—যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুযত্নরচিত পর্ণশয্যা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল, "পাষণ্ড বলিব না?—একবার বলিব?" (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) "একবার বলিব?—দশবার বলিব" (আবার পল্লব নিক্ষেপ)—"শতবার বলিব" (পল্লব নিক্ষেপ)—"হাজারবার বলিব।" এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায়া বলিতে লাগিল, "পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?"

মৃ। সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম।

গি। ঠাকুরাণী! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।

মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।

গি। কি দেখিলে?

মৃ। বেদনা।

গি। কেন হইল?

মৃ। মনে নাই।

গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, "মনে হয় না; বোধ হয়, আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, "ঠাকুরাণী! এ সংসারে আপনি সুখী।"

মৃ। কেন?

গি। আপনি রাগ করেন না।

মৃ। আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গি। তবে কিসে?

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

নবম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন

গিরিজায়া কহিল, "গৃহে চল।" মৃণালিনী বলিলেন, "নগরে এ কিসের গোলযোগ?" তখন যবনসেনা নগর মন্থন করিতেছিল।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল। গিরিজায়া বলিল, "চল, এই বেলা সতর্ক হইয়া যাই।" কিন্তু দুই জন রাজপথের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায়ই নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সরোবর-সোপানে বসিলেন। গিরিজায়া বলিল, "যদি এখানে উহারা আইসে?"

মৃণালিনী নীরবে রহিলেন। গিরিজায়া আপনিই বলিল, "বনের ছায়ামধ্যে এমন লুকাইব—কেহ দেখিতে পাইবে না।"

উভয়ে আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন।

মৃণালিনী ম্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া, বুঝি আমার যথার্থই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।"

গি। সে কি!

মৃ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল; ইনি হেমচন্দ্র। সখি—নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে; যদি নিঃসহায়ে প্রভু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন—না জানি কি বিপদে পড়িবেন!

গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিদ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।

মৃণালিনীও একে আহারনিদ্রাভাবে দুর্ব্বলা—তাহাতে সমস্ত রাত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না—তাঁহারও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্ব্বসমরে বিজয়ী হইয়াছেন। মৃণালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাৎ, কত হস্তী, অশ্ব, পদাতি যাইতেছে। মৃণালিনীকে যেন সেই সেনাতরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভু! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ

করিও না।" হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, "আর কখন তোমায় ত্যাগ করিব না।" সেই কণ্ঠস্বরে যেন—

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না" জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন—কি দেখিলেন? যাহা দেখিলেন, তাহা বিশ্বাস হইল না। আবার দেখিলেন সত্য! হেমচন্দ্র সম্মুখে!—হেমচন্দ্র বলিতেছেন—"আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

নিরভিমানিনী, নির্লজ্জা মৃণালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেম—নানা প্রকার

আনন্দাশ্রুপ্লাবিত-বদনা মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে ধরিয়া উপবন-গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে একবার অপমানিতা, তিরস্কৃতা, ব্যথিতা করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আবার আপনি আ[illegible]াই তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন,—ইহা দেখিয়া গিরিজায়া বিস্মিতা হইল, কিন্তু মৃণালিনী একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটি কথাও কহিলেন না। আনন্দপরিপ্লববিবশা হইয়া বসনে অশ্রুস্রুতি আবৃত করিয়া চলিলেন। গিরিজায়াকে ডাকিতে হইল না—সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবনবাটিকায় মৃণালিনী আসিলে, তখন উভয়ে বহুদিনের হৃদয়ের কথা সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন হেমচন্দ্র, যে যে ঘটনায় মৃণালিনীর প্রতি তাঁহার চিত্তের বিরাগ হইয়াছিল আর যে যে কারণে সেই বিরাগের ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। তখন মৃণালিনী যে প্রকারে হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। তখন উভয়েই হৃদয়ের পূর্ব্বোদিত কত ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন উভয়েই কত ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন; তখন কতই নূতন নূতন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন উভয়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন কত কথাই অতি প্রয়োজনীয় কথার ন্যায় আগ্রহ সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন কতবার উভয়ে মোক্ষোন্মুখ অশ্রুজল কষ্টে নিবারিত

করিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন; সে হাসির অর্থ "আমি এখন কত সুখী!" পরে যখন প্রভাতোদয়সূচক পক্ষিগণ রব করিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, আজি এখনই রাত্রি পোহাইল কেন?—আর সেই নগরমধ্যে যবনবিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বীচি-রববৎ উঠিতেছিল—আজ হৃদয়সাগরের তরঙ্গরবে সে রব ডুবিয়া গেল।

উপবন-গৃহে আর এক স্থানে আর একটা কাণ্ড হইয়াছিল। দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রি জাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল, মৃণালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া চিনিল। মৃণালিনী তাহার নিকট অপরিচিতা ছিলেন না—যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা সম্ভাবনা নাই, কি করে? ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল দেখিয়া দিগ্বিজয় মনে ভাবিল, "বুঝিয়াছি—ইহারা দুই জন গৌড় হইতে আমাদিগের দুই জনকে দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছেন, আর এটা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই।" এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গোঁপদাড়ি চুমরিয়া লইল, এবং ভাবিল, "না হবে কেন?" আবার ভাবিল, "এটা কিন্তু বড়ই নষ্ট—এক দিনের তরে কই আমাকে ভাল কথা বলে না—কেবল আমাকে গালিই দেয়—তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটুকু শুই। দেখি, পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়া নেয় কি না?" ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি ত মৃণালিনীর দাসী—মৃণালিনী এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন—তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম্ম করিবার অধিকার আমারই।" এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল—মনে বড় আনন্দ হইল—তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে। দেখি, গিরিজায়া কি বলে? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়াই রহিল। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্ দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আঃ মলো, ঘরগুলায় ময়লা

জমিয়া রহিয়াছে দেখ—এ কি? এক মিন্সে! চোর না কি? মলো মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার সম্মার্জ্জনীর আঘাত। দিগ্বিজয়ের পিট ফাটিয়া গেল।

"ও গিরিজায়া, আমি! আমি!"

"আমি! আরে তুই বলিয়াই ত খাঙ্গরা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।" এই বলিবার পর আবার বিরাশী সিক্কা ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

"দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া! আমি দিগ্বিজয়!"

"আবার চুরি করিতে এসে—আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিন্সে!" ঝাঁটার বেগ আর থামে না।

দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল, "গিরিজায়া, আমাকে ভুলিয়া গেলে?"

গিরিজায়া বলিল, "তোর আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্সে!"

দিগ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। গিরিজায়া সম্মার্জ্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচয়

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। গিরিজায়া আসিয়া মৃণালিনীর নিকট বসিল।

গিরিজায়া মৃণালিনীর দুঃখের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া দুঃখের সময় দুঃখের কাহিনী সকল শুনিয়াছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদুর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না; আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃণালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল।

যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এত দিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্য?"

মৃ। এত দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্য প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, এজন্য প্রকাশ করিতেছি।

গি। ঠাকুরাণী! সকল কথা বল না! আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।

তখন মৃণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার পিতা একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী। তিনি অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখিত্ব ছিল।

আমি একদিন মথুরায় রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমুনার জলবিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে তখন চিনিতাম না—তিনিই হেমচন্দ্র। তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন। জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান! হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন না। তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসার আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচয় লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবস পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না। এরূপ দুর্দ্দিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। সুতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমার বয়স পনের বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম না। হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুরাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'বিবাহ কর।' সুতরাং আমারও বোধ হইল, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্থ দিবসে, দুর্য্যোগের উপশম দেখিয়া উপবাস করিলাম; দিগ্বিজয় উদ্যোগ করিয়া দিল। তীর্থপর্য্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।"

গি। কন্যা সম্প্রদান করিল কে?

মৃ। অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; আমার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। আমি তাঁহার

নাম করিলাম। দিগ্বিজয় কোন ছলে পুরমধ্যে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। অরুন্ধতী মনে জানিতেন, আমি যমুনায় ডুবিয়া মরিয়াছি। তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহ্লাদিত হইলেন যে, আর কোন কথাতেই অসন্তুষ্ট হইলেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অদ্য তুমি জানিলে।

গি। মাধবাচার্য্য জানেন না ?

মৃ। না, তিনি জানিলে সর্ব্বনাশ হইত। মগধরাজ তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ, মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শত্রু।

গি। ভাল, তোমার বাপ যদি তোমাকে এ পর্য্যন্ত কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই কেন ?

মৃ। বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া সুকঠিন; কেন না, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লোপ হইয়াছে। পিতা বৌদ্ধ জামাতা চাহেন, অথচ সুপাত্রও চাহেন। এরূপ একটি পাওয়া গিয়াছিল, সে আমার বিবাহের পর। বিবাহের দিন স্থির হইয়া সকল উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেই সময়ে জ্বর করিয়া বসিলাম। পাত্র অন্যত্র বিবাহ করিল।

গি। ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্বর করিয়াছিলে ?

মৃ। হাঁ, ইচ্ছাপূর্ব্বক। আমাদিগের উদ্যানে একটা কূয়া আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না। তাহার পানে বা স্নানে নিশ্চিত জ্বর। আমি রাত্রিতে গোপনে সেই জলে স্নান করিয়াছিলাম।

গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে ?

মৃ। সন্দেহ কি ? নচেৎ হেমচন্দ্রের নিকট পলাইয়া যাইতাম।

গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ। স্ত্রীলোক হইয়া কাহার সহায়ে পলাইতে ?

মৃ। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায়

বাণিজ্য করিতে আসিতেন। যখন তিনি তথায় না থাকিতেন, তখন দিগ্বিজয় তথায় তাঁহার দোকান রাখিত। দিগ্বিজয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, যখন আমি যেরূপ আজ্ঞা করিব, সে তখনই সেরূপ করিবে। সুতরাং আমি নিঃসহায় ছিলাম না।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বলিল, "ঠাকুরাণী! আমি একটি বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত আছি।"

মৃ। কি এমন গুরুতর কাজ করিলে?

গি। দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম, ওটা অতি অপদার্থ। এজন্য আমি প্রভাতে তাহাকে ভালরূপে খা কত ঝাঁটা দিয়াছি। তা ভাল করি নাই।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

গি। ভিখারীর মেয়ের কি বিবাহ হয়?

মৃ। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

গি। তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব—আর কি করি?

মৃণালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আজি তোমার গায়ে হলুদ দিব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আচার্য্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কি আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি, এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব বিধিলিপি! নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গৌড়জয় করিল কি প্রকারে? যদি এখন এই দেহ পতন করিলে, এক দিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে এই ক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। সেই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে যুদ্ধের আশায় নগরমধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম—কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এক পক্ষ আক্রমণ করিতেছে—অপর পক্ষ পলাইতেছে।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস। দুঃখিত হইও না। দৈবনির্দ্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন; তাঁহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহার অল্পই সম্ভাবনা।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বদেশে যবন পরাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব্ব নহে—কামরূপই পূর্ব্ব। বোধ হয়, তথায়ই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে।"

হে। কিন্তু এক্ষণে ত যবনের কামরূপ যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না।

মা। এই যবনেরা ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে ইহারা সুস্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে।

হে। তাহাও মানিলাম। এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সদুপায় হইল?

মা। এই যবনেরা এ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ জয়লাভ করিয়া অজেয় বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না। তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্য্যবংশীয় রাজারা ধৃতাস্ত্র হইয়া উঠিবেন। সকলে এক হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে যবনেরা কত দিন তিষ্ঠিবে?

হে। গুরুদেব! আপনি আশামাত্রের আশ্রয় লইতেছেন; আমিও তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন।

মা। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্ত্তব্য; কেন না, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা—তুমি অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে।

হে। কোথায় যাইব?

মা। আমার সঙ্গে কামরূপ চল।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মৃদু মৃদু কহিলেন, "মৃণালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন?"

মাধবাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি! আমি ভাবিতেছিলাম যে, তুমি কালিকার কথায় মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দূর করিয়াছিলে!"

হেমচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় মৃদুভাবে বলিলেন, "মৃণালিনী অত্যাজ্যা। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।"

মাধবাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন। রুষ্ট হইলেন। ক্ষোভ করিয়া কহিলেন, "আমি ইহার কিছু জানিলাম না?"

হেমচন্দ্র তখন আদ্যোপান্ত তাঁহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য কিছুক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। কহিলেন, "যে স্ত্রী অসদাচারিণী, সে ত শাস্ত্রানুসারে ত্যাজ্যা। মৃণালিনীর চরিত্রসম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা কালি প্রকাশ করিয়াছি।"

তখন হেমচন্দ্র ব্যোমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "বৎস! বড় প্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবঞ্চ গুণবতী ভার্য্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্ম্মাচরণ কর। যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অগ্রে যাইতেছি। যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও।"

এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের নিকট বিদায় হইলেন। মাধবাচার্য্য আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত

যে রাত্রে রাজধানী যবন-সেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতেছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল।

হম্মদ আলি তখন তাঁহার সম্ভাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন, "যবন!—প্রিয়-সম্ভাষণে আর আবশ্যকতা নাই। একবার তোমারই প্রিয়সম্ভাষণে বিশ্বাস করিয়া এই দশাপন্ন হইয়াছি। বিধর্ম্মী যবনকে বিশ্বাস করিবার যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়াছি। তোমাদিগের কোন প্রিয়সম্ভাষণ শুনিব না।"

মহম্মদ আলি কহিল, "আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করি—প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে হইবে।"

পশুপতি কহিলেন, "সে বিষয়ে চিত্ত স্থির করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি—কিন্তু যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিব না।"

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোষাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্য ম্লেচ্ছের বেশ পরিব?

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক না পরিলে, আপনাকে বলপূর্ব্বক পরাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

প। কোথায় যাইব?

ম। আপনি বন্দী—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

মহম্মদ আলি তাঁহাকে সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন। যে ব্যক্তি পশুপতির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচয় দিলেন; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন জনে কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন যবনসেনা নগরমন্থন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল; সুতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কহিলেন, "ধর্ম্মাধিকার! আপনি আমাকে বিনা দোষে তিরস্কার করিয়াছেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্ত্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে

নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এইখান হইতে বিদায় হই।"

পশুপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। মহম্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "আপনি এই রাত্রিমধ্যে এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে যবনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটিবে। খিলিজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিলাম—ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম। ইহাকেও আপনার নৌকায় লইয়া যাইবেন।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন। পশুপতি কিয়ৎকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন

মহম্মদ আলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীরে চলিলেন—যবনের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতপদক্ষেপণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতি পদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতি পদে শোণিতসিক্ত কর্দ্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য—বহুগৃহ ভস্মীভূত; কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপরি মৃতদেহ। এখনও কোন হতভাগ্য মরণ-যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাত্র বটে—কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন? যবন তাঁহাকে ধৃত করুক—অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক—মনে করিলেন ফিরিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগনের নক্ষত্র-চন্দ্র-গ্রহমণ্ডলীবিভূষিত সহাস্য পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে সহিল না—তীব্র জ্যোতিঃসম্পীড়িতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন—এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিস্রুত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিতকলেবরে পুনরুত্থান করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না—দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজবাটী? তাহা কি যবনহস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণ-পুত্তলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কি হইয়াছে? মনোরমার কি দশা হইয়াছে? তাঁহার প্রাণাধিকা, তাঁহাকে পাপপথ হইতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যবনসেনাপ্রবাহে সে কুসুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে।

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যবনেরা তাঁহার পৌরজন সহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই।

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করে। আপন বিকল চিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিলেন। হলাহল-কলস পরিপূর্ণ হইল—হৃদয়ের শেষ তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে দহ্যমান অট্টালিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন—মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ অল্পক্ষণ বিকলশরীরে একস্থানে অবস্থিতি করিলেন—শেষে মহাবেগে সেই অনলতরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

মহাবেগে পশুপতি জ্বলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধশরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ড সকল অগ্নিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে

দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনিসম্পাতশব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূমে, ধূলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

দাবানলসংবেষ্টিত আরণ্য গজের স্থায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্ততঃ দাসদাসী স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের স্থায় কহিলেন, "মা! জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমায় পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়াছিলাম—এখন, মা, এক দিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?"

মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ! ধাতুমূর্ত্তি!—তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র, দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জ্জিতেছে! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীর্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।"

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। তখনই পর্ব্বতবিদারাহুরূপ প্রবল শব্দ হইল,—দগ্ধ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধূমভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবন সমাধি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিমকালে

পশুপতি স্বয়ং অষ্টভুজার অর্চ্চনা করিতেন বটে—কিন্তু তথাপি তাঁহার নিত্যসেবার জন্য দুর্গাদাস নামে এক জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগরবিপ্লবের পর দিবস দুর্গাদাস প্রাত

ইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভুজার র্ত্তি ভস্ম হইতে উদ্ধার করিয়া আপন গৃহে স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যবনেরা গর লুঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখ্‌তিয়ার খিলিজি অনর্থক নগরবাসীদিগের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহস করিয়া বাঙ্গালীরা রাজপথে বাহির ইতেছিল। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস অপরাহ্নে অষ্টভুজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিয়া, যথায় দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন, অনেক ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না করিলে, দেবীর প্রতিমা বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টক সকল অর্দ্ধ দ্রবীভূত হইয়া পরস্পর লিপ্ত হইয়াছিল—এবং এখন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুত্রে এক দীর্ঘিকা হইতে জল বহন করিয়া তপ্ত ইষ্টক সকল শীতল করিলেন, এবং বহুকষ্টে তন্মধ্য হইতে অষ্টভুজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্কৃতা হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে—এ কি? সভয়ে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন যে, মনুষ্যের মৃতদেহ রহিয়াছে। তখন উভয়ে মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, পশুপতির দেহ।

বিস্ময়সূচক বাক্যের পর দুর্গাদাস কহিলেন, "যে প্রকারেই প্রভুর এ দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এবঞ্চ প্রতিপালিতের কার্য্য আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুর সংকার করি চল।"

এই বলিয়া দুই জনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দুর্গাদাস নগরে কাষ্ঠাদি সংকারের উপযোগী সামগ্রীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন দুর্গাদাস পুত্রের আনুকূল্যে যথাশাস্ত্র দাহের পূর্ব্বগামী ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া সুগন্ধি কাষ্ঠে চিতা রচনা করিলেন। এবং তদুপরি পশুপতির মৃতদেহ স্থাপন করিয়া অগ্নিপ্রদান করিতে গেলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্রাহ্মণদ্বয় বিস্মিত-লোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িতকুন্তলা, ভস্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে। রমণী ব্রাহ্মণদিগের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন।

দুর্গাদাস সভয়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

রমণী কহিলেন, "তোমরা কাহার সংকার করিতেছ ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "মৃত ধর্ম্মাধিকার পশুপতির।"

রমণী কহিলেন, "পশুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যবনকর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়া কোন সুযোগে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন। অদ্য তাঁহার অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, ভস্মমধ্য হইতে অষ্টভুজার প্রতিমা উদ্ধারমানসে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া প্রভুর মৃতদেহ পাইলাম।"

রমণী কোন উত্তর করিলেন না। গঙ্গাতীরে, সৈকতের উপর উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ?" দুর্গাদাস কহিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ; ধর্ম্মাধিকারের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আপনি কে ?"

তরুণী কহিলেন, "আমি তাঁহার পত্নী।"

দুর্গাদাস কহিলেন, "তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্দিষ্টা। আপনি কি প্রকারে তাঁহার পত্নী ?"

যুবতী কহিলেন, "আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা। অনুমরণভয়ে পিতা আমাকে এতকাল লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পূরাইবার জন্য আসিয়াছি।"

শুনিয়া পিতাপুত্রে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন, "এখন স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কাজ করিব। তোমরা উদ্যোগ কর।"

দুর্গাদাস তরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন; পুত্রের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল ?"

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। দুর্গাদাস তখন তরুণীকে কহিলেন, "মা, তুমি বালিকা—এ কঠিন কার্য্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ ?"

তরুণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন ?—ইহার উদ্যোগ কর।"

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজন জন্য নগরে পুনর্ব্বার চলিলেন। গমনকালে বিধবা দুর্গাদাসকে কহিলেন, "তুমি নগরে যাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবনবাটিকায় হেমচন্দ্র নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও, মনোরমা গঙ্গাতীরে

চিতারোহণ করিতেছে—তিনি আসিয়া একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন, তাঁহার নিকটে ইহলোকে মনোরমার এই মাত্র ভিক্ষা।"

হেমচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণমুখে শুনিলেন যে, মনোরমা পশুপতির পত্নীপরিচয়ে তাঁহার অনুমৃতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসের সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার অতি মলিনা, উন্মাদিনী মূর্ত্তি, তাঁহার স্থিরগম্ভীর, এখনও অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর জল আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "মনোরমা! ভগিনী! এ কি এ?"

তখন মনোরমা, জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থির মূর্ত্তিতে মৃদুগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভাই, যে জন্য আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।"

মনোরমা সংক্ষেপে অন্যের শ্রবণাতীত স্বরে হেমচন্দ্রের নিকট পূর্ব্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার স্বামী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠ যবনে তাহা ভোগ করিবে। তাহার অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনার্দ্দন শর্ম্মাকে কাশীধামে স্থাপন করিবে। জনার্দ্দনকে অধিক ধন দিও না। তাহা হইলে যবনে কাড়িয়া লইবে। আমার দাহের পর, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের সন্ধান করিও। আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁড়িলেই তাহা পাইবে। আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে না।" এই বলিয়া মনোরমা যথা অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন। জনার্দ্দনকে ও তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হেমচন্দ্রের দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট কত স্নেহসূচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন।

পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন। এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘসন্তপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরিশিষ্ট

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার কিয়দংশ জনার্দ্দনকে দিয়া তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা মাধবাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য্য বলিলেন, "এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য ; এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণও উচিত। দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আমার পরামর্শ যে, তুমি এই ধনের দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর, এবং তথায় যবনদমনোপযোগী সেনা সৃজন কর। তৎসাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাতসিদ্ধ করিও।"

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন। মৃণালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয় তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রাজ্যসংস্থাপন অতি সহজ কাজ হইয়া উঠিল ; কেন না, যবনদিগের ধর্ম্মদ্বেষিতায় পীড়িত এবং তাঁহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

মাধবাচার্য্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইল। এই রূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল। অচিরাৎ রমণীয় রাজপুরী নির্ম্মিত হইল। মৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন।

গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের পরিণয় হইল। গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন, দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের কার্য্য পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যে দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দুঃখিত ছিলেন, এমন নহে। বরং একদিন কোন দৈবকারণবশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণ বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না কি ?" বস্তুতঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিল।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিল। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল "সই" "সই" রহিল।

মৃণালিনী মাধবাচার্য্যের দ্বারা হৃষীকেশকে অনুরোধ করাইয়া মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী রাজপুরীমধ্যে মৃণালিনীর সখীর স্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।

শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সম্পূর্ণ

বিভিন্ন সংস্করণে 'মৃণালিনী'র পাঠভেদ

'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত তৃতীয় সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার ৩১ বৎসর বয়সে প্রকাশিত। এই বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত—পুরাতনকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিবার আয়োজন ভিতরে ভিতরে চলিতেছে; বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বপ্ন দেখিতেছেন। ফলে 'মৃণালিনী'র উপর ধাক্কাটা একটু অধিক পড়িয়াছে। বস্তুতঃ এইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তিত রচনা। ১ম সংস্করণে ব্যবহৃত কঠিন সংস্কৃতমূলক সাধুভাষাকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া সহজ প্রাকৃত ভাষায় পরিবর্ত্তিত করার পরীক্ষাগার-রূপে বঙ্কিমচন্দ্র যেন 'মৃণালিনী'কে ব্যবহার করিয়াছেন। সেদিক্ দিয়া 'মৃণালিনী'র বিভিন্ন সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুককর; তিনি যে ধীরে ধীরে সহজ চল্‌তি ভাষার দিকে ঝোঁক দিতেছিলেন, 'মৃণালিনী'র পরিবর্ত্তন হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। প্রথম সংস্করণে 'মৃণালিনী' প্রথম খণ্ড—৮, দ্বিতীয় খণ্ড—১২, তৃতীয় খণ্ড—১০, চতুর্থ খণ্ড—১৫ ও পরিশিষ্ট—১, মোট ৪৬ পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল। চতুর্থ খণ্ডের "তৃতীয় পরিচ্ছেদে"র পরই ভ্রমক্রমে "পঞ্চম পরিচ্ছেদ" মুদ্রিত হওয়াতে প্রথম সংস্করণে চতুর্থ খণ্ডের পরিচ্ছেদ-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬। দ্বিতীয় সংস্করণেও প্রথম সংস্করণের ভুল সহ অনুরূপ পরিচ্ছেদ-বিভাগ ছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে প্রথম খণ্ড—৬, দ্বিতীয় খণ্ড—১২, তৃতীয় খণ্ড—১০, চতুর্থ খণ্ড—১৫ ও পরিশিষ্ট—১, মোট ৪৪টি পরিচ্ছেদ। প্রথম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে বাদ পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'মৃণালিনী'র দশটি সংস্করণ হইয়াছিল। যথা, ১ম—১৮৬৯, পৃ. ২৪১; ২য়—১৮৭১, পৃ. ২৪১; ৩য়—১৮৭৪, পৃ. ১৯৫; ৪র্থ—১৮৭৮; ৫ম—১৮৮০, পৃ. ১৯১; ৬ষ্ঠ—১৮৮১, পৃ. ১৯১; ৭ম—১৮৮৩, পৃ. ১৭৪; ৮ম—১৮৮৬, পৃ. ১৯৪; ৯ম—১৮৯০, পৃ. ২১৫ ও ১০ম—১৮৯৩, পৃ. ২৫৮। আমরা ১ম, ২য়, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম সংস্করণের পাঠ মিলাইয়াছি। 'পাঠভেদে' শুধু ১ম ও ১০ম সংস্করণ ব্যবহৃত হইতেছে। ১ম সংস্করণের ১ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদ ১০ম সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ হইয়াছে। 'মৃণালিনী'তে পাঠ পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন এত বেশী যে সবগুলি লিপিবদ্ধ করিলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়। আমরা মোটামুটি অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ও সংযোজন দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দুই সংস্করণের "যবন" ও "বঙ্গ" স্থলে পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রায় সর্ব্বত্র "তুরক" ও "গৌড়" ব্যবহার করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিবর্জ্জিত প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদ এইরূপ ছিল।—

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রঙ্গভূমি।

মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি তুর্কস্থানীয় কুতবউদ্দীন যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। দিল্লী, কান্যকুব্জ, মগধাদি প্রাচীন সাম্রাজ্য সকল যবনকরকবলিত হইয়াছে। অশোক বা হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য বা শিলাদিত্য, ইঁহাদিগের পরিত্যক্ত ছত্রতলে যবনমুণ্ড আশ্রিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়, শূদ্র; নন্দবংশ, গুপ্তবংশ;—ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ; রাঠোর, তুয়ার; এ সকলে আর ভারতবর্ষের স্বামিত্ব লইয়া বিবাদ করে না। যবনের শ্বেত ছত্রে সকলের গৌরব ছায়ান্ধকারব্যাপ্ত করিয়াছে।

বঙ্গীয় ৬০৬ অব্দে যবনকর্ত্তৃক মগধ জয় হইল। প্রভূত রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া বিজয়ী সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি, রাজপ্রতিনিধির চরণে উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

কুতবউদ্দীন প্রসন্ন হইয়া বখতিয়ার খিলিজিকে পূর্ব্বভারতের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। গৌরবে বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজপ্রতিনিধির সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন।

কেবল ইহাই নহে; বিজয়ী সৈনাপতির সম্মানার্থ কুতুবউদ্দীন মহাসমারোহ পূর্ব্বক উৎসবাদির জন্য দিনাবধারিত করিলেন।

উৎসববাসর আগত হইল। প্রভাতাবধি, "রায় পিথোরার" প্রস্তরময় দুর্গের প্রাঙ্গণভূমি জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। সশস্ত্রে, শত শত সিন্দুনদপারবাসী শৃঙ্খল যোদ্ধবর্গ রঙ্গাঙ্গনের চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদিগের করস্থিত উন্নতফলক বর্শার অগ্রভাগে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ জ্বলিতে লাগিল। মালাসম্বদ্ধ কুসুমদামের ন্যায় তাহাদিগের বিচিত্র উষ্ণীষশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। তৎপশ্চাতে দাস, শিল্পী প্রভৃতি অপর মুসলমানেরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া দণ্ডায়মান হইল। যে দুই এক জন হিন্দু কৌতূহলের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সাহসে ভর করিয়া রঙ্গ দর্শনে আসিয়াছিল, তাহারা তৎপশ্চাতে স্থান পাইল, অথবা স্থান পাইল না, কেননা যবনদিগের বেত্রাঘাতে, ও পদাঘাতে পীড়িত এবং ভীত হইয়া অনেককে পলায়ন করিতে হইল।

রাজপ্রতিনিধি স্বদলে সমাগত হইয়া রঙ্গাঙ্গনের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রহস্য আরম্ভ হইল। প্রথমে মল্লদিগের যুদ্ধ, পরে খড়্গী, শূলী, ধানুকী, সশস্ত্র অশ্বারোহীর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে মত্ত সেনামাতঙ্গ সকল মাহুত সহিত আনীত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া কৌশল দেখাইতে লাগিল। দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে একতানমনে ক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে আপন আপন মন্তব্য সকল পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এক স্থানে কয়েকটী বর্ষীয়ান্ মুসলমান একত্র হইয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

এক জন কহিল, "সত্য সত্যই কি পারিবে ?"

অপর উত্তর করিল, "না পারিবে কেন ? ঈশ্বর যাহাকে সদয় সে কি না পারে ? রোস্তম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়াছিল, তবে বখ্‌তিয়ার যুদ্ধে একটা হাতি মারিতে পারিবে না ?"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "তথাপি উহার ঐ ত বানরের ন্যায় শরীর, এ শরীর লইয়া মত্ত হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে সাহস করা, পাগলের কাজ।"

প্রথম প্রস্তাবকর্ত্তা কহিল, "বোধ হয় খিলিজিপুত্র এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছে ; সেই জন্য এখনও অগ্রসর হইতেছে না।"

আর এক ব্যক্তি কহিল, "আরে, বুঝিতেছ না, বখতিয়ারের মৃত্যুর জন্য পাঁচ জনে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এই এক উপায় করিয়াছে। বেহার জয় করিয়া বখতিয়ারের বড় দম্ভ হইয়াছে। আর রাজপ্রসাদ সকলই তিনি একক ভোগ করিতেছেন। এই জন্য পাঁচ জনে বলিল যে বখ্‌তিয়ার অমানুষ বলবান্, চাহি কি মত্ত হাতী একা মারিতে পারে। কুতবউদ্দীন তাহা দেখিতে চাহিলেন। বখতিয়ার দম্ভে লঘু হইতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন।"

এই বলিতে বলিতে রঙ্গাঙ্গন মধ্যে তুমুল কোলাহল ধ্বনি সংঘোষিত হইল। দ্রষ্টৃবর্গ সভয় চক্ষে দেখিলেন, পর্ব্বতাকার, শ্রাবণের দিগন্তব্যাপী জলদাকার, এক মত্ত মাতঙ্গ, মাহুত কর্ত্তৃক আনীত হইয়া, রঙ্গাঙ্গন মধ্যে দুলিতে দুলিতে প্রবেশ করিল। তাহার মুহুর্মুহুঃ শুণ্ডাস্ফালন, মুহুর্মুহুঃ বিপুল কর্ণতাড়ন, এবং বিশাল বঙ্কিম দন্তদ্বয়ের অমল-শ্বেত স্থির শোভা দেখিয়া দর্শকেরা সভয়ে পশ্চাদ্গত হইয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাদপসারী দর্শকদিগের বস্ত্র মর্ম্মরে, ভয়সূচক বাক্যে, এবং পদধ্বনিতে কিয়ংক্ষণ রঙ্গাঙ্গন মধ্যে অস্ফুট কলরব হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সে কলরব নিবৃত্ত হইল। কৌতূহলের আতিশয্যে সেই জনাকীর্ণ স্থল একেবারে শব্দহীন হইল। সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে বখ্‌তিয়ার খিলিজির রঙ্গপ্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন বখতিয়ার খিলিজিও রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া গজরাজের সম্মুখীন হইয়া দেখা দিলেন। যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিত না, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, অপিচ বিরক্ত হইল। তাঁহার শরীরে বীরলক্ষণ কিছুই ছিল না। তাঁহার দেহের আয়তন অতি ক্ষুদ্র ; গঠন অতি কদর্য্য। শরীরের সকল স্থানই দোষবিশিষ্ট। তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল। "আজানু-লম্বিত বাহু" সুলক্ষণ হইলে হইতে পারে, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য সন্দেহ নাই। বখতিয়ারের বাহুযুগল জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত ; সুতরাং বানরের সহিত তাঁহার দৃশ্যগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইত। তাঁহাকে দেখিয়া একজন মুসলমান আর একজনকে কহিল, "ইনিই বেহার জয় করিয়াছেন ? এই শরীরে এত বল ?"

একজন অস্ত্রধারী হিন্দুযুবা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "পবননন্দন হনু কলিকালে মর্কট রূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "তুই কি বলিস রে কাফের ?"

হিন্দু পুনরপি কহিল, "পবননন্দন কলিতে মর্কট রূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "আমি তোর কথা বুঝিতে পারিতেছি না; তুই তীর ধনু লইয়া এখানে আসিয়াছিস কেন?"

হিন্দু কহিল, "আমি বাল্যকালে তীর ধনু লইয়া খেলা করিতাম। সেই অবধি অভ্যাস দোষে তীর ধনু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

যবন কহিল, "হিন্দুদিগের সে অভ্যাস দোষ ক্রমে ঘুচিতেছে। এ খেলায় আর এখন কাফেরের সুখ নাই। সুভন এল্লা! একি?"

এই বলিয়া যবন রঙ্গভূমি প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। বখ্‌তিয়ার নিজ দীর্ঘভুজে এক শাণিত কুঠার ধারণ করিয়া বারণরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বারণ তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া, ইতস্ততঃ সমযোগ্য প্রতিযোগীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রকায় একজন মনুষ্য যে তাহার রণাকাঙ্ক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা তাহার হস্তিবুদ্ধিতে উপজিল না।. বখতিয়ার মাহুতকে অনুজ্ঞা করিলেন, যে হস্তীকে তাড়াইয়া আমার উপর দাও। মাহুত গজশরীরে চরণাঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বখ্‌তিয়ারকে দেখাইয়া দিল। তখন হস্তী উর্দ্ধশুণ্ডে বখ্‌তিয়ারকে আক্রমণ করিল। বখ্‌তিয়ার নিমেষ মধ্যে করিশুণ্ড প্রক্ষেপ হইতে ব্যবহিত হইয়া শুণ্ডোপরে তীব্র কুঠারাঘাত করিল। যূথপতি ব্যথায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং ক্রোধে পতনশীল পর্ব্বতবৎ বেগে প্রহারকারীর প্রতি ধাবমান হইল; কুঠারাঘাতে সে বেগ রোধের কোন সম্ভাবনা রহিল না। দ্রষ্টৃবর্গ সকলে দেখিল, যে পলকমধ্যে বখ্‌তিয়ার কর্দ্দমপিণ্ডবৎ দলিত হইবেন। সকলে বাহূত্তোলন করিয়া "পলাও পলাও" শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু বখ্‌তিয়ার মগধ জয় করিয়া আসিয়া রঙ্গভূমে পলায়ন তৎপর হইবেন কি প্রকারে? তিনি, তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ মনে মনে স্বীকার করিলেন।

করিরাজ আত্মবেগভরে তাঁহার পৃষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; একেবারে বখ্‌তিয়ারকে দলিত করিবার মানসে, নিজ বিশাল চরণ উত্তোলন করিল কিন্তু তাহা বখ্‌তিয়ারের স্কন্ধে স্থাপিত হইতে না হইতেই ক্ষয়িতমূল অট্টালিকার ন্যায়, সশব্দে রজ-উৎকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ যূথপতি ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।

যাহারা সবিশেষ দেখিতে না পাইল, তাহারা বিবেচনা করিল যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি কোন কৌশলে হস্তির বধ সাধন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মুসলমান মণ্ডলী মধ্যে ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু অন্যে দেখিতে পাইল যে হস্তির গ্রীবার উপর একটী তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। কুতবউদ্দীন বিস্মিত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য মৃতগজের নিকট আসিলেন, এবং স্বীয় অস্ত্রবিদ্যার প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে এই শরবেধই হস্তির মৃত্যুর একমাত্র কারণ। বুঝিলেন যে শর, অসাধারণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্থূল হস্তিচর্ম্মে, তৎপরে হস্তিগ্রীবার বিপুল মাংসরাশি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিয়াছে। শরনিক্ষেপকারির আরও এক অপূর্ব্ব নৈপুণ্যলক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড মধ্যস্থ মজ্জার সংযোগ হইয়াছে * সেই স্থানেই তীর প্রবিদ্ধ হইয়াছে। তথায় সূচিমাত্র প্রবিষ্ট হইলে

* Medulla Oblongata. পাঠক মহাশয় "রাইড, অব, লেমরমুরে" এইরূপ একটী বৃত্তান্ত মনে পড়িতে পারে।

জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়—পলকমাত্রও বিলম্ব হয় না। এই স্থানে শর বিদ্ধ না হইলে কখনই বখতিয়ারের রক্ষা সিদ্ধ হইত না। কুতবউদ্দীন, আরও দেখিলেন তীরের গঠন সাধারণ হইতে ভিন্ন। তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, এবং একটী বিশেষ চিহ্নে অঙ্কিত। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যে, যে ব্যক্তি এই শর ত্যাগ করিয়াছিল, সে অসাধারণ বাহুবলশালী; তাহার শিক্ষা বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লঘুগতি।

কুতবউদ্দীন গজঘাতী প্রহরণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

কেহ উত্তর দিল না। কুতবউদ্দীন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

যে যবন অনেক হিন্দুশস্ত্রধারিকে তাড়না করিয়াছিল, সে এইবার কহিল, "জাঁহাপনা! এক জন কাফের এই স্থানে দাঁড়াইয়া তীর মারিয়াছিল দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতেছি না।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রুকুটি করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিমনা হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "বখ্‌তিয়ার খিলিজি মত্তহস্তী যুদ্ধে বধ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর। কোন কাফের তাঁহার গৌরবের লাঘব জন্মাইবার অভিলাষে, অথবা তাঁহার প্রাণ সংহার জন্য এই তীর ক্ষেপ করিয়া থাকিবে। আমি তাহার সন্ধান করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। তোমরা সকলে গৃহে গিয়া আজিকার দিন আনন্দে যাপন করিও।"

ইহা শুনিয়া দর্শকগণ ধন্যবাদ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইল। ইত্যবসরে কুতবউদ্দীন এক জন পারিষদকে হস্তস্থিত তীর প্রদান করিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ দিলেন, "যাহার নিকট এইরূপ তীর দেখিবে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অনেকে সন্ধান কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গজহন্তা।

কুতবউদ্দীন, দেওয়ানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বখ্‌তিয়ার খিলিজি এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ লইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমত সময়ে কয়েক জন সৈনিক পূর্ব্বপরিচিত হিন্দু যুবাকে সশস্ত্র ধৃত করিয়া আনয়ন করিল।

রক্ষিগণ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যুবাকে রাজপ্রতিনিধি সমক্ষে উপস্থিত করিলে, কুতবউদ্দীন বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবকের অবয়বও নিরীক্ষণযোগ্য। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন। শরীর ঈষন্মাত্র দীর্ঘ, এবং অনতিস্থূল ও বলব্যঞ্জক। মস্তক যেরূপ পরিমিত হইলে, শরীরের উপযোগী হইত, তদপেক্ষা বৃহৎ, এবং তাহার গঠন অতি রমণীয়। ললাট প্রশস্ত বটে, কিন্তু অল্পবয়ঃপ্রযুক্ত অনতিবৃহৎ, তাহার মধ্য দেশে "রাজদণ্ড" নামে পরিচিত শিরা প্রকটিত। ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, তরলরোম; তত্তলস্থ অস্থি কিছু উন্নত। চক্ষুঃ, বিশেষ আয়ত নহে, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য গুণে আয়ত বলিয়া বোধ হইত। নাসা মুখের উপযোগী; অত্যন্ত দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম।

ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র; সর্ব্বদা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট; পার্শ্বভাগে অস্পষ্ট মণ্ডলার্দ্ধ রেখায় বেষ্টিত। ওষ্ঠে ও চিবুকে কোমল নবীন রোমাবলি শোভা পাইতেছিল। অঙ্গের গঠন, বলসূচক হইলে, কর্কশতা শূন্য। বর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ গৌর। অঙ্গে কবচ, মস্তকে উষ্ণীষ, পৃষ্ঠে তূণীর লম্বিত; করে ধনু; কটিবন্ধে অসি।

কুতব-উদ্দীন যুবাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেখিয়া যুবা ভ্রূকুটি করিলেন এবং কুতবকে কহিলেন, "আপনকার কি আজ্ঞা?"

শুনিয়া কুতব হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি কি শরত্যাগে আমার হস্তী বধ করিয়াছ?"

যুবা। "করিয়াছি।"

কু। "কেন তুমি আমার হাতী মারিলে?"

যুবা। "না মারিলে হাতী আপনার সেনাপতিকে মারিত।"

ইহা শুনিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বলিলেন, "হাতী আমার কি করিত?"

যুবা। "চরণে দলিত করিত।"

বখ্‌তিয়ার। "আমার কুঠার কি জন্য ছিল?"

যুবা। "হস্তিকে পিপীলিকা দংশনের ক্লেশানুভব করাইবার জন্য।"

কুতবউদ্দীনের ওষ্ঠাধর প্রান্তে অল্প মাত্র হাস্য প্রকটিত হইল। সেনাপতি অপ্রতিভ হয়েন দেখিয়া কুতবউদ্দীন তখনই কহিলেন, "তুমি হিন্দু, মুসলমানের বল জান না। সেনাপতি, অনায়াসে কুঠারাঘাতে হস্তিবধ করিত। তথাপি তুমি যে সেনাপতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তীরত্যাগ করিয়াছিলা—ইহাতে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে পুরস্কৃত করিব।" এই বলিয়া কুতবউদ্দীন কোষাধ্যক্ষের প্রতি যুবাকে শত মুদ্রা দিতে অনুমতি করিলেন।

যুবা শুনিয়া কহিলেন, "যবন রাজপ্রতিনিধি! শুনিয়া লজ্জিত হইলাম। যবন সেনাপতির জীবনের মূল্য কি শত মুদ্রা?"

কুতবউদ্দীন কহিলেন, "তুমি রক্ষা না করিলে যে সেনাপতির জীবন বিনষ্ট হইত, এমত নহে। তথাপি সেনাপতির মর্য্যাদানুসারে দান উচিত বটে। তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিতে অনুমতি করিলাম।"

যুবা। "যবনের বদান্যতায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আমিও আপনাকে প্রতিপুরস্কৃত করিব। যমুনাতীরে আমার বাসগৃহ, সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এক জন লোক দিলে, আমি আপনার পুরস্কার পাঠাইব। যদি রত্ন অপেক্ষা মুদ্রায় আপনার আদর অধিক হয়, তবে আমার প্রদত্ত রত্ন বিক্রয় করিবেন। দিল্লীর শ্রেষ্ঠীরা তদ্বিনিময়ে আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দিবে।"

কুতবউদ্দীন কহিলেন, "হইতে পারে, তুমি ধনী। এ জন্য সহস্র মুদ্রা তোমার গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু তোমার বাক্য সম্মানসূচক নহে—তুমি সদভিপ্রেত কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলা বলিয়া অনেক ক্ষমা করিয়াছি—অধিক ক্ষমা করিব না। আমি যে তোমার রাজার প্রতিনিধি, তাহা তুমি কি বিস্মৃত হইলে?"

যুবা। "আমার রাজার প্রতিনিধি ম্লেচ্ছ নহে।"

কুতব-উদ্দীন সকোপ কটাক্ষে কহিলেন, "তবে কে তোমার রাজা? কোন্ দেশে তোমার বাস?"

যুবা। "মগধে আমার বাস।"

কুত। "মগধ এই বখ্তিয়ার কর্তৃক যবনরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।"

যুবা। "মগধ দস্যু কর্তৃক পীড়িত হইয়াছে।"

কুত। "দস্যু কে?"

যুবা। "বখ্তিয়ার খিলিজি।"

কুতবউদ্দীনের চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "তোমার মৃত্যু উপস্থিত।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন, "দস্যুহস্তে।"

কুত। "আমার আজ্ঞায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। আমি যবন সম্রাটের প্রতিনিধি।"

যুবা। "আপনি যবন দস্যুর ক্রীত দাস।" *

কুতবউদ্দীন ক্রোধে কম্পিত হইলেন। কিন্তু নিঃসহায় যুবকের সাহস দেখিয়াও বিস্মিত হইলেন। কুতবউদ্দীন রক্ষিবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকে বন্ধন করিয়া বধ কর।"

বখ্তিয়ার খিলিজি, ইঙ্গিতে তাহাদিগের নিষেধ করিলেন। পরে কুতবকে বিনয় করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এই হিন্দু বাতুল। নচেৎ অনর্থক কেন মৃত্যুকামনা করিবে? ইহাকে বধ করায় অপৌরুষ।"

যুবা বখ্তিয়ারের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "খিলিজি সাহাব! বুঝিলাম আপনি অকৃতজ্ঞ নহেন। আমি হস্তিচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রাণ রক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন। কিন্তু নিবৃত্ত হউন। আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় হস্তি বধ করি নাই। আপনাকে একদিন স্বহস্তে বধ করিব বলিয়া আপনাকে হস্তির চরণ হইতে রক্ষা করিয়াছি।"

রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন। খিলিজি কহিলেন, "তুমি নিশ্চিত বাতুল। আপনি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছ, অন্যে রক্ষা করিতে গেলে তাহারও প্রতিবন্ধক হইতেছ। ভাল আমাকে স্বহস্তে বধ করিবার এত সাধ কেন?"

যুবা। "কেন? তুমি আমার পিতৃ রাজ্যাপহরণ করিয়াছ। আমি মগধরাজপুত্র। যুদ্ধকালে হেমচন্দ্র মগধে থাকিলে তাহা যবন দস্যু জয় করিতে পারিত না। অপহারী দস্যুর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিব।"

বখতিয়ার কহিলেন, "এখন বাঁচিলে ত?"

কুতবউদ্দীন কহিলেন, "তোমার যে পরিচয় দিতেছ এবং তোমার যেরূপ স্পর্দ্ধা তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি এক্ষণে কারাগারে বাস করিবা। পশ্চাৎ তোমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবে। রক্ষিগণ, এখন ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও।"

রক্ষিগণ হেমচন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিল। কুতবউদ্দীন তখন বখতিয়ারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাহাব, এই হিন্দুকে কি ভাবিতেছেন?"

* কুতবউদ্দীন আদৌ ক্রীতদাস ছিলেন।

বখতিয়ার কহিলেন, "অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। যদি কখন হিন্দুসেনা পুনর্ব্বার সমবেত হয়, তবে এ ব্যক্তি সকলকে অগ্নিময় করিবে।"

কুত। "সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা কর্ত্তব্য।"

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন হইতেছিল ইত্যবসরে দুর্গমধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। ক্ষণপরে পুররক্ষিগণ আসিয়া সম্বাদ দিল, যে বন্দী পলাইয়াছে।

কুতবউদ্দীন ভ্রূভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে পলাইল?"

রক্ষিগণ কহিল, "দুর্গ মধ্যে একজন যবন একটা অশ্ব লইয়া ফিরিতেছিল। আমরা বিবেচনা করিলাম যে কোন সৈনিকের অশ্ব। আমরা ঘোটকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহার নিকটে আসিবামাত্র বন্দী চকিতের ন্যায় লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল। এবং অশ্বে কষাঘাত করিয়া বায়ুবেগে দুর্গ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।"

কুত। "তোমরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে না কেন?"

রক্ষি। "আমরা অশ্ব আনিতে আনিতে সে দৃষ্টিপথের অতীত হইল।"

কুত। "তীর মারিলে না কেন?"

রক্ষি। "মারিয়াছিলাম। তাহার কবচে ঠেকিয়া তীর সকল মাটিতে পড়িল।"

কুত। "যে যবন অশ্ব লইয়া ফিরিতেছিল সে কোথা?"

রক্ষি। "প্রথমে আমরা বন্দীর প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। পশ্চাৎ অশ্বপালের সন্ধান করায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

পৃ. ৩, পংক্তি ৪, "একদিন প্রয়াগতীর্থে,"র পূর্ব্বে ছিল—

ইহার কিছু দিন পরে,

পৃ. ৩, পংক্তি ৯, "করিতেছিল।" কথাটির পর ছিল—

বর্ষাকালে সেই গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের জলময় শোভা যে না দেখিল তাহার বৃথায় চক্ষুঃ।

পৃ. ৩, পংক্তি ১২-১৪, "যে নামিল,...পরম সুন্দর।" এই অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৪, পংক্তি ৬-১৪, "বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে...নামে কলঙ্ক।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

যোগমায়ার দর্শনে আমার শিষ্য দেবিদাস গমন করিয়াছিলেন। তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি আমায় নিকট সকল পরিচয় দিয়াছেন। এবং ইহাও বলিয়াছেন, যে এক রাত্রি তুমি তাঁহার আশ্রয়ে লুক্কায়িত ছিলে। এক্ষণে যে যবন রাজার চরেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা কি প্রকারে নিবৃত্ত হইল?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহারা যমুনা-জলচরের উদরে পরিণত হইতেছে। ও শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "অনর্থক বিপদকে কেনই নিমন্ত্রিত করিয়া আন? কেবল ক্রীড়া কৌতূহলের বশীভূত হইয়া বিপদাগার যবনদুর্গ মধ্যে কেন প্রবেশ করিয়াছিলে?"

হেম। "যবনদুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্য এই, যে তাহা না করিলে যবনদিগের মন্ত্রণা কিছুই অবগত হইতে পারিতাম না। আর অসতর্ক হইয়াও আমি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করি নাই। আমার অনুগত ভৃত্য দিগ্বিজয় যবনবেশে দুর্গ নিকটে আমার অশ্ব রক্ষা করিতেছিল। আমার পূর্ব্বপ্রদত্ত আদেশানুসারেই আমার নির্গমনের বিলম্ব দেখিয়া দুর্গমধ্যে অশ্ব লইয়া গিয়াছিল। ঐ উৎসবের দিন ভিন্ন, প্রবেশের এমত সুযোগ হইত না, এজন্য ঐ দিন দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

পৃ. ৮, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের গোড়ায় এই প্যারাটি ছিল—

বাষ্পীয় রথের গতি অতি বিচিত্র। দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিতে দুই দিন লাগে না। কিন্তু ইতিহাস-লেখকের লেখনীর গতি আরও বিচিত্র। পাঠক মহাশয় এই মাত্র দিল্লীতে; তৎপরেই প্রয়াগে; এক্ষণে আবার প্রাচীন নগরী লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়া তাঁহাকে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের গৃহাভ্যন্তরে নেত্রপাত করিতে হইল।

পৃ. ৮, পংক্তি ১৬, "লক্ষ্মণাবতী-নিবাসী" কথাটি ছিল না।

পৃ. ১০, পংক্তি ৮, "স্বামী হয়েন নাই।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
সুতরাং সাধ্বীর তাহা অকর্ত্তব্য।

পৃ. ১০, পংক্তি ৯, "এই জন্য বলিতেছি।" কথা কয়টির পর ছিল—
তোমার চরিত্রে এমন কলঙ্ক—ইহা যখনই মনে পড়ে তখনই আমার শরীরে জ্বর আইসে।

পৃ. ১০, পংক্তি ১৬, "তখন মনে করি—" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
তখন মনে করি, তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ছিল ভাল।

পৃ. ১১, পংক্তি ১৬, "প্রথমেই সে···বলিল," এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
প্রথমেই নৌকারোহী আমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া আমার প্রধান ভয় দূর করিলেন; কহিলেন,

পৃ. ১২, পংক্তি ১-২, "আমার বড় রাগ···গিয়াছিল, আর" এই অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ১২, পংক্তি ৯, "আমার সহিত সাক্ষাৎ" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—
যাহা উচিত, তাহা তাঁহার নিজমুখে আমি শুনিতে পাইয়া থাকি।

পৃ. ১২, পংক্তি ১০, "সাক্ষাৎ করিবেন না।" কথাগুলির পর ছিল—
তজ্জন্য আমার প্রতি মহাশয়ের পীড়ন অনাবশ্যক।

পৃ. ১২, পংক্তি ১২, "হেমচন্দ্রের" কথাটির পরিবর্ত্তে ছিল—
এ বয়সে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় বালকের

পৃ. ১২, পংক্তি ১৯, "ও কি ও গাই ?" কথা কয়টি ছিল না।

পংক্তি ২২, "এই সকল…এমন" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

অল্পক্ষণ নিঃশব্দে আলেখ্যে দত্তমনা হইয়া কর্ণ করিতেছিলেন, এমত

পৃ. ১৪, পংক্তি ২৪, "একে কিছু দাও না ?" স্থলে ছিল—

তুমি আজি একটি মুদ্রা আমায় ঋণ দাও ; মাধবাচার্য্যের স্বীকৃত অর্থ আসিলে আমি পরিশোধ করিব।

পৃ. ১৫, পংক্তি ৪, "আর কিছুই ত জানি না।" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

আর কি করিব ?

পৃ. ১৫, পংক্তি ১২, "বেণেতে বাণিজ্য করে—" এই কথাগুলি ছিল না।

পংক্তি ২৫, "গিরিজায়া" কথাটির পূর্ব্বে ছিল—

গি। "তবে শুনুন।" এই বলিয়া

পৃ. ১৭, পংক্তি ১৫-১৭, "কিছু চাউল,…দিবার সময়ে" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

একটী রৌপ্য মুদ্রা আনিয়া মৃণালিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন। তখন মৃণালিনী মুদ্রাটী লইয়া গিরিজায়াকে দিতে গেলেন এবং দানের অবকাশে

পৃ. ১৮, পংক্তি ৮, "করিতেছিলেন।" কথাটির পর ছিল—

পাঠক মহাশয় সেই খানে চলুন।

পৃ. ১৯, পংক্তি ২২, "গিরিজায়া," কথাটির পূর্ব্বে ছিল—

ভাল—গিরিজায়া—তোমাকে ত আমি পুরস্কার স্বরূপ বসন ভূষণ দিয়াছি—সে গুলিন্ পর না কেন ?"

গি। "সুবসনা ভিখারিণীকে কে ভিক্ষা দিবে ? আপনি যত দিন আছেন, তত দিন যেন আমার ভিক্ষায় প্রয়োজন নাই। আপনি যথেষ্ট পুরস্কার করিতেছেন কিন্তু আপনি ত বসন্তের কোকিল। উড়িয়া গেলে আমার যে ভিক্ষা, সেই ভিক্ষা করিতে হইবে। আর আমি আপনার কোন কাজ করিতে পারিলাম না, সে গুলিন আপনায় ফিরাইয়া দিব।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "ফিরাইয়া দিবে কেন ?

পৃ. ২০, ৪ পংক্তির পর ছিল—

"কটিবাস কসিয়ে, রাশ রসে রসিয়ে, মাতিল রস কামিনী।"

গাইতে গাইতে গিরিজায়া লজ্জিতা হইলেন, তখন গীত পরিবর্ত্তন করিয়া গাইলেন,

পৃ. ২৪, পংক্তি ৫, "উঠিবে।" কথাটির স্থলে ছিল—

জাগরিতা হইয়া দেখিতে পাইবে—হা বিধাত!

পৃ. ২৫, পংক্তি ১৫-১৬, "অনুগৃহীত ব্যক্তিটা" স্থলে "এ গুপ্ত প্রসাদভোজী" ছিল।

পংক্তি ২৩-২৪, "হাতছাড়া কি···মনের দুঃখে বলি," কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ২৬, পংক্তি ৬-৭, "সম্বন্ধীর ভগিনী···সর্ব্বার্থসাধিকা!" স্থলে "প্রাণেশ্বরী।" ছিল।

পৃ. ২৬, পংক্তি ১১-১৫, এই লাইন কয়টি ছিল না।

পৃ. ২৮, পংক্তি ২৭, এই লাইনটির স্থলে ছিল—

গি। "নহিলে কে?"

পৃ. ২৮, পংক্তি ২৮, "কিন্তু তুমি যে" কথা কয়টির পূর্ব্বে "নহিলে কে?" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ২৯, পংক্তি ২-৩, "দেখে মনে হলো,···শোধ দিলাম।" এই অংশটুকুর পরিবর্ত্তে ছিল—

পরে অবস্থামতে কার্য্য করিলাম।

পৃ. ২৯, পংক্তি ১৮-১৯, "এই কথার পর···বলিল," কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৩১, পংক্তি ৪, "গৌড়েশ্বর" কথাটির পর "লাক্ষণেয়," কথাটি ছিল।

পৃ. ৩২, শেষ পংক্তির পর ছিল—

দামো। "আমি বিস্মৃত হইয়া ছিলাম, বিষ্ণুপুরাণে আছে।"

মাধ। "বিষ্ণুপুরাণ আমি সমগ্র কণ্ঠস্থ বলিতেছি; দেখান, এ কবিতা কোথায় আছে?"

পৃ. ৩৩, পংক্তি ১, "মন্বন্তে" কথাটির স্থলে "মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে" ছিল।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ১৯, "জনার্দ্দন নামে এক" এই কথা কয়টির পর "বধির" কথাটি ছিল।

পৃ. ৩৬, ৭ পংক্তিটি ছিল না।

পৃ. ৩৭, পংক্তি ২৩-২৪, "বক্ষে তরঙ্গ উত্থিত···তরঙ্গাভিঘাতজনিত" অংশটুকু প্রথম সংস্করণে ছিল, কিন্তু দশম সংস্করণে ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়াছিল।

পৃ. ৪০, পংক্তি ১৯, "স্বপ্ন দেখিয়াছ।" স্থলে ছিল—

কি দেখিয়াছ?

মৃ। "দেখিয়াছি।"

গি। "কি দেখিয়াছ ?"

মৃ। "রত্ন।"

পৃ. ৪৩, পংক্তি ১৫, "ভূতযোনির" স্থলে "দেবযোনির" ছিল।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ২৩, "পর" কথাটি দশম সংস্করণে ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়াছিল।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ১১, "আমাদিগের সহিত...সম্ভাবনা থাকিবে।" স্থলে ছিল—
আপনাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে না।

পৃ. ৫১, পংক্তি ৪, "নিবেদন করিতেছি" স্থলে "নিবেদিতেছি" ছিল।

পংক্তি ২৬, "পঁচিশ হাজার" স্থলে "বিংশতি সহস্র" ছিল।

পৃ. ৫৪, পংক্তি ২-১৪, "একে বর্ণ সোণার চাঁপা,...ললাট সুকুমার ;" এই অংশ পরিবর্ত্তে ছিল—

জ্যোৎস্নালোকে প্রভাসিত চম্পকদামের তুল্য বর্ণের জন্য বলি না—তাহা ত অন্য সুন্দরীর থাকি থাকিতে পারে ; ভুজঙ্গ শিশুশ্রেণীসম কুঞ্চিতালকসমষ্টিপ্রমুখ নিবিড় কেশরাশির জন্য বলি না, সে ত এ বাপীজলসিঞ্চনে ঋজু হইয়াছে ; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট জন্য বলি না ; সে মুখসরোবরের বীচি ভ্রূযুগ জন্য বলি না ; ভ্রমর-ভয়-স্পন্দিত নীলপুষ্প তুল্য, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচন যুগল ; মুহুর্মুহুঃ আব বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা ; প্রাতঃশিশির-সংস্নাত, প্রাতঃসূর্য্য-কিরণ-প্রোদ্ভিন্ন, রক্ত কুসুমা স্তরযুগল স্বরূপ অধরোষ্ঠ ; এ সকল দেখিয়া বলি না ; চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গন্ডাম্বু বিস্তারবৎ কপোল ভাবিয়া বলি না ; শাবক হিংসা শঙ্কায় উত্তেজিতা, বঙ্কিমগ্রীবা, হংসীর ন্যায় গ্রীবা ;— বাঁধিলেও যে গ্রীবার উপরেও অবাধ্য ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে ;—যে গ্রীবায় ত ফল-ভূষণ ক্ষুদ্র রোমাবলির ন্যায় কোমল নবীন রোমাবলি শোভা করে ; সে গ্রীবা দেখিয়া বলি দ্বিরদ রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ শরীর বিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা দেখিয়াও বলি না। যাহার জন্য মনোরমার রূপ রাশি অতুল বলি, তঁ সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্য, তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাহার বদন সুকুমার, তাহার অধর সুকুমার, তাহার সুকুমার, তাহার ললাট সুকুমার।

পৃ. ৫৫, পংক্তি ৮-৯, "সরলতাকে ঢাকিয়া...হইল।" এই কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৯, "মহিষী যদি অধিক ভালবাস," কথাগুলির স্থলে ছিল—
প্রণয়ে যদি অধিক মনোভিনিবেশ কর

পৃ. ৫৬, পংক্তি ২০, "স্ত্রৈণ-রাজার" পরিবর্ত্তে "বিলাসানুরাগী রাজার" ছিল।

পৃ. ৫৭, পংক্তি ২৩, "সে প্রতিভা দেবী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন ;" কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৬০, পংক্তি ১৭, "পঁচিশ হাজার।" কথা দুইটির স্থলে "বিংশতি সহস্র।" ছিল।

পৃ. ৬০, পংক্তি ২৪, "পঁচিশ হাজারের" স্থলে "বিংশতি সহস্রের" ছিল।

পৃ. ৬২, পংক্তি ৪, "শরত্যাগ করিলেন।" এই কথা দুইটির পর ছিল—

যে শরবেধে কুতবউদ্দীনের মত্তহস্তী ভূমিশায়ী হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিশাল শর ত্যাগ করিলেন।

পৃ. ৬২, পংক্তি ১৬, "ফেরে" কথাটির পরিবর্ত্তে "আমার হস্তত্যাগ করে" ছিল।

পৃ. ৬৩, শেষ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

নিদ্রাভঙ্গ হইল। হেমচন্দ্র নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, প্রাতঃসূর্য্য কিরণে পৃথিবী হাসিতেছে, শির উপরি শত শত পক্ষী মিলিত হইয়া সহর্ষে কলরব করিতেছে—নাগরিকেরা স্ব স্ব কার্য্যে যাইতেছে। হেমচন্দ্র শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পৃ. ৬৫, প্রথম দুই পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—

গি। "আমি মিলাইব ? থই আর দই।"

র। "সকাল বেলাই খাই খাই ?"

গি। "খেতে কই পাই।"

র। "আর মিল পাইনে ভাই।"

গি। "মিল আছে—তোমার মুখে ছাই।"

র। "পোড়ার মুখে ছাই, ঠিক মিলেছে ভাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।"

গি। "কাজে ? কি পার করিতে ? দেখ তুফানে পড়িও না।"

র। "তুফান দেখিলে পাড়ি দিব কেন ?"

গি। "কপালের কথা কে বলিতে পারে ? যদিই একদিন তুফানে পড়িলে ?"

র। "হাল ছাড়িয়া দিব।"

গি। "ডুবে মরিবে যে ?"

র। "গঙ্গায় মরিলে স্বর্গ পাব।"

গি। "তবে ডুবেই মর। আমি একটী গীত গাই—

সিন্ধু হৃদে বই, নূতন তরি বই, পারে তোরা, কে যাইবি গো।
নূতন ডিঙ্গায় নূতন মাঝি—কে যাইবি গো।

বান দিবে ঢেউ, পার হবে সেই, বান দিয়ে, কে যাইবি গো।
অই দেখ বয়, মধুর মলয়, এই বেলা, কে যাইবি গো।
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল, সুখের পারে কে যাইবি গো।
যদি পথিক পাই, কূল ভেঙ্গে যাই, অকূল মাঝে কে যাইবি গো।
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ, আমার সাতে কে যাইবি গো।

রত্নময়ী কহিল, "তুমি আমার অপেক্ষাও রসের পাটনী। বেলা না হইলে আরও দুই একটী গীত শুনিতাম। এখন গৃহের কাজ সারিয়া ঘাটের কাজে যাই।"

পৃ. ৬৫, পংক্তি ৫, "জাগিয়াই থাকি।" কথা কয়টির পর ছিল—

তোমার গান শুনিতে ছিলাম—তোমার মত কাণ্ডারীকে কেহ যেন বিশ্বাস করে না।"

পৃ. ৬৫, ৬-৭ পংক্তির পরিবর্তে ছিল—

গি। "কেন?"

মৃ। "তুমি ঘাটে আনিয়া আমায় ডুবাইলে।"

পৃ. ৬৭, ১৭ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

কে বলে সমুদ্রতলে রত্ন জন্মে? এ সংসারে রত্ন রমণীর হৃদয়।

পৃ. ৬৯, পংক্তি ৮ ও ৯, "মেয়েটা" স্থলে "ছুঁড়ী" ছিল।

পৃ. ৭০, পংক্তি ৮, "মনোরমা উপস্থিত।" কথাগুলির পর ছিল—

দূর হইতে চুম্বক পাতর লোহাকে টানে না।

পৃ. ৭২, পংক্তি ১৮, "গিরিজায়া সে মুখ" কথা কয়টির পর ছিল—

সেই ভীম কান্তিযুক্ত মুখমণ্ডল

পৃ. ৭২, পংক্তি ২৭, "গিরিজায়ার মাথার আকাশ" হইতে পর-পৃষ্ঠার ৫ পংক্তির "দশা কি হইবে?" এই অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৭৬, পংক্তি ৬-১০, এই কয়টি পংক্তির পরিবর্তে ছিল—

মনোরমা কহিলেন, "ভ্রাতঃ, তোমার ললাট কুঞ্চিত; তোমার ভ্রূকুটি কুটিল; বিস্ফারিত লোচনে পলক নাই; লোচনযুগল—দেখি—তাই ত—চক্ষু আর্দ্র; তুমি রোদন করিয়াছ!"

পৃ. ৭৭, পংক্তি ৫-৬, "সূর্য্যরশ্মির অপেক্ষা···দেখা দিলেন।" কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৭৭, পংক্তি ১১-১২, "যে পরকে প্রতারণা…সর্ব্বনাশ ঘটে।" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

এ সংসার প্রতারণা, প্রতারণা! প্রতারণা! কেবল প্রতারণা!

পৃ. ৭৮, পংক্তি ৬, "ম।" কথাটির পরিবর্ত্তে ছিল—

ইহার উত্তর ত মনোরমার উপদেষ্টা বলিয়া দেন নাই। উত্তর জন্য আপনার হৃদয় মধ্যে সন্ধান করিলেন; অমনি উত্তর আপনি মুখে আসিল। কহিলেন,

পৃ. ৮০, পংক্তি ১১, "সে কি?" কথা দুইটির পরিবর্ত্তে "কই কিছু না।" ছিল।

পৃ. ৮১, ১৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—

যুনানীয়েরা প্রণয়েশ্বর ক্যুপিদ্‌কে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিত। তিনি কাণা হউন, কিন্তু তাঁহার সেবক সেবিকারা রাত্রি দিন্ চক্ষুঃ চাহিয়া থাকে। যে বলে যে প্রেমাসক্ত ব্যক্তি অন্ধ সে হতিমূর্খ। আমি যদি অন্যাপেক্ষা তোমাকে অধিক ভালবাসি, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত, যে অন্যে যাহা দেখিতে পায় তদপেক্ষা আমি তোমার অধিক গুণ দেখি। সুতরাং এখানে অন্যাপেক্ষা আমার দৃষ্টির তীব্রতা অধিক। তবে অন্ধ হইলাম কই?

পৃ. ৮১, পংক্তি ২০, "হইয়াছে';" কথাটির পর ছিল—

আমি তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া মথুরায় বিবাহ করিতে গিয়াছি,

পৃ. ৮৩, পংক্তি ৪-১১, এই পংক্তি কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

গিরিজায়া ভীতা হইয়া পলায়ন করিল। তাহার একটী গীত মনে আসিল, কিন্তু গায়িতে পারিল না।

পৃ. ৮৩, ১৬ পংক্তির পর ছিল—

গিরিজায়া অগত্যা রত্নময়ীর নিকট গেল। কহিল, "সই!"

রত্ন। "কেন সই?"

গিরি। "আমার বড় একটী দুঃখ হইয়াছে।"

রত্ন। "কেন সই—তুমি সকল রসের রসময়ী—তোমার আবার দুঃখ কি সই!"

গিরি। "দুঃখ এই সই—বৈকাল অবধি আমার গীত গায়িবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে—গান থামে না—কিন্তু গান গায়িতে পারিতেছি না।"

রত্ন। "কেন একি অলক্ষণ; কাকুড় গিলিতে গলায় বেধেছে না কি? নহিলে তোমার গলা বন্ধ? নুন খেয়েছ বা।"

গিরি। "তা না সই—মৃণালিনী কাঁদিতেছে—পাছে আমি গীত গায়িলে রাগ করে?"

রত্ন। "কেন মৃণালিনী কাঁদিতেছে কেন?"

গিরি। "তা কি জানি জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে না। সে কাঁদিয়াই থাকে। আমি এখন গীত গাহিলে পাছে রাগ করে?"

রত্ন। "তা করুক, তুমি এমন সাধে বাঞ্চত হবে কেন? চন্দ্রহর্ম্যের পথ বন্ধ হবে তবু তোমার গলাবন্ধ হবে না। তুমি এখানে না পার, পুকুর ধারে বসিয়া গাও।"

গি। "বেশ বলেছ সই। তুমি শুন।"

পৃ. ৮৩, পংক্তি ১৯-২০, "স্পন্দনরহিত কুসুমশ্রেণী" কথা দুইটির পরিবর্ত্তে "শ্বেত রক্ত কুমুদমালা" ছিল।

পৃ. ৮৩, পংক্তি ২৩, "উপবেশন করিল।" কথা কয়টির পর ছিল—

সে জানিত, যে তথা হইতে সঙ্গীত ধ্বনি মৃণালিনীর কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু ইহাও তাহার নিতান্ত অসাধ নহে—বরং তাহাই কতক উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য নিজ পরযন্ত্রণাকাতর বিকৃতচিত্তের ভাবব্যক্তি। গিরিজায়া ভিখারিণীবেশে কবি; স্বয়ং কখন কবিতা রচনা করুক বা না করুক, কবির স্বভাবসিদ্ধ চিত্তচাঞ্চল্যপরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং কবি। কে না জানে যে কবির মনঃসরোবরে বায়ু বহিলে বীচি বিক্ষিপ্ত হয়?

পৃ. ৮৪, পংক্তি ৪, "কালো নীরে" কথা দুইটির পরিবর্ত্তে "বারি তীরে" ছিল।

৮ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—

যব কাঁদন্ লাগি সই, কাহে না পরাণি,

পৃ. ৮৫, ১১ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

ক্ষণেক পরে গিরিজায়া মৃণালিনীর হস্ত ধীরে ধীরে নিজ স্কন্ধচ্যুত করিয়া চলিলেন।

পৃ. ৮৬, পংক্তি ১৭, "প্রেমপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল," কথা দুইটির পর "প্রেম পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ নেত্র," ছিল।

পৃ. ৮৬, শেষ পংক্তির "সেই মৃণালিনী···সম্ভব নহে।" কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৮৭, পংক্তি ৭-৮, "সেই মৃণালিনী···হইতে পারে না।" এই অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৮৭, পংক্তি ১৬-১৮, "সেই মৃণালিনী···সে গণ্ডমূর্খ।" এই অংশটুকুর পরিবর্ত্তে ছিল—

আর কত দিনের কত কথা মনে পড়িল। সেই সকল কথা মনে করিয়া হেমচন্দ্র কাঁদিতেছিলেন, শত বার আপনি প্রশ্ন করিতে ছিলেন, "সেই মৃণালিনী অবিশ্বাসিনী—ইহা কি সম্ভব?"

পৃ. ৮৭, পংক্তি ২০, "না ?" কথাটির পর ছিল—
তাহা হইলে এ সংশয়ের মোচন হইত।

পৃ. ৮৮, পংক্তি ৬, "আসিবে কেন ?" কথা কয়টির পর ছিল—
মৃণালিনী অবিশ্বাসিনী বা ?

পৃ. ৮৮, পংক্তি ১৮, "সাধ থাকে, করুন।" কথা কয়টির পর ছিল—
আমি একবার সরিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু

পৃ. ৯০, পংক্তি ৪, "কথা কহে না ?" কথা কয়টির পর ছিল—
মনুষ্যের একটী ব্যতীত মন নহে।

পৃ. ৯০, পংক্তি ১৩, "পবিত্রতা" কথাটির স্থলে "প্রেমোক্তি" ছিল।

পৃ. ৯৪, পংক্তি ১৬, "তীর্থযাত্রা" স্থলে "পুরুষোত্তমে যাত্রা" ছিল।

পৃ. ৯৬, তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম "বিহঙ্গিনী পিঞ্জরে" ছিল।

পৃ. ১০০, পংক্তি ৭, "জ্বালাবিশিষ্ট" কথাটির স্থলে "কৃষ্ণরেখা শোভিত" ছিল।

পৃ. ১০১, পংক্তি ২৭, "খিড়কী" কথাটির স্থলে "খড়কী" ছিল।

পৃ. ১০৩, পংক্তি ১৭, "পারিলাম না।" কথা দুইটির পর ছিল—
ইহা আমা কর্তৃক অনুমিত হয় নাই।

পৃ. ১০৩, পংক্তি ১৮, "না বুঝিয়া…বুঝিলেন ;" কথা কয়টির স্থানে ছিল—
যদিও পূর্ব্বে না হইয়া থাকে, তবে এক্ষণে হইল।

পৃ. ১০৪, শেষ পংক্তির পর ছিল—
আকাশের সামান্য নক্ষত্রটীও অস্ত গেলে পুনরুদিত হয়।

পৃ. ১০৬, ২৭ পংক্তির "নাগরিকেরা" কথাটির স্থলে "বাঙ্গালিরা" ছিল।

পৃ. ১০৮, ১২ পংক্তির "হিন্দু," কথাটির স্থলে "আর্য্যবর্ণ—" ছিল।

পৃ. ১০৯, ১২ পংক্তির "পাপিষ্ঠা ; বড় নির্দ্দয়" কথাগুলির পরিবর্ত্তে "লক্ষ্মী—সাবিত্রী" ছিল।

পৃ. ১১০, পংক্তি ৫, "প্রভাত হইল" কথাগুলির পর ছিল—
মৃণালিনী উঠিলেন না। বেলা হইল, মৃণালিনী উঠিলেন না।

পৃ. ১১৪, পংক্তি ২১, "গিরিজায়া তখন" কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—
দুর্ভাগ্যক্রমে গিরিজায় রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত ছিল শয়ন মাত্র নিদ্রাভিভূত হইয়া সকল বিস্মৃত হইল।

পৃ. ১১৬, পংক্তি ১৪, "বাসায়" কথাটির স্থলে ছিল—
বাসার্থ একটী স্বতন্ত্র গৃহ ছিল। তথায়

পৃ. ১১৬, পংক্তি ১৭, "উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে" কথা কয়টির স্থলে "উভয়ে একগৃহে সহবাস" ছিল।

পৃ. ১২৭, পংক্তি ১১, "শ্রবণাতীত" স্থলে "অশ্রাব্য" ছিল।

পৃ. ১২৮, পংক্তি ১০, "পশুপতির…সঙ্গে লইলেন।" এই কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ১২৯, পংক্তি ৯, "সেই সময়ে…করিতে লাগিলেন।" স্থলে ছিল—
তথায় হেমচন্দ্রের সাহায্যে

পৃ. ১২৯, শেষ প্যারাটির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—
হেমচন্দ্রের স্থাপিত রাজ্যের একণে কোন চিহ্ন নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে সমুদ্রের কূলে যে সকল জনপদ ছিল তাহার কিছুরই একণে চিহ্ন নাই।

পৃ. ১২৯, শেষ কথা "সম্পূর্ণ" স্থলে "সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।" ছিল।